বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৪৮/১৪

২৬ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১০। [১ম সংখ্যা।

পরিচারিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৪৮/১৪

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. MAY, 1903. No. 1.

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ ...	১	সঙ্গীত ...	১৯
কেহ কাহারও নয় ...	২	পত্র ...	১৯
কে আমার আমি কার ...	২	পাক বিধি ...	২০
রেণু ..	৪	From Babu Keshub Ch. Sen, To C. H. Tawney, Esq., M.A., *Registrar, Calcutta University* ...	২৩
চৈত্র-সন্ধ্যা ...	৯		
গল্প ...	১০		
ভবে আসিয়া কি করিলাম ...	১৫		
স্বর্গীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী (১)	১৬	সংবাদ ...	২৩
স্বর্গগতা দেবী সৌদামিনী (২)	১৬	স্বর্ণরেণু ...	২৪

কলিকাতা,
৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;
আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

জনৈক সদাশয় হিন্দু রাজার সাহায্যে প্রচারিত।

সনাতন ধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্র।

হিন্দুধর্ম্মালোক।

সচিত্র "হিন্দুধর্ম্মালোক" মাসিক পত্র।

৪৫/৮৪

সাধক, সন্ন্যাসী, অধ্যাপক ও কৃতবিদ্য লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনই পত্রিকার উদ্দেশ্য। সুনীতি, সঙ্গীত, যোগ, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, বেদতত্ত্ব, তন্ত্রতত্ত্ব, উপনিষদ, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু হিন্দু হৃদয়েপ্সিত জিনিস তাহাই আলোচ্য বিষয়। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম সভাদির প্রদত্ত বক্তৃতা, সাধক জীবনী, তীর্থসমূহের আমূল বিবরণ, নানাদেশীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত, লুপ্তপ্রায় বিবিধ শাস্ত্রের উদ্ধার, জ্যোতিস গ্রন্থ প্রকাশ। বিবিধ আর্য্য শাস্ত্র আলোচনা। সমাজতত্ত্ব, যুগতত্ত্ব, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় সন্দর্ভে পরিশোভিত মাসিক পত্র। হিন্দুর আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরম প্রীতিকর পারমার্থিক বিবিধ তত্ত্বালোচনাপূর্ণ সমালোচক মাসিক পত্র। ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু মাত্রেই গ্রাহক হইয়া স্বদেশ এবং হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরব কাহিনী অবগত হউন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান।—পরিব্রাজক পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সরস্বতী। কাশীধাম অগস্ত্য-কুণ্ড হিন্দুধর্ম্মালোক পত্রিকা আফিস, আনন্দ-কুটীর দশাশ্বমেধ রোড। ৺কাশীধাম "ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা বৈশাখ ১৩১০, মে ১৯০৩ [১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি মৃত্তিকা দ্বারা বেহালা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। তাহাতে অত্যন্ত মিষ্ট সুর বাহির হয় এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি এক প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বলিতেছেন তিনি স্বয়ং এক জাতি মৎস্য দেখিয়াছেন যাহারা অত্যন্ত উত্তপ্ত বারিতে বাস করে। যে হ্রদে তাহারা বাস করে তাহার জল এত ভয়ানক উষ্ণ যে তাহাতে হস্ত দিবা মাত্র দগ্ধ হইয়া যায়।

এইচ্, ডি, ল্যারিমুর নামক রয়াল আর্টিলারির কাপ্তেন টাইম্‌স্ নামক সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন উত্তর নাইজিরিয়া হইতে এক প্রকার ছোট বৃক্ষ আনয়ন করিয়াছেন উহার লাটিন নাম "ভসিনাম ভিরিডি" অর্থাৎ "মশারি-বৃক্ষ" দুই তিনটি গাছ টবে করিয়া ঘরে রাখিলে নাকি ঘরের মধ্যে আর মশার উপদ্রব থাকে না।

তুরস্ক দেশে বালকেরা পঞ্চম বর্ষে ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। দীক্ষার দিবসে অত্যন্ত সমারোহ হয় এবং দীক্ষার্থীগণকে নূতন বসন দান করা হয়। সুলতানের পুত্রগণ যে সময়ে দীক্ষিত হয় রাজ্যের উচ্চবংশজাত পুত্রগণকেও সেই সঙ্গে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান করা হয়। সুলতান তদুপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং সকলকে মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করেন।

আমরা শুনিয়াছি গুটি পোকা হইতে রেশম বাহির করিয়া লইয়া ভিন্ন ভিন্ন রং লাগাইয়া তবে উহা বিভিন্ন রঙের করা যায়। সম্প্রতি ফরাসী দেশে লিয় নগরে রেশমের ব্যবসায়ীগণ এক নূতন ও সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা গুটি পোকার ভক্ষ্য পত্রে রং লাগাইয়া উহা তাহাদের খাওয়াইতেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের রেশম আপনা আপনি বাহির হইতেছে।

ডেন্‌মার্কে একটি নূতন বিধি প্রচলিত হইতেছে। রাজধানীতে মদ্য পানের

বিপক্ষে এক একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। মদ বিক্রয়কারীগণকে বলা হইয়াছে যে যদি তাহারা কোন ব্যক্তিকে অধিক মদ পান করিতে দেয় যাহাতে সে ব্যক্তি মাতাল হয় তাহা হইলে বিক্রেতাগণ তাহাকে গাড়ী করিয়া তাহার বাটীতে পৌছাইয়া দিতে হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে ডাক্তার ডাকা ইত্যাদি সমুদায় ব্যয় করিতে হইবে। এক্ষণে মদ বিক্রেতাগণ ভয়ে কাহারও নিকট অধিক মদ বিক্রয় করে না! ডেন্‌মার্কে আর মাতালের ভয় থাকিবে না। এ বিধি পালনে মদ্য ব্যবসায়ী ও মদ্যপায়ী কেহই প্রীত নয়।

কেহ কাহারও নয়।

জীবন্ত হরি মনুষ্যজীবনে নিত্য বাজীকরের খেলা খেল্‌চেন। এই দ্রব্য আছে, এই নাই। আমরা দেখচি স্বচক্ষে এখনই ছিল এখনই নাই। ইচ্ছা হয় স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাই। দুঃখের দিন আর গণনা করিতে পারা যায় না। আর কত গণনা করিব? দেখিতে দেখিতে বৎসর চলিয়া যাইতেছে। এই জীবন কোন্ অজানিত উপকূলে গিয়া বিশ্রাম লইবে? অনেক পথ চলিলাম, বড় ইচ্ছা হইতেছে বিশ্রাম লই। অবিশ্রান্ত পথ চলেছি, অনেক লোককে ছাড়িয়া আসিলাম। আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছি যাহা করা উচিত ছিল না। মন তুমি আর লোকের মুখাপেক্ষা করিও না। যাহাদের বন্ধু মনে করিয়াছিলে তাহারা কেহ তোমার বিপদের সহায় নয়। আর পরের স্নেহাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী হইও না। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কাহারও সাহায্য প্রার্থনা কিম্বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হন না। কেবল সেই আদেশদাতা হরির আজ্ঞাবহ ভৃত্য স্বরূপ তাঁরই আজ্ঞা পালনে যত্নবান হয়েন। পৃথিবীর পরীক্ষায় মানুষ যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করে। সম্পদে বিপদে স্পষ্ট বুঝিলাম কেহ আপনার নহে। ঘোর বিপদে কেবল হরির চরণ সম্বল। পৃথিবীর দিন ক্রমে শেষ হইল। এত দেখে শুনে শিক্ষা পেয়েও কেন ভাল হই না। জীবনের দায়ীত্ব গুরুতর কার্য্য এখনও পড়িয়া আছে। সকল কার্য্য শেষ করিয়া মার কোলে শীঘ্র শীঘ্র আরাম ও শান্তি লাভ করি।

কে আমার আমি কার?

"একে একে সব গেল চ'লে হায়
কে আমার আমি কার?"

এই গানটি আজ প্রাণের গভীরতম স্থান ভেদ করিয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে সংসারটা এতই অসার বলিয়া মনে হয়। সংসারের নিত্য পরিবর্ত্তন প্রাণে এক বৈরাগ্য আনিয়া দেয়। নিশিথের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, বাতাসের শব্দের মধ্য দিয়া, পাখীর সুললিত সুরের ভিতর কেবলই ঐ এক ধ্বনি ঝঙ্কার করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, "কে

আমার আমি কার?" এমন সুন্দর জগতের অতুল সৌন্দর্য্য, সংসারের এত মধুময় বিচিত্র সুখের ছবি, প্রাণের চির-আপনার জনের পবিত্র সরল স্নেহ আদর কিছুই সেই মহাবৈরাগ্যের অগ্নি নিবাইতে পারিতেছে না, কালের কঠিন নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শ্মশাণ-ছবি মুছাইয়া দিতে পারিতেছে না। চতুর্দ্দিকে মহাবৈরাগ্যের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সমুদায় জড় প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের কোমল বেশ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যোদ্দীপক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারয়াছে।

চতুর্দ্দিকের এই গম্ভীর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়া আকুল প্রাণ আরও উদাস হইয়া উঠিতেছে। এ প্রাণ আর অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না, কোথায় কোন্ অজানিত দেশে অজানিত রাজ্যে, স্মৃতির অতীত, কালের অতীত স্থানে উড়িয়া যাইতে চায়। কোন বাধা মানিতেছে না। যাও প্রাণ যথা ইচ্ছা উড়িয়া যাও। ঐ ঘন মেঘরাশি উহার উপরে উঠিয়া বিদ্যুতের সঙ্গে খেলিতে চাও? না ঐ জলরাশির তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়া নৃত্য করিতে চাও? না পাখীর গানে আপন স্বর মিলাইয়া বিহঙ্গের সঙ্গে আকাশে আকাশে বেড়াইয়া নানা স্থানে বিহার করিতে চাও? ওখানেও সুখ নাই, ওখানেও শান্তি নাই। নিজের নিজত্ব যদি ভুলিতে পার তো যাও, আপনার প্রাণ আপনি ভুলিতে পার যদি তবে যাও। যে স্মৃতি যে বৈরাগ্য তোমার মনকে এত উদাস করিতেছে সেই স্মৃতি সেই আত্মজ্ঞান যদি না ভুলিলে তবে যথায়ই যাও না কেন প্রাণের বেদনা নিবিবে না, প্রাণের জ্বালা যাইবে না। প্রকৃতিরও দোষ নহে, সংসারও দোষী নহে, তবে কাহার দোষ? অদৃষ্টেরই কি দোষ? তাহাও নহে দোষ অদোষ এ সকল কিছুই নহে। মানবের যুক্তিমাত্র। কাল কি কখনও মানবের মতামতের প্রতীক্ষা করে? অদৃষ্টচক্রে মানব জীবন ক্রমাগতই ঘুরিতেছে সেই নিয়ন্তার অধীন এ অদৃষ্টচক্র। সময় হইলেই, আহ্বান আসিলেই চক্র থামিবে। তাহা অবরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সংসারেও থাকিতে হবে, মায়ার সামগ্রীগুলিকেও প্রাণের সঙ্গে বাঁধিতে হবে, আবার সময় আসিলে কালের মহাকরালগ্রাসে প্রাণের বাঁধন ছিন্ন করিয়া আদরের সামগ্রীটি অগ্রসর করিয়া দিতে হবে। তখন সহস্র ক্রন্দন, বিলাপ কিছুরই ফল হইবে না। সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভবের কূলে বসিয়া থাক, কবে আবার তোমার সময় আসিবে সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনল জ্বালিয়া বাহিরে সংসার কর, অন্তরের অন্তরে ঔদাসীন্য, বাহিরে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে ব্যাপৃত, এই ভাবে জীবন চলুক। আর যখন অন্য উপায় নাই, তখন এই ভাবে থাকা ভিন্ন আর কি করা যাইতে পারে!

রেণু।

যোগেন্দ্র বাবুর একমাত্র অতি সুন্দরী ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যার সহিত রাজা সৌরেন্দ্র কুমারের একমাত্র পুত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধ হইবার প্রায় এক মাস পরে যোগেন্দ্র বাবুর কন্যা রেণুর স্কুলের এক বন্ধু রেণুকে তাহাদের বাড়ী কিছুদিন থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করে। রেণুর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বন্ধুর কাছে গিয়া খুব আমোদে থাকিবে ভাবিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। পিতার সহিত বন্ধুর নিকট গেলেন। তাঁহার বন্ধু রমা রেণুকে পাইয়া কি করিবে যেন ভাবিয়াই উঠিতে পারিল না। যে দিন রেণু রমাদের বাড়ী গমন করিলেন, রমার মা রেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া আমি কাল একটা খুব বড় পার্টি দিতেছি।" রমা রেণুর কানে কানে বলিল, "নরেন্দ্রকে দেখিবে কাল।" তাহার পরদিন যখন রেণু ঘুম হইতে উঠিল তাহার মনে বড় এক আনন্দ হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আজ একজনকে দেখিব।" যখন চারিটা বাজিল রেণু সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া রমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রমা রেণুকে দেখিয়া বলিল, "নরেন্দ্রের কম ভাগ্য নয় এমন স্ত্রী পাবে।" এই বলিয়া রেণুর হাত ধরিয়া নীচে Drawing roomএ লইয়া গেল। ঘরটি লোকে পূর্ণ। রেণু ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র সকল দিক থেকে লোক আসিয়া রেণুকে Congratulate করিতে লাগিলেন। লজ্জায় রেণুর মুখ রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়া রমার মা বলিলেন, "বেচারা লজ্জায় অস্থির হইতেছে। এস মা রেণু, এখানে বস।" তাঁহার হাত ধরে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। বসিবা মাত্র কে তাঁহার পার্শ্ব হইতে বলিল, "মিস্ রেণু, কেমন আছেন?" রেণু ফিরিয়া দেখিলেন নরেন্দ্র কুমার। লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া বলিলেন, "ভাল আছি।" সেই সময় রমার ছোট ভগ্নী বিভা আসিয়া বলিল, "চা খাইতে সকলে আসুন।" খাবার ঘরে একটি টেবিলে অনেক রকম ইংরাজী ও বাঙ্গালা খাবার, চা, কফি ইত্যাদি সাজান এবং আর একটি টেবিলে অনেক রকম পানীয় দ্রব্য। তাহার সঙ্গে রকম রকম সুরাও ছিল। ইহা দেখিয়া রেণু চমকিয়া উঠিল। মনে মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল সে ঘর হইতে চলিয়া যায়। রেণুর চা পান হইলে তিনি বাগানে বিভার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। এদিকে রমা সকলকে গান বাজনা শুনিবার জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখে নরেন্দ্রের হাতে এক গেলাস সুরা রহিয়াছে ও খুব হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "মিস্ রেণুর health drink করিতেছি।" রমা তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। রমাকে দেখিয়া তাহার ভাই রমাকে বলিল, "আমি অনেক চেষ্টা করিলাম নরেনকে

এখান থেকে লইয়া যাইতে কিন্তু কোন মতে পারিলাম না।" রমা একবার "নরেন্দ্র কুমার" বলিয়া ডাকিলেন কিন্তু তাহা নরেন্দ্র কুমার শুনিতে পাইলেন না। দ্বিতীয়বার ডাকিতে সুরার গেলাস রাখিয়া রমার কাছে হাসিতে হাসিতে গেলেন। রমা বলিল, "উপরে গান বাজনা হইতেছে শুনিবেন আসুন।" নরেন্দ্র বলিলেন, "চল সেখানে রেণু আছে তো?" অন্য সময় রমাকে আপনি বলেন ও রেণুকে মিস্ রেণু বলেন। সুরার ঝোঁকে সব ভুলিলেন। উপরে গিয়া রেণুকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। রেণু, "চল আমরা বারাণ্ডায় যাই এখানে বড় গরম।" রেণু তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক হইল। প্রথম তাঁকে রেণু বলিয়া সম্বোধন, দ্বিতীয় সকলের সম্মুখে তাঁহার সহিত এরূপ ঘনিষ্ট ভাবে কথা বলা। তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্রের সহিত বারাণ্ডায় গিয়া একখানি চেয়ারে বসিলেন। নরেন্দ্র একখানি চেয়ার টানিয়া রেণুর পার্শ্বে বসিলেন। খুব হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "রেণু আজ তোমার health drink করিয়াছি। আমার বড় মাথা ঘুরছে।" আর কিছু না বলিয়া চেয়ারে মাথা দিয়া চক্ষু বন্ধ করিলেন। রেণুর ভয় হইল বলিল— "আপনার কি বেশী অসুখ করিতেছে? রমার মাকে কি ডাকিব? একটু জল আনিব কি?" এই প্রকার অনেক প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র তখন স্বপ্নের রাজ্যে রহিয়াছেন, কিছু উত্তর দিলেন না। খানিক পরেই সেখানে রমা আসিল। রমাকে দেখিয়া রেণু আস্তে আস্তে তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "মিষ্টার নরেনের অসুখ করিয়াছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এখানে যেন কিছু গোল না হয়। বোধ হয় ঘুমাইলে অসুখ সারিবে।" রমা বলিল, "আচ্ছা আমি গোল করিতে দিব না, তুমি আমার সঙ্গে এস।" রমা রেণুকে drawing room এ লইয়া না গিয়া তাহাদের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে রমার মা একা বসিয়া আছেন। রেণুকে রমা সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। রমার মা রেণুকে বলিলেন, "এস মা এখানে। তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে। নরেন কোথায়?" রেণু বলিলেন "তাঁহার অসুখ করিয়াছে। বারাণ্ডায় চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।" "রেণু মা, তোমাকে বলিতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বলিতেই হবে।" রমার মার চক্ষে জল আসিল, রেণুর হাত ধরিলেন। রেণুর মনে বড় ভয় হইল। ভাবিলেন বোধ হয় বাবার অসুখ করিয়াছে, কিম্বা কিছু মন্দ খবর আসিয়াছে।" কিছু বলিতে পারিলেন না রমার মার হাত ধরিয়া অবনত শিরে বসিয়া রহিলেন। রমার মা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "রেণু, তোমার সমন্ধ হইবার আগে যদি আমি কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম তাহা হইলে তোমাদের সম্বন্ধ হইতে দিতাম না। নরেন মাতাল!

ইহা তুমি আজ বুঝিতে পারিলে।” রেণু চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তাই বুঝি আমায় রেণু বলে ডাকছিলেন? তাই বুঝি অসুখ করিতেছে?” রমার মা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, “রেণু এ কথা বলা উচিত সেই জন্য বলিলাম।” রমার মা দেখিলেন রেণুর মুখ মলিন হইয়া গেল বালিকা যেন কিছু চাপিয়া রাখিতে অক্ষম। রেণু ভাল কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কেবল এই বুঝিলেন তাঁহার প্রাণে একটা খুব আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার সুখের দিন দুঃখে পরিণত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, দুঃখ, কষ্ট সকল মিশ্রিত হয়ে তাঁহার মনকে চঞ্চল করিল। রমার মাকে বলিলেন, “আচ্ছা, আপনি আর কিছু বলিবেন না। যাহা বলিয়াছেন যথেষ্ট।” রমার মা বলিলেন, “দেখ মা আমি ভালর জন্যই বলেছি। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য বলি নাই—” কথা শেষ হইতে না হইতে রেণু সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। নিজের ঘরে গিয়া প্রথম একখানি চিঠি তাঁর পিতাকে লিখিলেন যে তিনি শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান। চিঠি লেখা শেষ হইলে তাঁহার জিনিষ পত্র সকল গুছাইয়া লইলেন। সমস্ত সময় ভিতরে কেবল “নরেন্দ্র কুমার মাতাল, নরেন্দ্র কুমার মাতাল” মনে হইতে লাগিল। শেষে আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যায় পড়িয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রমা ঘরে আসিয়া রেণুকে উঠাইলেন। রমা ভাবিল রেণু ঘুমাইতেছিলেন। রেণু রমার মাকে পরে বলিলেন যে “আমি মিষ্টার নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে চাই, আপনি যদি কাল তাঁহাকে আসিতে বলেন।” তাঁহার মুখ দেখিয়া রমার মার বড় কষ্ট হইল। তার পরদিন সকলের আহারের পর যখন drawing roomএ বসিয়া আছেন তখন নরেন্দ্র কুমার রমাদের বাড়ী আসিলেন। নরেন্দ্র কুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, কিন্তু সে দিন তাঁর মুখে এক গম্ভীর ভাব দেখা গেল। রমা নরেন্দ্র কুমারকে রেণুর বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে রেণু একা বসিয়াছিলেন। রেণুকে দেখিয়া নরেন্দ্র কুমার shake hands করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। রেণু যেন তাহা দেখিতে পান নাই কেবল বলিলেন, “আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।” নরেন্দ্র কুমার কিছু বুঝিতে পারিলেন না একখানি চেয়ারে বসিলেন। রেণু তখন বলিলেন, “আপনি কাল যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার পর আপনার সহিত আমার কোন আলাপ রাখিবার ইচ্ছা নাই। আজ আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আপনার হাতে আপনার জিনিষ ফিরাইয়া দিতেছি।” রেণুর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। চোখের জল অতি কষ্টে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। আস্তে আস্তে বাম হস্ত হইতে হীরার আংটি খুলিয়া নরেন্দ্রকে দিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। নরেন্দ্র কুমার এতক্ষণ নীরবে রেণুর মিষ্ট

স্বরের নিষ্ঠুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন। যখন দেখিলেন রেণু আংটি ফিরাইয়া দিতেছে তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাতর স্বরে বলিলেন, “রেণু আমাকে কি ক্ষমা করিতে পারিবে না? আমি জানি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা প্রত্যাশা উচিত নয় আমার অন্যায় কার্য্যের শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু এত শাস্তি পাব ভাবি নাই। রেণু আমায় সময় দাও, আমি ভাল হই। আমাকে কি ক্ষমা করিতে পারিবে না?” রেণু কেবল বলিলেন “আপনার জিনিষ ফিরাইয়া লউন।” বলিয়া আংটিটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। তখন নরেন্দ্র কুমার বুঝিলেন আর আশা নাই। মস্তক অবনত করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন “রেণু, এখনও সময় আছে। কেবল আমায় সময় দাও। আমার মনে তেমন জোর নাই। কিন্তু তোমার জন্য আমি পৃথিবীর এমন কাজ নাই যাহা করিতে পারি না। তোমাকে হারালে পৃথিবীর সকল আশা ভরসা ও সুখ হারাইব। তুমি আমার উপর একটু দয়া কর। সময় দাও।” রেণু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলেন নরেন্দ্র কুমার তাঁহাকে কত ভালবাসেন ও তিনি নরেন্দ্র কুমারকে কত ভালবাসেন। তিনি ভাবিলেন, “আর বেশীক্ষণ এখানে থাকিলে আমার মনের জোর চলিয়া যাইবে।” তিনি কেবল কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার কম্পিত হাত খানি নরেন্দ্র কুমারের অবনত মস্তকের উপর একবার রাখিলেন। পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রেণুকে তাঁহার পিতা দেশ ভ্রমণে লইয়া গেলেন। প্রায় দুই মাস দেশ ভ্রমণ করিয়া পশ্চিমে একটি দেশে বাড়ী ভাড়া করিয়া রেণুকে লইয়া রহিলেন। রাজা সৌরেন্দ্র কুমার যখন শুনিলেন যে তাঁহার পুত্র মাতাল বলিয়া যোগেন্দ্র বাবুর কন্যা বিবাহ করিল না তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন অমন পুত্রের মুখ তিনি দেখিতে চান না। এ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র কুমার লজ্জায় ও ঘৃণায় বিদেশে চলিয়া গেলেন। বিদেশে যখন এক মাস রহিলেন তখন তাঁহার পিতার একখানি পত্র পাইলেন। পত্রে রাজা সৌরেন্দ্র কুমার লিখিয়াছেন যে তিনি পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তাঁহার কাছে রাখিতে তাঁহার অভিলাষ। এই চিঠি পাইবার পর তিনি পিতার কাছে ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর নরেন্দ্র কুমারের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। তিনি সুরা যে দিকে সে দিকে যাইতেন না। পিতার জমিদারী দেখিতেন ও পিতার কাছে সর্ব্বদা থাকিতেন। কোন বন্ধুর সহিতও দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না।

রেণুর সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার দুই বৎসর পরে রেণুকে লইয়া তাঁহার পিতা দেশে ফিরিলেন। রেণু বাড়ী আসিয়া দেখিলেন

অনেক চিঠি পত্র রহিয়াছে। একখানি চিঠির লেখা মনে হইল অপরিচিত লেখা। চিঠিখানি খুলিয়া দেখিলেন খবরের কাগজ থেকে একটু লেখা কাটিয়া কে পাঠাইয়াছে। তাহাতে লেখা রহিয়াছে নরেন্দ্র কুমার সুরা পানের বিরুদ্ধে এক লেক্‌চার দিয়াছিলেন। অনেক লোক গিয়াছিল ও লেক্‌চারের খুব সুখ্যাতি করিয়াছে। রেণুর মনে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে দুঃখের ভাব আসিল যে নরেন্দ্র কুমার এখন একজন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায়। বাড়ী ফিরিবার দুই চারি দিন পরে খবরের কাগজে দেখিলেন নরেন্দ্র কুমার ছোট ছেলেদের Band of Hope নামক একটি দল করিয়াছেন। প্রায়ই রেণু কাগজে নরেন্দ্র কুমারের প্রশংসা পড়িতেন। একদিন একখানি চিঠি পাইলেন রমার মা লিখিয়াছেন। রমার বিবাহের ঠিক হইয়াছে, পাত্রটি খুব ভাল। রমার মা একটি Evening Party দিতেছেন। রেণুকে ও তাঁহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। রেণুর চিঠিখানি পড়িয়া হঠাৎ মনে হইল বোধ হয় নরেন্দ্র কুমারের সহিত রমার সম্বন্ধ হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইল। পার্টিতে অনেক লোক গিয়াছিল। রেণু পার্টিতে গেলেন ও তাঁহাকে দেখিয়া কয়জন বলাবলি করিতেছিল যে "ও মেয়েটি কাদের? এত সুন্দর তো কখন দেখি নাই। যেখানে দাঁড়াইয়াছে সেখানটা যে আলো করিয়া রহিয়াছে।" রেণু যেখানে বসিয়াছিল তাহার পার্শ্বে কয় জনে কথা কহিতেছিল হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল, "ওযে নরেন্দ্র কুমার, যাকে দেখিবার জন্য লোক পাগল হয়। অমন লোক আর দুটি নাই।" রেণু এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার পিতাকে বলিলেন তাঁহার অসুখ করিতেছে তিনি বাড়ী যাইতে চান। যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "রমার সঙ্গে দেখা করিয়া না গেলে রমার বড় কষ্ট হইবে।" রেণু দেখিলেন রমা তখন নরেন্দ্র কুমারের সহিত কথা কহিতেছে। নরেন্দ্র কুমারের গম্ভীর মুখ ও সুন্দর চেহারা দেখিয়া রেণুর ইচ্ছা হইল তাঁহার সহিত গিয়া কথা কহেন কিন্তু সে দিকে যাইতে লজ্জা হইল। যখন দেখিলেন নরেন্দ্র কুমার রমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তখন রেণু ও তাঁহার পিতা রমার সহিত দেখা করিলেন ও রমার সহিত যাহার বিবাহ হইবে তাহার সহিত আলাপ করিলেন। রেণু যখন গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাঁহার পিতা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কি সৌরেন্দ্র কুমারের দেখা হইয়াছে?" বলিতে বলিতে দেখিলেন সৌরেন্দ্র কুমার ও নরেন্দ্র কুমার গাড়ীর জন্য সেখানে আসিলেন। সৌরেন্দ্র কুমার রেণুকে দেখিয়া বলিলেন, "মা কেমন আছ?" বলিয়া যোগেন্দ্র বাবুর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। রেণু নরেন্দ্র কুমারকে কি বলিবেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। নরেন্দ্র কুমার কিছু না বলিয়া পিতার জন্য অপেক্ষা

করিতে লাগিলেন। রেণু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পরে নরেন্দ্র কুমারকে বলিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" নরেন্দ্র কুমার বলিলেন, "ভাল আছি, আপনি কবে বিদেশ থেকে ফিরিলেন? সেই সময় রেণুর পিতা বলিলেন, "রেণু এস অসুখ কর্‌ছে বলেছিলে অনেক দেরি হইল।"

পার্টির পরদিন রাজা সৌরেন্দ্র কুমার ও নরেন্দ্র কুমার রেণুর অসুখ কেমন আছে খোঁজ লইতে আসিলেন। রেণুর যে মিথ্যা অসুখ তাহা কেহ বুঝিলেন না। যোগেন্দ্র বাবুকে রাজা সৌরেন্দ্রকুমার তাঁহার বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন। রেণু নরেন্দ্র কুমারকে বিদেশ হইতে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ আনিয়াছিলেন তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সৌরেন্দ্র কুমার ও তাঁহার পুত্র চলিয়া যাইবার পর রেণু পিতাকে বাম হাতের হীরার ও পান্নার আংটি দেখাইলেন। বলা বাহুল্য যে তাহার অর্থ উভয়ের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হইল। রমার ও রেণুর বিবাহের পর চারিজনে এক সঙ্গে বিদেশে ভ্রমণ করিতে গেলেন।

চৈত্র-সন্ধ্যা।

একদিন বসে আছি
চৈত্র-সন্ধ্যা-বেলা,
সুশীতল সমীরণে
ফুল-রেণু ঢালা।
অদূরেতে তরুশিরে
শিরিষ কুসুম,
ফুটিয়া অজস্র ঢালে
সৌরভি কুঙ্কুম।
চারিদিকে বসি মোর
ভাই ভগ্নিগণ,
ভগবত পূজনের
করি আয়োজন।
সুশীতল সমীরণে
শিরিষের বাসে
স্বতঃই আজিকে প্রাণ
ধায় তাঁর পাশে।
তরল মেঘের আড়ে
দু'একটি তারা,
উঁকি দিয়ে চেয়ে আছে
লাজে যেন সারা।
তৃতীয়ার শশী কলা
নীল নিলীমায়,
অস্ফুট জোছনা ঢালি
দিতেছে ধরায়।
ধীরে ধীরে এক খণ্ড
নব মেঘ আসি,
আবরিল তৃতীয়ার
অর্দ্ধস্ফুট শশী।
মুহূর্ত্তে পরিল ধরা
আঁধার বসন
মলিন হইল মোর
মানস গগন।
না হেরি সে মুখশশী
কুমুদ চঞ্চল,
চকোরী ব্যথিত প্রাণে
হ'ল উতরোল।
ধীরে মেঘ ভেসে গেল
বায়ুর সাগরে,

আবার বিকাশে শশী
নীল নীলাম্বরে
নেহারি সে অনম্বরে
মেঘ মুক্ত শশী
পুলকে পূর্ণিত হ'ল
ম্লান দশদিশি।
হেরি এ প্রকৃতি খেলা
ব্যাকুলিত মন
আকুলে সুধায় হৃদি
ওহে নিত্যধন
আমারো কি জীবনের
মোহ মেঘ মসী
ঘুচিয়া ফুটিবে হেন
নিত্য জ্ঞান শশী ?

গল্প।

মনোরমা এক ধনাঢ্য জমীদারের এক মাত্র কন্যা। তাহার পিতা শৈশব হইতে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন শৈশব হইতে সে স্কুলে পড়িত পরে কিছু বড় হইলে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে পড়াইয়াছিলেন, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পিয়ানো, গান, বেহালা, চিত্রবিদ্যা সকলি শিখিয়াছিল। মনোরমা দেখিতে সুন্দরী গৌরবর্ণ, মুখে একটি বড় শ্রী ছিল তাহা দেখিলেই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। কেহ কেহ বলিত মনোরমা একটু বেশী রোগা ও লম্বা, কিন্তু তাহাতেই তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত। মনোরমা যখন সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে দাঁড়াইত, সকলের চেয়ে তাহাকেই লম্বা দেখাইত। তাহাকে স্কুলের সকলেই খুব ভালবাসিত। এ জন্য কয়েকটি মেয়ে তাহার উপর বড় হিংসা করিত। মনোরমা তাহাতে একটুও ভীত ছিল না। মনোরমা স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। যদিও তাহার স্বভাবটি অতি শান্ত ছিল হৃদয়টিও তাহার কোমল ছিল তথাপি সে অধিকাংশ মেয়েদের ন্যায় পরের উপর নির্ভর করিতে ভালবাসিত না, সহজে কখনও তাহাকে কেহ ভয় দেখাইতে পারিত না। অনেক সময়ে স্কুলের মেয়েরা শাসনের ভয়ে মিথ্যা কথা বলিত বা অন্যের উপর দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিত; মনোরমা তাহাদের ভীরুতা দেখিয়া ঘৃণা করিত ও তাহাদিগের দোষ নিজ স্কন্ধে লইয়া তাহার জন্য শাসিত হইত। তাহার সাহস ও ন্যায়ানুরাগ দেখিয়া সকলেই তাকে ভয় করিত মান্য করিত এবং তাহাদিগের চেয়ে অনেক উচ্চ ও ভাল মনে করিত। মনোরমা অন্যায় দেখিতে পারিত না, তজ্জন্য দুষ্ট মেয়েরা তাহার কাছে ঘেঁসিত না। মনোরমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।

স্কুলে আর একটি বালিকা ছিল তাহার নাম সুরমা। সুরমা শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন, তাহার খুল্লতাত তাহাকে মানুষ করিয়াছে। সুরমা জীবনে কখনও আদর যত্ন পায় নাই, তাহার খুল্লতাত চিরকাল তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত। তাহাদিগের তেমন ধন ছিল না। সুরমারই প্রায় সমুদায় গৃহকার্য্য করিতে হইত। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া স্কুলের

পড়া করিয়া স্কুলে যাইত, স্কুল হইতে ফিরিয়া গিয়া আবার তাহার সমুদায় কার্য্য করিতে হইত। তাহাতেও তাহার খুড়ো সন্তুষ্ট ছিল না, প্রতিদিন সুরমাকে কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিত। সুরমা নীরবে ক্রন্দন করিত। সুরমা অত্যন্ত শান্তস্বভাবা মৃদুভাষী ছিল। সুরমার মুখখানি অতি সুন্দর সশ্রী ছিল, তবে তাহার রং গৌরবর্ণ ছিল না—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাহার মুখখানি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত। তাহার একটি মাত্র সুখ স্কুলে আসা। স্কুলে যাইবার সময় তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইত, কিন্তু যখন স্কুল হইতে ফিরিত তাহার মুখ আবার বিষণ্ণ হইত। ক্ল্যাশে সুরমা সর্ব্বদা প্রথম থাকিত, পরীক্ষায়ও প্রায় সে প্রথম পুরস্কার পাইত। স্কুলের ভিতর তাহার মত অমন ভাল মেয়ে ছিল না। সুরমা রাগ অন্যায় দেখিলে ভয় পাইত। পাছে কোন মেয়ে শাসিত হয় সে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করিত। তাহাকে ভাল মানুষ পাইয়া স্কুলের মেয়েরা মজা পাইয়াছিল, তাহাকে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিত, সুরমা চুপ করিয়া সকল সহ্য করিত। সুরমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ।

মনোরমা ও সুরমার স্বভাব দুই রকম। কিন্তু আশ্চর্য্যরূপে তাহারা উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইল। মনোরমা প্রায় দেখিত সুরমাকে ভাল মানুষ পাইয়া অন্য মেয়েরা বড় কষ্ট দিত; ইহাতে তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইত। সুরমাকে অসহায় দেখিয়া মনোরমা প্রায় তাহাকে অন্যায় ব্যবহার হইতে রক্ষা করিত। সুরমা কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইত। একটু একটু করিয়া সুরমা মনোরমার বন্ধু হইতে লাগিল। ইহাতে সুরমার উপর সকলের হিংসা হইতে লাগিল। অধিকাংশ মেয়ে মনোরমার বন্ধুতা পাইতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু মনোরমা কাহারও সহিত ভাব করিত না বা বেশী মিশিত না। যদিও সুরমা মনোরমার চেয়েও দুই বৎসরের ছোট ও এক ক্ল্যাশ নীচে পড়িত মনোরমা ধনী, সুরমা দরিদ্র বলিলেই হয়, তথাপি মনোরমা সুরমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত ও ভালবাসিত। মনোরমার সমবয়স্কা অনেক মেয়ে আসিয়া মনোরমাকে বলিত ওর সঙ্গে কেন ভাব কর? ও বড় ছোট লোকের মেয়ে ইত্যাদি। মনোরমা শুধু একবার তাহাদিগের প্রতি ক্রুর দৃষ্টিতে তাকাইত, তাহারা আর কিছু বলিতে সাহস করিত না। শান্তস্বভাবা অল্পভাষী লজ্জাশীলা সুরমা অল্পে অল্পে মনোরমাকে নিজের দুঃখের কথা বলিতে লাগিল। মনোরমার হৃদয় বন্ধুর দুঃখে কাতর হইল। ক্রমে ক্রমে সুরমার বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হইল, মনের কথা সব বলিয়া তাহার মন উৎফুল্ল হইল, সে যখন মনোরমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিত, নিজের কষ্ট দুঃখ সব ভুলিয়া যাইত। জীবনের সুখ তাহার মনোরমা, মনোরমাকে সে এত ভালবাসিত এমন ভাল-

বাসা সচরাচর বন্ধুদিগের ভিতর দেখা যায় না। একদিন সুরমা বলিয়াছিল, "দিদি (মনোরমার ইচ্ছায় সে তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিত) তোমাকে আমি এত ভালবাসি যদি দরকার হয় তোমার জন্য প্রাণদান করিতে পারি।" মনোরমা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা দেখিব জীবনে কার ভালবাসা অধিক ও অধিক দিন থাকে।" মনোরমা সুরমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত ও ভালবাসিত কিন্তু কখনও তাহা কথায় বেশী প্রকাশ করিতে ভালবাসিত না। সুরমা মনোরমাকে মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিত, কত রকম আদর করিত, কখনও বা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিত। মনোরমার স্বভাব ঠিক অন্যরূপ খুব যে দিন সুরমাকে ভালবাসা জানাইতে ইচ্ছা করিত সে দিন তাহার মস্তকে হাত রাখিত কিম্বা তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি নিত হস্ত মধ্যে ধরিয়া রাখিত। ইহাতেই সুরমা সন্তুষ্ট; তাহা পাইয়া সে ভাবিত যেন স্বর্গ পাইয়াছে। এইরূপে তাহাদিগের দুই জনের বন্ধুতা স্নেহে প্রেমে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক বৎসর সুখে কাটিল। মনোরমার স্কুল ছাড়িবার সময় হইল। সুরমার প্রফুল্ল মুখখানি বিষণ্ণ হইতে লাগিল। একটি দিনের পর আর একটি দিন যায় এইরূপে বিদায় লইবার দিন নিকটে আসিল। শিক্ষয়িত্রীগণ মনোরমাকে বড় ভালবাসিত তজ্জন্য সে দিন স্কুলে ছুটি হইল। মনোরমা সকলের নিকটে বিদায় লইয়া সর্ব্বশেষে সুরমার নিকটে বিদায় লইল। সুরমা অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। মনোরমার চক্ষে জল ছিল না কিন্তু তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। সে সস্নেহে সুরমাকে বলিল, "আমাকে চিঠি লিখ, আর এই বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ এইটি তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে একটি সোণার হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল।" সুরমার কত কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু কিছুই বলিবার ক্ষমতা ছিল না তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। অবশেষে কতকগুলি চুল কাটিকা মনোরমার হস্তে দান করিল।

মনোরমাকে তাহার পিতা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহাকে ইংরাজী স্কুলে বাজনা, চিত্রবিদ্যা ও বেহালা শিখাইবার জন্য ভর্ত্তী করিয়া দিলেন। মনোরমার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ ছিল, সত্বর সব শিখিয়া ফেলিল। ইংরাজী কথাও বেশ বলিতে পারিত। মনোরমার পিতা তাহার জন্য একটি সৎপাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে মনের মত পাত্র পাইলেন। রাজ-পরিবার হইতে মনোরমার সম্বন্ধ আসিল। রাজকুমারের বয়োঃক্রম বিংশতি বৎসর, বিলাতে গমন করিয়া ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া তিনি একটি সুশিক্ষিতা মেয়ের অন্বেষণ করিতেছিলেন। মনোরমার পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। এত যত্নের আদরের স্নেহপালিতা কন্যাটিকে সৎপাত্রে দান করিতে পারিবেন ভাবিয়া তাঁহার অত্যন্ত

আনন্দ হইল। মনোরমা কি এত সুখে তাহার ক্ষুদ্র দারিদ্রা বন্ধুটিকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন? না। সুরমার জীবনের সব সুখ মনোরমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। সে দিবানিশি মনোরমার কথা ভাবিত। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে ভগবানের চরণে সুরমা কাতর অন্তরে তাহার প্রাণের বন্ধুর জন্য প্রার্থনা করিত। সুরমার আর কিছু ভাল লাগিত না। তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল খুল্লতাতের নির্দ্দয় ব্যবহার তাহার আরও অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। একদা স্কুল হইতে আসিয়া দেখে ভৃত্যরা কেহ আসে নাই। মনোরমা সব কার্য্য করিল। রন্ধনাদি করিবার একটু বিলম্ব হওয়াতে তাহার খুড়ো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলিল, "বাবুর ভারী বড় মানষী বেড়েছে একদিন রাঁধতে পারেন না, দাঁড়া তোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্চি।" সুরমা দেখিল জীবনে যাহা একটু সুখ ছিল তাহাও বুঝি আর পাইবে না, সে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিল, "আজ স্কুল থেকে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, আমি আপনাকে এক্ষণি খাবার করে দিচ্চি।" শ্যামাচরণ চাটুয্যে (সুরমার খুল্লতাত) স্বভাবতঃ বড় রাগী লোক, ক্ষুধার সময় খাবার না পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টি উত্তোলন করিয়া সুরমার পৃষ্ঠে সজোরে মারিলেন। সুরমা নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে কার্য্য করিতে লাগিল। শয়নের পূর্ব্বে সে জানালার পার্শ্বে বসিয়া নিজের দুঃখময় জীবনের কথা ভাবিতেছে এমন সময় একখানি গাড়ীর শব্দ হইল, সে বাহিরে গিয়া দেখে একটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। সুরমা দেখিল মনোরমা তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। একবার হাস্য করিতে লাগিল। এক বার ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে উভয়ের মনের কথা বলিতে লাগিল। সুরমা বলিল, "আমার কাকা এখন ঘুমোচ্চেন ভালই হয়েছে, আমরা দুইজনে খুব মনের সাধে গল্প করিতে পারিব। যাইবার পূর্ব্বে মনোরমা বলিল, "আমাদের বাড়ী তোমাকে যাইতে হইবে, আমার বাবা তোমার কাকাকে এ বিষয় লিখিবেন।" মনোরমা চলিয়া গেল তাহার সঙ্গে আনন্দ সুখও চলিয়া গেল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে শান্ত রাখিয়া গেল। সুরমা কত সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। মনোরমা যখন তাহার পিতাকে সুরমার কথা বলিয়াছিল তখন তাহার পিতা সুরমার পিতার নাম শুনিয়া বলিলেন আমি উহাকে জানি এক সময়ে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, যদিও সে ভয়ঙ্কর রাগী ও দুষ্ট লোক তথাপি আমি তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ।" মনোরমার পিতা সুরমার কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুরমার মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাটীতে আসিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সুরমার জীবনে এই দিনগুলি অত্যন্ত সুখপ্রদ।

এদিকে মনোরমার সম্বন্ধ হইয়া গেল।

বিবাহের দিন স্থির হইল। অতি সমারোহের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। মনোরমা শ্বশুর গৃহে চলিয়া গেল। রাজকুমার দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। যাহারা তাহাকে ও মনোরমাকে দেখিত বলিত ঠিক মিলিয়াছে, এমন মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যই মনোরমাও যেমন মনের মত স্বামী পাইল, রাজকুমারও মনের মত সুন্দর স্ত্রী পাইল। মনোরমা যেমন দেখিতে সুন্দরী তেমনি গুণবতী। অতি অল্প সময়েই তাহার রূপে গুণে শ্বশুর গৃহের সকলে মুগ্ধ হইল। রাজকুমার ইংরাজী স্কুলে পাঠ করিয়াছে। ইংরাজের ন্যায় শিক্ষিত ও পালিত, তার স্ত্রীকেও সেইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিল। মনোরমা পুনরায় গৃহে ইংরাজ মহিলা রাখিয়া পাঠ বাজনা শিল্পকার্য্য ইত্যাদি শিখিতে লাগিল। তাহার মনের ভাবও ইহার সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাইতে লাগিল। শৈশব হইতেই সে একটু স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল, দিন দিন সে ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনোরমা স্বামীর সহিত খোলা গাড়ীতে বেড়াইত, ঘোড়ায় চড়িতে শিখিত, ইংরাজদের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইত। রাজকুমার তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন, তিনি স্বাধীন ভাবেই থাকিতেন। এদিকে সুরমার কি হইল? মনোরমার বিবাহের পূর্ব্বে সে প্রায়ই তাহাদের বাটীতে যাইত কিন্তু বিবাহের পর আর যাওয়া হইত না। শ্যামাচরণ বাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনোরমার পিতার অনুরোধে সুরমাকে তাঁহাদের বাটী পাঠাইত কিন্তু যে দিবসেই সুরমা মনোরমার বাটী যাইত, সে দিবসেই সে তাহার কাকার নিকটে ভৎর্সনা বা প্রহার খাইত, কিন্তু এ কষ্ট সে অনায়াসে সহ্য করিত। মনোরমার নিকটে যাতায়াতে যে সে কত সুখ পাইত তাহার জন্য সে খুব কষ্টও সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল। মনোরমার বিবাহের পর প্রায়ই মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিত। সে সময়ে সুরমাকেও আনাইত।

মনোরমার স্বামীর এক বয়স্ক ছিল। সে এক জমীদার পুত্র। মনোরমার বড় ইচ্ছা ছিল তাহার সহিত সুরমার বিবাহ হয়। মনোরমা মধ্যে মধ্যে যখন পিতৃগৃহে আসিত তাহার স্বামীর বন্ধু জ্যোতিন্দ্র কুমারকে নিমন্ত্রণ করিত। এইরূপে সুরমা ও জ্যোতিন্দ্রের দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হইত। উভয়ের উভয়কে পছন্দ হইল। মনোরমার সুখের সীমা রহিল না। একদিন সুরমাদের বাটী মনোরমা তাহার খুল্লতাতের মত লইতে গেল। প্রথমে কোন মতেই মত দিল না পরে অনেক বলিবার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিতে হইল। মনোরমা গৃহে ফিরিয়া গিয়া সব আয়োজন করিতে লাগিল। সুরমার বস্ত্র গহনা সমুদায়ের ভার মনোরমা নিজে লইল। তাহার পিতা তাহার বন্ধুর প্রতি স্নেহ ভালবাসা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। ক্রমেঃ ক্রমেঃ বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। বলা বাহুল্য সুরমার সম্বন্ধ স্থির হওয়া অবধি সে আর মনোরমার পিতৃগৃহে আসিত না। মনোরমা অনেকবার তাহাকে আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু খুল্লতাতের অনিচ্ছায় সে আসিতে সাহস পাইত না। মনোরমা ভাবিত আর কয়দিন সুরমা কষ্ট সহ্য করিয়া থাকুক, আর কয়েক দিন পরেই তো সে পূর্ণ সুখী হইবে।

সুরমার বিবাহের পূর্ব্ব-রাত্রিতে মনোরমা পিতৃগৃহে আহারের পর সকলের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে এমন সময় একটি বেহারা আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। মনোরমা চিঠি খানি ধীরে ধীরে খুলিয়া পড়িল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে" বলিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

ভবে আসিয়া কি করিলাম?

ভবে আসিয়া কি করিলাম! প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়াছি, এখানে কি করিয়াছি, যাহা সঙ্গে লইয়া পরকালে যাইব। এমন ধন কি পাইয়াছি কি উপার্জ্জন করিয়াছি যাহা দেখিয়া অন্তিমে সুখী হব!

বাল্যকাল হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সকলের মনের মত কাজ করিতে সকলের সঙ্গে সদ্ভাবে থাকিতে, সকলের প্রিয় হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আজ দেখিতেছি একটি কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হই নাই। শৈশব হইতে একটি প্রাণকেও সুখী, কি সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। বাল্যকালে ভাই, ভগিনী, যৌবনে স্বামী, এ বয়সে সন্তানাদি, ইহা ভিন্ন দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন কেহই তো সন্তুষ্ট নহে। তবে কি আমি কিছুই ভাল কাজ করি নাই? যদি করিতাম অবশ্যই কিছু না কিছু সুখ্যাতি পাইতাম। যদি সদ্‌গুণ কিছু থাকিত অবশ্যই অন্যে তাহা বলিত। কিন্তু দেখি দিবানিশি আমার দোষই দেখিতেছ, দোষের কথাই বলে, কৈ গুণ থাকিলে, অবশ্যই গুণের কথা শুনিতাম। এই যে আজীবন অন্যের জন্য এত খাটিলাম, এত করিলাম, প্রতিদান কি পাইলাম? কিছুই না। নিন্দা, অবিশ্বাস, অপ্রেমই যেন পুরস্কার। এই কি তবে এ জীবনের সেবার প্রতিদান!

তবে কি করিলাম, এ ভবে এসে আমি কি করিলাম? এ জীবন তো আর আরম্ভ হবে না। আর শৈশব হবে না, আর যৌবন আসিবে না। তবে কি এ জীবন বৃথায় শেষ হইল? এত আশা, এত ভালবাসা লইয়া জীবন আরম্ভ করিলাম, সযত্নে রক্ষিত ধনগুলি প্রিয়জনদিগকে দিলাম। আর আমার কিছুই নাই। যাহা ছিল সকলই দিয়াছি তবুও কাহারও মন পাই নাই আর এখন আমার কি আছে, কিছুই নাই। বল, বুদ্ধি ক্ষীণ; আশা, উদ্যম শ্রান্ত; হাসি, আমোদ নির্জ্জীব। এখন কেন আমায় কেহ চাহিবে? এ জীবনে আর কাহারও দরকার নাই!

সেই জন্যই আজ ভাবিতেছি ভবে আসিয়া কি করিলাম, এত দিন থাকিয়া এ ভবে কি করিলাম।

যেমন নীরবে আসিয়াছি এ ভবে, সেই ভাবে একাকী, নীরবে চলিয়া যাইব, কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না অভাব থাকিবে না, শূন্য লাগিবে না, সকলেই থাকিবে, সকলেই হাসিবে একা যাইব আমি। পরীক্ষা, ভবের ভয়, দুঃখ, কষ্ট, ভাবনা আমার উপর যাহারা দিয়াছে থাকুক তাহারা সুখে, আমি ভবের পারে সকল ভার ফেলিয়া একা চলিয়া যাইব। আর বলিব ভবের কাজ করিয়া আসিয়াছি, এখন বাড়ী যাই। সঙ্গে থাকিবে কি পুণ্য। পবিত্র চরিত্র আনিয়াছি সঙ্গে, চিরসখি, সেই "পুণ্যসখি" সঙ্গে লইয়া যাইব। তখন ভাবিব না আর "ভবে আসিয়া কি করিলাম।"

স্বর্গীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

(১)

আবার একটি ভগিনী সেই সুদূর দেশে একা চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী সৌদামিনী অকালে দেহলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা, বৃদ্ধা মাতা সকলকে ফেলিয়া সেই অজানিত দেশে চলিয়া গিয়াছেন। সৌদামিনী দেবীর চরিত্র অতি পবিত্র। বেলঘরিয়ার আশ্রম হইতে ইঁহার সরল স্বভাবে সকলে মুগ্ধ হইলেন। লজ্জা, পবিত্রতা সৌদামিনী দেবীর চক্ষে ও ব্যবহারে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। তিনি শিক্ষিতা ছিলেন, ইংরাজী বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল শিক্ষা তাঁহাকে শুষ্ক বাক্যের অধীন কি তাঁহার ব্যবহার গর্ব্বিত করে নাই। সকলে আশ্চর্য্য হইত যে তিনি এত লেখা পড়া শিখিয়া কিরূপে এত লজ্জাশীলা হইলেন। শ্বশুরালয়ে সৌদামিনী দেবী সকলকে ভালবাসিতেন, বধূ বলিয়া সকলে আদর করিতেন সৌদামিনী দেবীও ননদ জা, সকলকে ভগিনীর মত স্নেহ ও শ্বশুরকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় বধূর মত অবগুণ্ঠনবতী হইয়া যাইতেন।

কন্যাদের এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারাও মাতার ন্যায় লজ্জাশীলা। সৌদামিনী দেবীর ন্যায় নীতিপরায়ণা স্ত্রী সকলেরই মাননীয়া ও প্রণম্য। সৌদামিনী ও মোহিনী দেবী আমাদের পূজ্যপাদ নববিধানাচার্য্য দেবের স্নেহের শিষ্যা। তাঁহাদের পৃথিবীর কাজ শেষ হইল স্বদেশে চলিয়া গেলেন। আমাদেরও কার্য্য শেষ হইলে সেই নিত্যানন্দধামে যাইব যেখানে বিচ্ছেদ নাই মৃত্যু নাই, রোগ শোক নাই, কোন দুঃখ যাতনা নাই। যেখানে কেবল আনন্দ নিত্য সুখ শান্তি বিরাজিত, প্রকাশিত।

স্বর্গগতা দেবী সৌদামিনী।

(২)

দেবী সৌদামিনী মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধা জননী, স্বামী, পুত্র, কন্যা আত্মীয় স্বজনগণকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া পরম জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিদারুণ সংবাদে প্রাণ একেবারে স্তম্ভিত হইল। তাঁহার বিচ্ছেদে গতজীবনের কত কথাই আজ স্মরণ হইতেছে। তিনি তখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা বালিকা, আমি যদিও বিবাহিতা ও সন্তানবতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এই সকল বিপরীত অবস্থা প্রাণের সখ্যতার অন্তরায় হইতে পারে নাই। সরলহৃদয়া বালিকা মন খুলিয়া কত কথাই বলিতেন। এক সময়ে একটী উদ্যান বাটীতে ভারতাশ্রমে সকলে একত্র অবস্থানকালে, আমরা দুজনে অনেক সময়ে বাগানে বসিয়া গল্প করিতাম। বালিকা সৌদামিনী বিকাশোন্মুখ হৃদয়ের সকল ভাব বাল্যসুলভ উৎসাহ সহকারে কেমন প্রকাশ করিতেন, এখন তাহা স্মরণ করিয়া মনুষ্য-জীবনের অসারতা, অস্থায়িত্ব উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিতেছি। আজ কোথায় সেই বালিকা সৌদামিনী। আবার স্বামী পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত পরিবারের গৃহিণী, সকলের আশ্রয়স্বরূপিনী সৌদামিনী বা কোথায়। সেই গৃহ আছে, স্বামী আছেন, পুত্র কন্যা আছেন, কেবল সৌদামিনীর নির্ম্মল প্রভা যাহার তেজে সকল অপবিত্রতা মলিনতা সঙ্কুচিত হইত, তাহা আজ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তাহার অভাবে সকলি অন্ধকার হইয়াছে।

উচ্চপদস্থ পাত্রের সহিত পরিণীতা ও নানাবিধ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াও দেবী সৌদামিনীর সমপাঠিদিগের প্রতি স্নেহ প্রেম ও ভক্তি-ভাজন উপদেষ্টাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির কখন ব্যতিক্রম হয় নাই। বিবাহের পর বিদেশে অবস্থান কালে আশ্রমস্থ সকলের সংবাদ আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেন। আবার কবে সকলের সহিত মিলিত হইবেন, মনের এইরূপ ব্যাকুল ভাব প্রতি পত্রেই প্রকাশ পাইত। এক সময়ে লিখিয়াছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইবে শুনিয়া, আমার সেই পূর্ব্বের ন্যায় ভগিনি! আপনাদিগের সহিত একত্রে পড়িতে এবং পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন আমরা সকলে একত্রে থাকিতাম তখনকার কথা মনে পড়িতেছে, আহা ভগিনি! আর কি তেমন সুখের দিন আসিবে।" আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "আপনাদিগের জন্য আমার মনে সর্ব্বদা অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। যখন আমাদের প্রিয়তম আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে, আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। ভগিনি আবার কবে আপনাদিগকে দেখিব। দয়াময় পিতা কবে আমার হৃদয়ের আগ্রহ সফল করিবেন।" বহু বৎসর পরে বিবিধ অবস্থা ও ঘটনাদির জন্য নানা পরিবর্ত্তনের পর যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে পূর্ব্বের সেই ভাবের কখনই পরিবর্ত্তন দেখি নাই। সমপাঠিকা ও বাল্যবন্ধুদিগের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয় তাঁহার হৃদয়ে চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

স্বামীর উচ্চপদযোগ্য সকল প্রকার লোক সমাজে তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হইত। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে এবং বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদিগের সহিত মিশিতে হইত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিরূপে আত্ম-সম্মান ও চরিত্রের গৌরব রক্ষা করিয়া জনসমাজে ও বিদেশীয় সভ্যসমাজে মিশিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শুনিয়াছি তাঁহার স্বামীর কার্য্যোপলক্ষে উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থান কালে, তথাকার কোন ইংরাজ রাজপুরুষ দেবী সৌদামিনীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এ দেশীয় অনেক ভদ্রমহিলা এখন বিদেশীয়দিগের সহিত স্বাধীন ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই যেমন মনে একটা ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উদয় হয় এরূপ যোগ্য মহিলা অতি বিরল।

দেবী সৌদামিনীর ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ আস্থা ও স্বীয় ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার কতদূর যত্ন ও মনের বল ছিল, তাহা তাঁহার পারিবারিক জীবনে ও পারিবারিক বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রকাশ পাইয়াছে। কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিম্বা কাহারও অনুরোধে কখন স্বীয় ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই। কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন ধর্ম্ম ও উপাসনা বিহীন শুষ্ক ভাব অপেক্ষা, যে সকল ভাব ও আয়োজনকে অনেকে কুসংস্কার বলিয়া থাকেন, তাহাও শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়।

যে স্নেহময়ী জননীকে শোকে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার প্রতি দেবী সৌদামিনীর শিশু সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন ছিল। তাঁহাকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিবার জন্য সতত চিন্তিত ও ব্যাকুল হইতেন। বিলাসপ্রিয় রমণীদিগের ন্যায় তিনি কখন আপনার শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যস্ত হইতেন না, বরং সে বিষয়ে দৃষ্টিপাতই করিতেন না। পুত্র কন্যাগণ ও পরিবারস্থ সকলে যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করে এবং সন্তানগণের যাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা হয় তদ্বিষয়ে সতত যত্নবতী থাকিতেন।

আমি দেবী সৌদামিনীর জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত নহি। তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে। তাঁহার বিচ্ছেদে পূর্ব্বের সকল কথা স্মরণ পথে উদয় হইয়া স্বতঃই এই কথাগুলি লেখনি-অগ্রে উপস্থিত হইল, তাই না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মঙ্গলময় বিধাতা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই সংসার হইতে অবসৃত করিলেন, আমাদের অল্প জ্ঞানে তাহা অবধারণ করিতে কিরূপে সক্ষম হইব। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, দেবী সৌদামিনী যেন আমাকেই শিক্ষা দিবার জন্য এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে বলিতেছেন, ভগিনি আর সংসার মায়ায় বদ্ধ থাকিও না, তোমারও অন্তিম সময় অদূরে, অতএব প্রস্তুত হও। দয়াময় আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে স্বর্গের এই ইঙ্গিত স্মরণ রাখিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।

সঙ্গীত।

(গোপার নিকট সিদ্ধার্থের বিদায় গ্রহণ)

আজি আনন্দের খেলা হল সমাপন।
জন্মের তরে যাই ছাড়ি বিলাস ভবন।
তুমি প্রিয়ে মহাসতী, যশোধরা পুণ্যবতী
সিদ্ধার্থের আদরের অমূল্য রতন।
ওঠগো ওঠ আমার জীবনের ধন॥
হৃদি-সিংহাসনে, রাখিয়ে যতনে,
নীরবে গোপনে গোপা কর্‌ব আলাপন;
সম্ভাষ পতি বলে জনমের মতন।
কেঁদনা কেঁদনা সখি! আমার লাগিয়ে,
ভুলনা ভুলনা মোরে নিঠুর ভাবিয়ে,
চির-ভিখারী আমি, তুমি প্রেম আভরণ।
জরা মৃত্যু ব্যাধিভরা, দেখ এই বসুন্ধরা
তাই সতী তোমা ছাড়ি যায় সিদ্ধরথ,
বর মেগো বিভুপদে হই পূর্ণকাম।
তৎকার্য্য সাধিয়ে, আসিব গো ফিরিয়ে
দোঁহে গাব বিভু নাম প্রাণে প্রাণে মিলে,
জগত জনে সুখী হবে লভিয়ে নির্ব্বাণ।
ক্ষম প্রিয়ে যশোধরা, আজি এ ঘোর নিশীথে,
ছাড়ি তোমা ধনে যাই দেশ দেশান্তর,
বিদায় দাও প্রিয়ে খুলি কমল নয়ন।

(বনবাসে লক্ষ্মণের প্রতি সীতা দেবী)

কেন গো দেবর লক্ষ্মণ কেন অকারণে।
চলে যাও তুমি ফেলি একা আমারে এ ঘোর কাননে।
কি দোষে দয়াময়, পতি ত্যজিলেন আমায়,
বল রে, স্নেহের দেবর, সুধাই কাতর প্রাণে।
ধরণী দুহিতা আমি, জনম দুঃখিনী,
বিনা নাথ অনাথের নাথ, (রঘুনাথ)
জীবন ধরি কেমনে।

পত্র।

প্রিয় ভগিনি,

শুনিলাম তুমি নাকি "পরিচারিকার" জন্য কেহ কিছু পাঠাইলে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ কর। অন্যের "কিছু" অর্থ আমার পক্ষে "অধিক" হইতে পারে। আমি পল্লীগ্রামের একজন কুলবধূ পিত্রালয়ও একটি পল্লীগ্রাম, শ্বশুরালয়ও তাহাই। সুতরাং আমি সহরের শিক্ষাদি, অর্থাৎ লেখা পড়া কিছুই জানি না। অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, যাহা কিছু শিখিয়াছি পতির যত্ন, অনুগ্রহে। তিনি সপ্তাহে দুইবার বাড়ী আসেন, আমার পড়া অভ্যস্ত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামের কুলবধূর লেখা পড়া বড় অসুবিধায় করিতে হয়। আমার তো চারিদিকে, শ্বাশুড়ী, ননদ, জা, দেবর, তাহা ছাড়া দাসীগুলিও সর্ব্বদা গোয়েন্দার কাজ করে। আমি কখনও ভাণ্ডারে চালের জালার পাশে, কখনও তরকারীর ধামার আড়ালে কখনও উনুনের দিকে ফিরিয়া বই পড়ি। কি করিব যদি কেহ নিন্দা করে এই ভয়ে বই আজও কাহাকেও দেখাই নাই।

আমি কলিকাতা মনে মনে কল্পনা করিয়া ছবি আঁকিয়া চক্ষের সমক্ষে সদাই দেখি। আমার স্বামী বলেন, কলিকাতায় কেহ মূর্খ নাই, সব বিদ্বান; কেহ দরিদ্র নাই, সব ধনী; কেহ কুৎসিত নাই, সব সুন্দর ইত্যাদি। সুতরাং আমার এই বিশ্বাস কলিকাতা মহানগরী, তীর্থ-ধাম। সেখানে তাহলে সকলে ভাল। সেখানে কোন শ্বাশুড়ী বউকে যন্ত্রণা দেয় না, কারণ আমার স্বামী বলেন সেখানে সকলে নিজ নিজ সংসার করে। কেহ জা, ননদ লইয়া ঘর করে না। আরও বলেন স্ত্রীলোকগণ সেখানে খুব স্বাধীন পুরুষের সমতুল্য। কি চমৎ-কার, ইচ্ছা হয় দেখি। নারীরা কি সেখানে পুরুষদের মত চাপকান পরিয়া আফিসে যান? আমার এ সব কিছুই হইল না; আমি বড় মূর্খ। তবে তুমি নিজ গুণে যদি আমার দুই একটি প্রবন্ধ লও আমি অত্যন্ত বাধিত হইব, আর আমার স্বামীর মাষ্টার হওয়া সার্থক হইবে।

স্নেহ প্রার্থিনী.....।

পাক বিধি।

কলার রুটি।—কলার রুটি খাইতে যেমন সুখাদ্য, সেইরূপ আবার পুষ্টিকর। উহা আলু অপেক্ষা কম পুষ্টিকর নহে। মান্দ্রাজে কোন কোন গৃহস্থ কলার আটা বা ময়দার রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করিয়া থাকেন। এ দেশেও উহার ব্যবহার করিলে বিস্তর উপকার হইবার কথা।

প্রথমে কলার খোসা ছাড়াইবে। পরে পাৎলা আকারে কাটিয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে শুকাইবার সময় পাৎলা কাপড়ে ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ ধূলা প্রভৃতি কোন প্রকার রোগ-জনক পদার্থ পড়িতে পায় না। কলার চাকাগুলি উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে পিশিয়া তদ্বারা ময়দা প্রস্তুত করিবে। ময়দা প্রস্তুত হইলে তাহা পাৎলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ আটা ছিপি আঁটা বোতল বা তদ্রূপ কোন পাত্রে রাখিবে। কারণ বাতাস লাগিলে, উহা গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রয়োজন হইলে বোতল হইতে ময়দা বাহির করিয়া লইবে। ময়দার রুটির ন্যায় উহারও রুটি প্রস্তুত করিতে হয়! কলার রুটি মিষ্ট আস্বা-দের হইয়া থাকে। এই রুটি কিছুদিন আহার করিলে শরীর মোটা হইয়া উঠে, শিশুকে পর্য্যন্ত এই রুটি আহার করান যাইতে পারে।—(প্রতিবাসী)

ভাপা দই।—প্রথমতঃ পাঁচ সের খাঁটি দুগ্ধে আধ সের চিনি দিয়া পরিষ্কার থক্-থকে গোচের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে সেই ক্ষীর শীতল হইলে আধ ছটাক আন্দাজ জল শূন্য দই ও একটু গোলাপ জল দিয়া মাখিতে হইবে এবং একটী মাটির তেলা সরাতে অল্প ঘৃতের হস্ত মাখাইয়া তাহাতে ঐ প্রস্তুত ক্ষীর সুবি-ন্যস্ত করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহার

উপর আর একটী সরা উপুড় করিয়া ঢাকিয়া দিবে ও কাপড়ের টুক্‌রা দিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফেলিবে। একটী হাঁড়ি করিয়া জল জ্বালে চড়াইতে হইবে কিন্তু জ্বাল অল্প হওয়া চাই। কাঠের কয়লার আগুনেই ভাল হয় অভাব পক্ষে পাথুরিয়া কুচো কয়লার নিবন্ত আঁচে করিতে পারা যায়। সেই জলের হাঁড়ির উপরে ঢাকনাযুক্ত ক্ষীরের সরা বসাইয়া দিবে পরে জল ফুটিতে থাকিবে এবং তাহার ভাপে ভাপা দই প্রস্তুত হইবে। আধ ঘণ্টা তিন কোয়াটার আন্দাজ হইতে দিলেই সরার মধ্যে ক্ষীর চাপ বাঁধিয়া যাইবে। তখন একবার দেখিয়া নামাইয়া রাখিয়া দিবে। পরে আট দশ ঘণ্টা পরে (চার পাঁচ ঘণ্টা পরেও হয়) বেশ শীতল হইলে বর্ফীর আকারে কাটিয়া আত্মীয় স্বজনদিগকে খাইতে দিবে। এই বর্ফীর উপরে গোলাপ ফুলের পাতা বা পেস্তার কুচি ছড়াইয়া দিলে খুব সুন্দর দেখিতে হয়। ভাই পাঠিকা, যদিও ইহা কিছু ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু প্রিয়জনকে খাওয়াইলে জানিতে পারিবে ইহার মূল্য কি! ইহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও আস্বাদন একবার পরীক্ষা করিও এই অনুরোধ। উপরি উক্ত পরিমাণ অল্প করিয়াও লওয়া যায়।

ছানার রমণ চাকৃতি।—নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে ছানার এই রমণ চাকৃতি অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহাকে নিরামিষ কট্‌লেট বলিলেও বড় দোষ হয় না। একটু অম্ল-রস-বিশিষ্ট ছানা দ্বারা এই খাদ্য প্রস্তুত করিলে অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে। মিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন ছানার দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ভাজা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানার কালিয়া, কোর্ম্মা, কট্‌লেট এবং চপ্ প্রভৃতি বহুবিধ নিরা-মিষ খাদ্য পাক করিতে পারা যায়।

প্রথমে, ছানার জল নিংড়াইয়া লইবে। জল নির্গত হইলে, চন্দনের মত করিয়া, ছানা চট্‌কাইয়া বা বাটিয়া লইবে। এখন, তাহাতে আদার রস, * জায়ফল, লবঙ্গ ও দারচিনির গুঁড়া, লঙ্কা-বাটা বা গুঁড়া, লবণ এবং সফেদা মিশাইয়া দলিয়া বা মাখিয়া লইবে।

ভিতরে পূর দেওয়ার জন্য পুদিনা, ধনে শাক কাঁচা লঙ্কা এবং অল্প তেঁতুলের মাড়ি এক সঙ্গে মিশাইবে। শাক ও লঙ্কা খুব মিহি করিয়া কুচাইয়া লইবে। পরে, তাহাতে অল্প চিনি ও লবণ মিশা-ইয়া চট্‌কাইয়া, কাদার মত করিবে।

এখন, পূর্ব্ব-প্রস্তুত ছানার এক একটি গুছি কাটিয়া, রসগোল্লার ন্যায় গোল করিবে, এবং টিপিয়া তাহার মধ্যে একটি গর্ত্ত করিবে। এই গর্ত্তে, শাকের পূরের সঙ্গে দুই একটি কিস্‌মিস্ দিয়া, উহা পাকাইয়া, গোল বা বাদামী যে কোন আকারে গড়াইয়া রাখিবে।

এদিকে ভাজিবার জন্য ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। এই ঘৃতে পরিমাণ-মত চাকৃতি ছাড়িয়া দিবে। ঘৃতে দুই পিঠ উত্তমরূপ

* রুচি অনুসারে এই সময় পিঁয়াজের রসও মিশাইতে পার।

ভাজা হইলে, তুলিয়া লইবে। এইরূপে সমুদয়গুলি ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লইবে। যদি এককালে অনেকগুলি চাকৃতি ভাজার দরকার হয়, তবে ঘৃতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, অর্থাৎ ঘৃতে ছানার কুচি প্রভৃতি পড়িয়া, যে খাঁকরি পড়িবে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দেবে। কারণ তদ্দ্বারা ঘৃতের রঙ্ ময়লা হইবার সম্ভাবনা। ময়লা ঘৃতে ভাজিলে, ভাজা দেখিতে কাল হইবে।

FROM BABU KESHUB CHUNDER SEN, *
TO C. H. TAWNEY, ESQ., M.A.,
Registrar, Calcutta University.

SIR,

I have the honor to submit for the consideration of the Faculty of Arts the following observations and suggestions relative to the admission of women to the University Examinations in Arts. I have no doubt that the subject will receive at the hands of the University that attentive and thorough consideration which is due to its importance.

The subjects of examination prescribed by the University for the Entrance and the First Arts course, require to be slightly modified, so as to be adapted to the peculiar wants and capacities of the female mind, and the present condition of female society in this country. It is obvious that not only does woman need some degree of specific education to fit her for her special sphere of life, but the standard of female education in India must also differ, at least for some time to come, from that which has been found to suit the higher civilization of England. In advocating an altered course of instruction and examination for our women, I would not in the least lower the present standard of merit or lessen the value of University honors. All that I contend for is that certain subjects ought to be omitted and others of a more suitable character substituted. The utmost care should also be taken in the selection of books, so that such as contain anything indelicate or otherwise objectionable may be strictly excluded.

Instead of the Entrance and First Arts Examinations, I should propose the *Ordinary Certificate* and *Honor Certificate* Examinations, and the following course of studies :—

ORDINARY CERTIFICATE.

1. ENGLISH, AND A VERNACULAR LANGUAGE :—Composition. Translation, Grammar.

[The course should include books or chapters on Domestic Economy and the Laws of Health.]

2. HISTORY AND GEOGRAPHY :—History of India. Geography ; Europe, Asia, India.

3. ARITHMETIC :—The four simple rules ; Vulgar and Decimal Fractions ; Reduction ; Practice ; Interest ; Extraction of Square Root.

4. PHYSICAL SCIENCE :—Properties of Matter ; General knowledge of the earth's dimensions and figure ; Cause of the season ; Eclipses ; Air ; Water ; The senses ; Human food.

5. MORAL SCIENCE.

6. DRAWING.

HONOR CERIFICATE.

1. ENGLISH, AND A VERNACULAR LANGUAGE :—Composition. Translation. Grammar.

2. HISTORY OF ENGLAND AND PHYSICAL GEOGRAPHY.

3. ARITHMETIC.

4. PHYSICAL SCIENCE :—Zoology. Popular Astronomy.

5. MORAL SCIENCE.

6. DRAWING.

Some of the above subjects might be made optional, if necessary.

The examination of female candidates should be conducted in a separate room under the supervision of ladies.

Should the above suggestions meet with the general approval of the Faculty, I shall be happy to do myself the honor of submitting hereafter a more detailed scheme.

I have the honor to be,
SIR,
Your most obedient servant,
KESHUB CHUNDER SEN.

* The above letter was written in 1868 when the attention of the Calcutta University was engaged for imparting high education to Native girls.

সংবাদ।

আশ্চর্য্য ঘটনা।

ভগবান যে নিরুপায়ের উপায় অসহায়ের সহায় এবং বিচারপতি নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটি পাঠ করিলে আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাইব।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের অন্তর্বর্ত্তী পদ্মপাটি নামক গ্রাম হইতে একটি স্ত্রীলোক নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে গমন করিতেছিলেন। তিনি এক শকটে আরোহণ করিয়াছিলেন। শকটে কোচমান ছাড়া একজন পুরুষ তাঁহার সহযাত্রী ছিল। সহযাত্রীটি ভদ্রলোক। কিয়দ্দূর যাইবার পর সহযাত্রী ভদ্র ভাষায় স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "আপনি যে গ্রামে যাত্রা করিতেছেন আমিও সেই গ্রামে যাইতেছি, আপনি যদি ইচ্ছা করেন এখান হইতে সরু পথ আছে সেই রাস্তা দিয়া পদব্রজে যাইলে আমরা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গ্রামে পৌঁছিতে পারিব।" ইহাতে স্ত্রীলোকটি সম্মত হইলেন, এবং শকট হইতে নামিয়া সহযাত্রীর সহিত একটা সরু পথে চলিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল এবং গাড়ীর কোচমান সঙ্গে না থাকায় স্ত্রীলোকটি দেখিলেন উক্ত পুরুষটিই তাঁহার একমাত্র সহায়। কিয়ৎদূরে একটি কূপ ছিল। উহার নিকটবর্ত্তী হইলে সহযাত্রী তাঁহাকে বলিল, "আপনার সমস্ত গহনা আমাকে দিন।" স্ত্রীলোকটি সভয়ে সমুদায় গহনা খুলিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরে তাঁহার কাপড় চাহিল, নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক অনিচ্ছার সহিত তাহাও তাহাকে দিলেন ও বলিলেন, "তুমি দয়া করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও।" সহসা পুরুষের মনে কি এক দুষ্ট অভিসন্ধি হইল, সে স্ত্রীলোকটিকে নিকটস্থ কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সৌভাগ্যক্রমে কূপে জল অধিক ছিল না। ইহা দেখিয়া পুরুষটি এক প্রস্তর খণ্ড উত্তোলন করিয়া স্ত্রীলোকটির মস্তকের উপর

নিক্ষেপ করিল। সেটি তাহার মস্তকে লাগিল না দেখিয়া পুনর্ব্বার আর এক প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিল। তাহাও তাহাকে স্পর্শ করিল না দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া নিকটস্থ এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা স্ত্রীলোকটির প্রাণনাশ করিবার জন্য উত্তোলন করিতে গিয়া ভয়ানক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে আমি মরিয়া যাইতেছি।" স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিলেন, "উপযুক্ত ফল পাইয়াছ।" কিছুক্ষণ পরে সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পাপের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়া মহাপাপী প্রাণত্যাগ করিল। সমস্ত রাত্রি একা অসহায় স্ত্রীলোকটি কূপমধ্যে পড়িয়া রহিলেন। খুব চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, কেহ শুনিল না। পরদিন প্রাতে কয়েক জন পথিক সেই পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন রমণীকণ্ঠ শুনিয়া সেই পথে গিয়া দেখেন এক বৃহৎ সর্প বনমধ্যে পলাইতেছে ও এক মৃত দেহ কূপের নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে এবং কূপমধ্যে এক অসহায় নারী। তাঁহারা প্রথমে এক বস্ত্রখণ্ড কূপমধ্যে ফেলিয়া দিলেন, স্ত্রীলোক তাহা পরিধান করিলে তাঁহাকে উঠাইয়া নিকটস্থ ষ্টেসনে ডাক্তারখানায় লইয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি জলের মধ্যে থাকিয়া মৎসের দংশনে ও তাঁহাকে সজোরে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। ভগবান পাপীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অসহায় রমণীকে আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা করিলেন।

স্বর্ণরেণু।

নির্ব্বাণের প্রথম শুদ্ধি ও অন্তে প্রেম।

স্বর্গীয় প্রেম দূরতা ও স্বতন্ত্রতা জানে না।

এই ভূমণ্ডলে ঘৃণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না, কিন্তু প্রেমের দ্বারা ঘৃণা পরাস্ত হয়।

অন্তর বিশুদ্ধ হইলে আর বাহ্য পদার্থ সকল অন্তরেন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

এক ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে বটে, কিন্তু যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

যোগ ভক্তি সমাধি ধ্যান প্রেম বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম পুণ্য ও ত্যাগস্বীকার এই স্বর্গীয় ধন তাঁহাদের জীবনবৃক্ষের সুস্বাদু ফল।

মহাপুরুষেরা শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধুতা, দৃষ্টান্ত, পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় গভীর দেশে ইহকালে জীবিত থাকেন।

বিপদে বিচলিত বা ভীত হইবে না। অনেক বিপদ দেখিয়াও স্থির প্রশান্ত থাকিবে। যে বিপদে মঙ্গল অন্বেষণ করে সে বিপদকে সহজেই জয় করিতে পারে।

২৬ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। [২য় সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Years. JUNE, 1903. No. 2.

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।	বিষয়।		পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	২৫	সঙ্গীত	...	৩২
সতীত্ব	...	২৬	গল্প	...	৩৩
নির্জ্জন-চিন্তা	...	২৭	সব ভাল যার শেষ ভাল	...	৩৮
দুরন্ত ঝড়	...	২৭	স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম		৪৬
ভগিনী-বিদায়	...	২৮	পাক বিধি	...	৪৭
সান্ত্বনা	...	২৯	স্বর্ণরেণু	...	৪৮
পত্র (প্রাপ্ত)	..	৩০			

কলিকাতা,

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

জনৈক সদাশয় হিন্দু রাজার সাহায্যে প্রচারিত।
সনাতন ধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্র।

হিন্দুধর্ম্মালোক।

সচিত্র "হিন্দুধর্ম্মালোক" মাসিক পত্র।

সাধক, সন্ন্যাসী, অধ্যাপক ও কৃতবিদ্য লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনই পত্রিকার উদ্দেশ্য। সুনীতি, সঙ্গীত, যোগ, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, বেদতত্ত্ব, তন্ত্রতত্ত্ব, উপনিষদ, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু হিন্দু হৃদয়েপ্সিত জিনিস তাহাই আলোচ্য বিষয়। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম সভাদির প্রদত্ত বক্তৃতা, সাধক জীবনী, তীর্থসমূহের আমূল বিবরণ, নানাদেশীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত, লুপ্তপ্রায় বিবিধ শাস্ত্রের উদ্ধার, জ্যোতিস গ্রন্থ প্রকাশ। বিবিধ আর্য্য শাস্ত্র আলোচনা। সমাজতত্ত্ব, যুগতত্ত্ব, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় সন্দর্ভে পরিশোভিত মাসিক পত্র। হিন্দুর আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরম প্রীতিকর পারমার্থিক বিবিধ তত্ত্বালোচনাপূর্ণ সমালোচক মাসিক পত্র। ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু মাত্রেই গ্রাহক হইয়া স্বদেশ এবং হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরব কাহিনী অবগত হউন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান।—পরিব্রাজক পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সরস্বতী। কাশীধাম অগস্ত্য-কুণ্ড হিন্দুধর্ম্মালোক পত্রিকা আফিস, আনন্দ-কুটীর দশাশ্বমেধ রোড। ৺কাশীধাম "ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, জুন ১৯০৩ [২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অর্দ্ধ সের তুলা হইতে ৪৭৭০ মাইল ব্যাপী সুতা বাহির করা গিয়াছে!

দুই ছটাক গোলাপের আতর প্রস্তুত করিতে প্রায় এক সহস্র গোলাপ বৃক্ষের প্রয়োজন।

শুনিতে পাওয়া যায় সকল জাতি অপেক্ষা প্যাটাগোনিয়ান্‌গণ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি এবং ল্যাপলণ্ডবাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি।

ইটালি দেশে অলিভ্ বা জলপাই বৃক্ষের শাখায় এক প্রকার ক্ষুদ্র চারা দেখা যায় তাহা হইতে উজ্জ্বল নীলাভাযুক্ত সুন্দর আলোক বিনির্গত হয়। ইহা কখনও কখনও এত উজ্জ্বল হয় যে দিবসের আলোকও সে জ্যোতি ঢাকিতে পারে না। বিশ্বরাজ্যে সেই মহাকবির কতই বিচিত্র লীলা।

মীসর দেশবাসীগণকে নিজ বাসগৃহ অপেক্ষা কবর স্থান নির্ম্মাণ করিতে অধিক যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। তাহারা বলে এ জীবন তো অল্পকালস্থায়ী তার বাসের জন্য বেশী ব্যয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ কবরই যখন দেহের চির-বাসস্থান তাহাই ভালরূপে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য!

ম্যাডাগাস্‌কারে আর এক প্রকার আশ্চর্য্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহাকে "Traveller's tree" বা "পথিকের বৃক্ষ" বলিয়া থাকে। বৃক্ষগুলির শাখা প্রশাখা কিছুই নাই! বৃক্ষ হইতেই পাতা বাহির হয়। প্রতি বৃক্ষে প্রায় ২৪টি করিয়া পাতা হয়, পাতাগুলি ছয় হইতে আট ফিট দৈর্ঘ্যে আর চার হইতে ছয় ফিট প্রস্থে প্রায় হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পাতার নীম্নভাগে ক্ষুদ্র পাত্রের ন্যায় আছে তাহা সুমিষ্ট শীতল স্বচ্ছ বারিতে পূর্ণ থাকে। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণ সেই জল পান করিয়া অশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। ইহাও কি দয়াময় পিতার অনন্ত স্নেহের আর একটি প্রমাণ নহে?

সতীত্ব।

সতীত্ব, কি সুন্দর ভাবপূর্ণ পবিত্র শব্দটী। আমরা পুরাকালে কতই সতীর কথা শুনিতে পাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি পতিপ্রাণা সতীগণের কথা শুনিলে প্রাণে কতই না আনন্দ অনুভব করি। আমাদের দেশে যেমন সতীর প্রাদুর্ভাব এমন আর কোন দেশে? আমাদের দেশে যেমন সতীর গৌরব এমন আর কোন দেশে? কিন্তু হায়, সতীগণের সতীত্বের এমন গৌরব এমন সব জ্বলন্ত আদর্শ সত্ত্বেও বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিলে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। আকাশ এবং পাতাল প্রভেদের যদি সীমা থাকে কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রভেদের যে সীমা আছে তাহা তো বোধ হয় না। সীতা সাবিত্রীগণের পতির সহিত যে মধুর সম্পর্ক শুনিতে পাই, এখন কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সে সম্পর্ক আছে? বিবাহ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটী মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করে, আমাদের জ্ঞান ইহা বলিয়া দেয় বটে, কিন্তু সে সম্পর্কের মর্য্যাদা আমরা রাখিতে পারি কৈ? তাঁহারা পৃথিবীতে স্বামী ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না, স্বামীর চরণ সেবাই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের ধারণা ছিল, কিন্তু আমাদের ভিতর সে ভাবের কতদূর অভাব বুঝিতে পারি কি? স্বামীর চরণ সেবা দূরের কথা, যদি স্ত্রীর কোন ত্রুটী কিম্বা দোষ দেখিয়া তিনি সামান্য ভৎর্সনা করেন, তবেই আর স্ত্রীর অপমানের শেষ থাকে না। পুরাকালে স্বামীর দাসত্বই যেমন জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, বর্ত্তমানে স্বামীর নিকটে ছোট হইব, ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি আছে? তর্কে স্বামী যদি হারিয়া গেলেন, তাহা হইলে স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। স্বামীকে নীচু করিতে স্পৃহা! ধিক্ আমাদের জীবনকে! তবে কেন আমরা আমাদিগের দেশে অমুক অমুক সতী আছেন এবং সতীত্বের এত আদর বলিয়া অহঙ্কার করি? ইহাতে তাঁহাদের নামকে কলঙ্কিত করা হয় মাত্র। যদি তাঁহাদের পথের পথিক না হইলাম তবে কেন তাঁহাদের নাম রসনায় আনয়ন করি? ভগবান প্রজাপতির নিকট কত অপরাধী হইতেছি তাহার কি শেষ আছে? পৃথিবীতে যদি স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব যথার্থরূপে বুঝিতে না পারি, তবে ভগবানকে যখন, "স্বামীর স্বামী" "পতির পতি" বলিয়া সম্বোধন করিব, তখন কেমন করিয়া তাঁর মহিমা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিব? তিনি কি তখন "কপট" বলিয়া ভৎর্সনা করিবেন না?

বর্ত্তমান বিধানের প্রত্যেক নারীর জীবনে সতীত্বের গৌরব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। পতিপ্রাণা সতী সাবিত্রীগণের পদানুসরণ করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করি।

নির্জ্জন চিন্তা।

নির্জ্জন চিন্তা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদের প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যেমন সংসারের প্রত্যেক কার্য্যটি না দেখিলে গৃহিণীর গার্হস্থ্য সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে তেমনই প্রতিদিন কিছুকালের জন্য নির্জ্জন চিন্তা না করিলে গৃহিণীর ধর্ম্ম কর্ম্মে সুখ ইচ্ছা অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠে।

নির্জ্জনে একাকী বসিলে, নিজের কথাই প্রথমে মনে আসে। "আমি কে এ সংসারে" "কেন আসিলাম" "কি করিতেছি এ সংসারে" "কোথায় দেহ অন্তে যাইব।" এই সকল কথা মনে আসিবার সম্ভাবনা এবং এই সকল কথার প্রশ্নোত্তরে নারীর জীবন স্বর্গ-সুখের আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দিন কোলাহলপূর্ণ সংসারে থাকিয়া যেমন সন্ধ্যার সময় একটু বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য শরীর ব্যস্ত হয় সেইরূপ মনও এই জড় জগতের নানারূপ অসার ভয় ভাবনায় বিক্ষিপ্ত হইয়া এক একবার নির্জ্জন-চিন্তায় বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করে। সূর্য্যের সঙ্গে দিনব্যাপী কাজ করিয়া সন্ধ্যার সুশীতল বাতাসে চন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া নির্জ্জন-চিন্তা করিলে আত্মার কত উপকার হয়। নির্জ্জনে যেমন আপনাপনি কথা হয়, এমন আর কোথাও হয় না।

যদি নির্জ্জন-চিন্তা ভাল না লাগে, জানিবে মনের কোন ব্যাধি উপস্থিত, যাহা স্বাভাবিক তাহা যদি ভাল না লাগে তবেই প্রকৃতি কোন না কোন স্থানে বিকৃত।

সংসারের কার্য্য করিতে করিতে, এই সংসারের, মায়া মমতার সম্পর্কীয় যত আত্মীয়, প্রিয়জনের জড় দেহ দেখিতে দেখিতে যদি দেহ অন্ত হয় পরকালে গিয়া জীব কি দেখিবে? চক্ষু মুদিলে সেই নিরাকার রাজ্যে কেবল নিরাকার আত্মাই যাইবে। যাহাদের স্থূল জড় দেহের সঙ্গেই, এত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া দিবানিশি তাহাই দেখিতেছে তবে এই জড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলে কি আর দেখিবে?

কেবলই জড়-চিন্তা দিবানিশি করিলে আত্মার কথা কখন ভাবিবে? আত্মার কথা, পরলোকের কথা ভাবিতে হইলে, সংসারের কোলাহলে বধির হইতে হইবে, যদি বধির হইবে, তবে নির্জ্জন-চিন্তা আবশ্যক। সকল গৃহিণীর ইহা দরকার গৃহিণী আরম্ভ করিলে সন্তান, সন্ততি সকলেই করিবে, সংসারও অনুকূল হইবে। অতএব প্রতি গৃহিণীর প্রতিদিন নির্জ্জন-চিন্তা আবশ্যক।

দুরন্ত ঝড়।

বিচিত্র লীলাময় হরির এ একটি বিচিত্র খেলা। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিল, চারিদিক ঘন অন্ধকারময়। দিনের বেলা যেন রজনীর অন্ধকার। প্রকৃতি দেবী যেন

মূহুর্ত্ত মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। প্রথমে অল্প অল্প বাতাস বহিল, শেষে দ্রুতবেগে শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল, মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল, বিদ্যুৎ দেখা দিতে লাগিল। বৃষ্টি বহিল প্রবল বেগে, ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ চারিদিক মহাগর্জ্জনে ধরাতল কম্পিত করিল। চিত্ত অস্থির হইল এ কি কোথা হইতে এমন শান্ত স্থির প্রকৃতিকে অস্থির করিতে এ দুরন্ত ঝড় আসিল। দেখিতে দেখিতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব স্থির, আবার আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গাছগুলি এই মাত্র স্নান করিয়া পরিষ্কৃত হইল। পাখীগুলি ডাকিতে লাগিল। চারিদিকে রাস্তা ঘাটে কে যেন জল ঢালিয়া ক্ষণেকের ভিতর পরিষ্কৃত করিয়া দিল। এত বড় বিশ্বরাজ্য কোন জলবাহকের সাধ্য হইত পরিষ্কার করিতে প্রভঞ্জন আসিয়া সব যেন ঝাড়িয়া দিল, পরে শুদ্ধ নির্ম্মল বারি আসিয়া সুন্দর বৃক্ষগুলি রাস্তা ঘাট মলিন ছিল নির্ম্মল পরিষ্কৃত করিয়া চলিয়া গেল। প্রকৃতি সতী হাসিয়া উঠিল। নদী খাল বিল বৃক্ষ সব হাসিল। আমার ক্ষুদ্র মনও প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক প্রাণ হইয়া আনন্দে হাসিল। আর লীলা বিহারী হরি যে নিয়ত আমাদের জন্য কত সুখ দিতেছেন ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিল।

ভগিনী-বিদায়।

(১)

দুদিন আনন্দস্রোতে ভাসায়ে হৃদয়,
ভগ্নিগণ! আজি কি গো লইলে বিদায়?
তোমাদের স্নেহ প্রীতি,
স্বর্গীয় প্রার্থনা গীতি,
হইতেছে প্রতিধ্বনি অন্তর মাঝার,
—ভুলি নাই ভুলিব না এ জনমে আর!

(২)

পক্ষান্তরে পূর্ণচন্দ্র উদিয়া গগনে,
ঘুচায় আঁধার রাশি;
তার রূপে যায় ভাসি,
জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, বিমল কিরণে,
ত্রিদিবের ধারা যেন বরষে ভুবনে!

(৩)

বর্ষ পরে সেইরূপ তোমরা ভগিনী—
(মধুর বৈশাখোৎসবে মধুর হাসিনী)
এ দেশে উদয় হ'লে, সুধাস্বরে মাতাইলে,
শুষ্ক রসহীন এই অবোধের প্রাণী;
ধন্য জন্ম তোমাদের—ধন্য গো ভগিনী!

(৪)

যে পবিত্রা দেবী-ক্রোড়ে লভেছ জনম,
তেমনি নির্ম্মল মন,
তেমনি হাস্য বদন,
তেমনি সৌজন্য প্রীতি লভিয়াছ হায়!
তোমাদের সাম্য জ্ঞান, তুলনা কোথায়!

(৫)

কতই সুন্দর দৃশ্য দেখালে সবারে,
সীতা সাবিত্রীর রূপে মন মুগ্ধ করে!
যখন যে বেশ পর,
মানবের চিত্ত হর,
মনে হয় অমরার দেববালাগণ;
স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্ত্যে করিছ ভ্রমণ!

(৬)

কাঁদিছে হৃদয় আজ ব্যাকুল হইয়া,
হৃদয় বীণার তার গিয়াছে ছিঁড়িয়া!
সত্যই কি যাবে তবে?
কত দিনে দেখা হবে?
তোমাদের ও মূরতি স্নেহের আধার,
কত দিন হেরিব না নয়নেতে আর!

(৭)

দীন হীন, আমি, নাহি কিছুই শকতি!
তাই এই অশ্রুহার,
—(অতি তুচ্ছ অবজ্ঞার)
দিলাম গো মাখি ইহা হৃদয়ের প্রীতি,
পরম পবিত্র ইহা নিরমল অতি,

(৮)

আবার কি হবে দেখা? তাঁরি ইচ্ছা সব!
যাঁহার ইচ্ছায় হয়, মূহুর্ত্তে সৃজন লয়,
মরু মাঝে হাসে নদী, শোকেতে উৎসব,
তাঁহার ইচ্ছায় নহে কিছু অসম্ভব!

(৯)

লও স্নেহ ভালবাসা প্রীত নমস্কার!
লও এই দুই বিন্দু নয়নের ধার,
যদি ইচ্ছা হয় মনে,
এই মূর্খ ক্ষুদ্র জনে,
স্নেহের আশ্রিত ব'লে করিও স্মরণ,
আর কিছু নাহি চাই প্রিয় ভগ্নিগণ!

স্নেহাভিলাষিণী ভগ্নী

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

সান্ত্বনা।

Of all the thoughts of God that are
Borne in word unto souls afar
Along the Psalmist's music deep
Now tell me if that any is
For gift or grace surpassing this—
"He giveth His beloved sleep."

কি চমৎকার কথা! কি শান্তিময়, সান্ত্বনাপূর্ণ ভাব! শোক কাতর হৃদয় যখন এই সুন্দর পদগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে, তখন সে হৃদয়ে "শোক ও শান্তি" মিলিত হয়। কিন্তু আমরা অধৈর্য্য, অবোধ স্বার্থপর তাই ইহার মহত্ব, মাধুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না, কেবল প্রিয়জনের অভাবে শোকে অধীর হইয়া পড়িয়া থাকি। দয়াময় এই অশান্তিময়, কোলাহলময় পৃথিবী হইতে তাঁহার প্রিয়জনকে ডাকিয়া লইয়া অনন্তশান্তিনিদ্রা, অনন্তপ্রেমনিদ্রা, অনন্তসুখনিদ্রা দান করেন। আমরা ইহার পরিবর্ত্তে কি দিতে পারি? ভালবাসার কি অপরূপ শক্তি! যে মৃত্যুকে আমরা পূর্ব্বে ভয় করিতাম, যে অজানিত রাজ্যের কথা মনে করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, শরীর শিহরিত, সেই রাজ্যের ভীষণ দ্বার খুলিয়া, কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা তুলিয়া যখন আমাদের প্রিয়জন তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যান, তখন সেই অন্ধকার রাজ্য, একটি চির-পরিচিত, স্নেহময় প্রেম উজ্জ্বল মুখে আলোকিত হয় এবং সেই

ভীষণ অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। তখন তাহাতে প্রবেশ করিতে, মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না—মরিতে ভয়ও হয় না, অনিচ্ছাও হয় না।

যখন জানি সেই ঘোর অন্ধকারময় মৃত্যুরাজ্যের অপর পারে কোন প্রিয়জন অপেক্ষা করিতেছে, তখন মৃত্যুর অর্দ্ধেক ভীষণতা চলিয়া যায়, পৃথিবীরও অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়।

যাহার জননী কোল পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কাছে মৃত্যুচিন্তা কি সুখ শান্তিময়! শৈশবে যেমন ভয়-বিহ্বল শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া অন্ধকার ঘরে লইয়া যাইতেন, তেমনি সময় আসিলে স্নেহময়ী মা আমার, তাঁহার সন্তানকে মৃত্যুর অন্ধকারময় ঘর পার করিয়া, অনন্ত প্রভাতে অনন্ত আলোকে লইয়া যাইবেন।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

পত্র।

(প্রাপ্ত)

প্রিয় পরিচারিকা,

অনেক দিন পরে আজ তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। চিঠিখানা হয় তো একটু বড় হবে, কারণ আমার একটা ভ্রমণের কথা লিখ্‌ব। সে দিন জয়ন্তী নামক পর্ব্বত-পদ প্রান্তের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থানের অতুল শোভা, সকলকে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র যাত্রীদলকে এত সুখী ক'রেছিল, ভাবিলাম পরিচারিকা তুমি সে কথা শুনিতে ইচ্ছা করিবে ও শুনিলে সুখী হবে, সে জন্য আজ চিঠি লিখিতে এলাম।

কুচবিহারের উত্তরে এই জয়ন্তী প্রদেশ। ৩২ মাইল রেলের গাড়ীতে ঘণ্টা তিন চারির মধ্যে এই সুন্দর দেশে যাওয়া যায়।

কুচবিহারের মহারাণীর ইচ্ছা হইল এই দেশ দর্শন করিবেন। স্নেহের সহিত তাঁহার যাত্রীদলে আমাকেও আহ্বান করিলেন। প্রত্যূষে পাঁচটার সময় আমরা স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত হইলাম। তখন আকাশ যদিও মেঘশূন্য ছিল না, তথাপি বৃষ্টি ছিল না, কিন্তু অল্পক্ষণেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতে যাওয়া বন্ধ হইল না। ক্ষুদ্র যাত্রীদল রেলের গাড়ীতে সাড়ে ছয়টা প্রাতঃকালে জয়ন্তী অভিমুখে চলিল। আলিপুর ষ্টেসনের পর "রাজাভাত খাওয়া" নামক ষ্টেসনে গাড়ী একটু বেশীক্ষণ থামিল। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী অনেক চা বাগানের সাহেবেরা যাতায়াত করে। আমাদের সঙ্গে জনৈক চায়ের সাহেব ছিল, তাহার সঙ্গে অনেক রৌপ্য মুদ্রা ছিল, সজোরে সেই সকল টাকার থলি ষ্টেসনে জমীর উপর ফেলিল। টাকার শব্দে আমরা (এমনই সাহসী!) পরস্পরে বলিতে লাগিলাম, "এত টাকার শব্দ কেন করিতেছে, এই টাকার লোভে এখনই ইহাকে কেহ মারিয়া ফেলিবে।" পরে দেখি তাহার টাকা কড়ি একটা হাতীর উপর উঠাইল শুনিলাম ২০ মাইল সে

হাতী করিয়া তাহার চার বাগানে যাবে। জানি না সে টাকার জন্য প্রাণ দিয়াছে কি নিরাপদে বাড়ী গিয়াছে।

রাজাভাত খাওয়ার পর বক্সা নামে ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বতীয় দেশ। এই ষ্টেসন একেবারে জঙ্গলের ভিতর। পাহাড় তেমন উচ্চ নহে, তথাপি পর্ব্বতের শীত সে দেশে বেশ আছে। এই বক্সা ষ্টেসন হইতে বন ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল বুন হাতীর পায়ের চিহ্ন রেলপথের ধারে ধারে দেখা গেল। বৃক্ষরাজির ঘন বনের ভিতরও পুষ্পবৃক্ষ-রাজি শোভিত; কি যে সে শোভা। চারিদিকে কেবল প্রকৃতি মধ্যে একটি জড় হস্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র রেলপথ। গাড়ী ধীরে ধীরে গিরি অঙ্গে উঠিতে লাগিল কারণ জয়ন্তী অল্পোচ্চ পর্ব্বত অঙ্গে প্রতি-ষ্ঠিত। প্রকৃতির শোভা আরও বাড়িল, অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলাম সে শোভা। প্রায় সাড়ে দশটার সময় জয়ন্তী পঁহুছিলাম, এ দেশের নাম জয়ন্তী, নদীর নামও জয়ন্তী। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র, সুন্দরী জয়ন্তী নদীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই নদীবক্ষে সেই মুহূর্ত্তে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি-লাম। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। স্থির হইল কিছু জলযোগ করিয়া উপাসনা করিতে নদীতীরে যাইব। যদিও ডাক বাঙ্গলা নদীর অতি নিকটে তথাপি সেখানে কুলিদিগের বসতি বলিয়া সে ঘাটে স্নান কি উপাসনা হইল না! হাতী পৃষ্ঠে করিয়া কিয়দ্দূর গিয়া উপাসনা হইল। এক দিকে পর্ব্বত ও পর্ব্বতের নিম্নে ঘন বৃক্ষরাজি, অপর দিকেও ঘন বন, মধ্যে প্রশস্ত নদী সে যে কি শোভা, না দেখিলে বুঝা যায় না। যদিও নদীর প্রশস্ত কলেবর কিন্তু জলে এখনও সমস্ত অঙ্গ লুকায়িত হয় নাই। সুতরাং নদীর বক্ষে বসিয়াই উপাসনা হইল। মহারাণী উপাসনা করিলেন, নদীর সঙ্গে সমস্ত উপাসনার ভাব যেন এক হইয়া গেল। নূতন দুইটি গান হইল। সকলে প্রাণভরে এই উপাসনা সম্ভোগ করিলাম এই সময় একটু সূর্য্যের উত্তাপ অধিক হইয়াছিল কিন্তু নদীর রূপ আমাদের সে উত্তাপে কষ্টও দিল না আর অন্য কিছুতে আকৃষ্ট করিল না। সুন্দরী, লাবণ্যময়ী নদী কেমন সুন্দর। সূর্য্যের প্রখর কিরণ, নদীর জল উত্তপ্ত করিতে পারে না, শত শত শিলাখণ্ড নদীর জল কঠোর করে না, সহস্র সহস্র মানব দেহের মালিন্য ধৌত করিলেও নদীর জল কলঙ্কিত, কলুষিত হয় না। সতী, সাধ্বীর জীবন এ সংসারে নদীরই মত। সহস্র বিঘ্ন, বাধা সত্ত্বেও সতীর জীবন চিরদিন স্বর্গ-তুল্য।

উপাসনার পর আমরা আবার স্নান করিলাম। জয়ন্তী শীতল জলে, স্নিগ্ধ কোলে সকলের দেহ মনে শান্তি দিলেন। স্নানের পর ডাক বাঙ্গলায় ফিরিলাম। আহারাদি মহারাণীর দয়াতে বিশেষরূপে হইল। আহারের পর কেহ কেহ আবার নদীতে বেড়াইতে গেলেন।

জয়ন্তীর ছবি সে দিন সকল যাত্রীই

যে ভালরূপে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা গাড়ীতে উঠিলাম, কুচবিহার অভিমুখে গাড়ী চলিল। তখন আগত সন্ধ্যা। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তখন প্রাতঃকালের মত নহে। প্রত্যূষে বৃষ্টির অবিরল ধারায় স্নান করিয়া প্রকৃতি যেন প্রকৃতিপতির পূজার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, আর সন্ধ্যার সময় যেন নীরবে নিঃশব্দে পুষ্পরাজি ফুটাইয়া, খদ্যোতিকা ডাকিয়া প্রভুর চরণ প্রান্তে বসিয়া আছেন। কেমন স্নিগ্ধ, কেমন তৃপ্তিকর শোভা। জয়ন্তীর আশে পাশে, চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় না, এ পৃথিবীতে কোলাহলময় সংসার বলিয়া কোন স্থান আছে, এ যেন স্বর্গ, এ যেন যোগী ঋষি পত্নীর তপোবন। জয়ন্তীর পথও কি প্রকৃতি দেবী তেমনই সুন্দর করেছেন, কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল শোভা। জড়ের জড়ত্ব কোথাও নাই। আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কুচবিহার পঁহুছিলাম। কাহারও মুখে শ্রান্তির ভাব নাই, সকলেই হাসিতে হাসিতে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরিলাম। সকলেই যে সে দিন জয়ন্তী হইতে কিছু লাভ করিয়া আনিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পবিত্র তীর্থস্থান সকল অক্ষয় ধন-ভাণ্ডার খুলিয়া যাত্রীর অপেক্ষা করে, শূন্য হাতে কেহ কি ফিরিতে পারে?

পরিচারিকা, তুমি যদি কখনও সুবিধা করিতে পার অবশ্য করিয়া একবার জয়ন্তী দর্শন করিও। কি যে আনন্দ পাইবে।

জয়ন্তীর একটি প্রিয় ও অনুগত
পরিচারিকা।

সঙ্গীত।

বলগো জয়ন্তী বল কে তোমারে সাজাইল?
কোমল সুন্দর অঙ্গে হিম নীর কে ঢালিল?
তুমি কি শৈল-দুহিতা,
যোগেশ্বরের প্রিয়-সুতা
ছাড়ি তবে পিতা মাতা ধাইছ বল কোথায়,
বল সতী কার উদ্দেশে,
যাও তুমি কোন্ দেশে
কিবা সমাচার আনে সমীরণ পরিমল।
লইয়ে উত্তপ্ত দেহ, যদি তব কাছে কেহ,
আসে জুড়াইতে, তুমি লওগো তারে কোলে;
স্নেহভরে বক্ষে তুলে,
স্নিগ্ধ করি শীতল জলে,
দাও শান্তি দেহ মনে কর তারে চিরশীতল।
নীরবে নির্জ্জনে একা,
কিগো ভাব বসে সদা,
বলিবে কি দয়া করে আমায় তোমার
মনের কথা,
নাহি হেথা তমোজাল,
মোহ পাপ জঞ্জাল,
নাহিক নাহিক হেথা সংসারের কোলাহল।
গাও সতী নাম গাও,
মধুর স্বরে হরিনাম গাও,
ব্রহ্মানন্দে মেতে গাও জগতজনে শুনাও,
তুমি সতী স্রোতস্বিনী,
করগো মোদের সঙ্গিনী,
লয়ে চল তোমার সঙ্গে যোগাচলে।

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে একখানি ছোট বাড়ীতে শ্যামাচরণ বাবু ও সুরমা বাস করিত। আজ সে গলী লোকে পরিপূর্ণ। গৃহের চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। সকলেই ব্যস্ত হইয়া এত গোলমালের কারণ জানিবার জন্য দৌড়িতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে খুন হইয়াছে। অবশেষে কয়েকটি কনষ্টেবল গৃহে প্রবেশ করিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া বাহিরে আসিল। সকলে তখন জানিল বাড়ীতে খুন হইয়াছে। শ্যামাচরণ বাবুর গৃহে একটি ক্ষুদ্র শয্যার উপর তিনি শয়ন করিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে একটি পিস্তল পড়িয়া আছে। নিকটে বালিকা সুরমা ভূমিতে বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে ও ক্রন্দন করিতেছে। একজন পুলিসের লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহ আছে তো বল খবর দিই।" সুরমা মনোরমার পিতার নিকটে সংবাদ দিল। কিছুক্ষণ পরেই মনোরমা ও তাহার পিতা আসিলেন; সুরমাকে মনোরমা তাহার বাটীতে লইয়া গেল। আর তাহার পিতা পুলিসকে সব খবর দিয়া সৎকার ইত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরমাকে সকলে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল তাহার বিবাহের দিনের পূর্ব্বরাত্রিতে তাহার খুড়ো সহসা আসিয়া বলিলেন "আজ তোর বিয়ে হবে আমি খুব ভাল বর এনেছি; দেখ্‌বি তাকে?" এই বলিয়া জানালা খুলিয়া আমাকে দেখিতে ডাকিলেন। আমি দেখিলাম পাশের ঘরে চৌকিতে এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। আমি আমার খুড়োর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "আমাকে মেরে ফেল তাতে দুঃখ নাই কিন্তু উহার সঙ্গে আমার বিবাহ দিও না।" ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা আমার ইচ্ছাতে বিবাহ কর্‌বি না? এখনি তোর বিবাহ দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি আমাকে যষ্টি দ্বারা সজোরে প্রহার করিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে মনোরমাকে একখানি পত্র লিখিলাম কিন্তু পাঠাইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন। আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। আমি শেষে নিরুপায় হইয়া সেই বৃদ্ধটির নিকট গিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলাম আমি বিবাহ করিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধটি আমার খুড়োর কানে কানে কি বলিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। অবশেষে খুড়ো এসে বল্লেন, কাল তোর বিয়ের দিন তার আগেই তোর বিয়ে দিয়ে দেব। সমস্ত রাত্রিতে আমার বড় ভয় হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধটিকে আর ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে খুড়োর ঘরে গিয়া এই ভয়ানক দুর্ঘটনা দেখি।" সুরমার কথা শুনিয়া সকলে জানিতে পারিল, শ্যামাচরণ বাবু

আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখে করিয়াছেন কেন করিলেন কেহ বুঝিতে পারিল না। মনোরমা যে পত্রখানি পাইয়াছিল সুরমা তাহাতে লিখিয়াছিল, "আমার খুড়ার ইচ্ছায় আমার আজ বিবাহ হইয়া গিয়াছে পাত্রটি বেশ ভাল আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে।" বলা বাহুল্য তাহার খুল্লতাত নিজের মনের মত এই চিঠিখানি লিখিয়া সেই রাত্রিতে পাঠাইয়া দেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে সকলের ইচ্ছায় সুরমার জ্যোতিন্দ্র কুমারের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। তাহারা খুব সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল, মনোরমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এদিকে মনোরমার পিতার মনে বড় সন্দেহ হইয়াছিল, তিনি মনোরমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ আমার তো কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না যে শ্যামাচরণ বাবু আত্মহত্যা করিয়াছেন, তিনি যদিও বড় রাগী ছিলেন কিন্তু তিনি যে নিজে আত্মহত্যা করিবেন ইহা সম্ভব নয়।" মনোরমা বলিল কাহাকে তোমার সন্দেহ হয় বাড়ীর কোন চাকরকে? তিনি উত্তর করিলেন, "চাকরেরা বাড়ীতে তো কেহ ছিল না।" মনোরমা বলিয়া উঠিল, "সুরমা ছাড়া তো আর বাড়ীতে কেহই ছিল না" বলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল, তাহার পিতা কি সুরমাকে সন্দেহ করিতেছেন? না, না, তাহা সম্ভব নয়, সুরমা লজ্জাশীলা, শান্তস্বভাবা, স্নেহময়ী, কোমলপ্রাণা সে এ কার্য্য করিবে ইহাও কি সম্ভব!

তাহার পিতা যেন তাহার চিন্তা সব জানিতে পারিলেন তিনি বলিলেন, "মনোরমা তুমি যাহা ভাবিতেছ বুঝিয়াছি, আমি তাহাকেই সন্দেহ করি।" মনোরমার চক্ষে জল আসিল কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া আসিল শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, বলিল "বাবা তবে কি তুমি সুরমাকে বিচার করাইয়া তাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠাইতে চাও? তুমি এত নির্দ্দয় হইবে? সুরমাকে দেখ, দেখ সে কত সুখী। তাহার খুড়ো যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে আর তাহার এ সুখ হইত না, দেখ সে মরিয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে। তুমি কোন প্রাণে সুরমার সুখের সংসারে আগুণ জ্বালাইবে।" মনোরমার পিতা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ছি মনোরমা তোমার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি পাপ পুণ্যের বিচার হইবে না যে মহাপাপী সে সুখে বাস করিবে? যদিও শ্যামাচরণ বাবু সুরমার প্রতি খুব নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি তিনি এক সময়ে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া ইহার বিষয় অনুসন্ধান করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। যদি সুরমার সংসারে আগুণ জ্বালাইতে হয় তাহাও জ্বালাইব কিন্তু বিচার করিবই।" মনোরমা বন্ধুর জন্য কাতর হইয়া অনেক কথা বলিল কিছুতেই তাহার পিতার মত বদলাইতে পারিল না। অবশেষে মনোরমা পিতার হাতখানি মস্তকে রাখিয়া বলিল, "বাবা তুমি কি আমাকে ভালবাস না? আমাকে কি চির-অসুখী

করিবে, আমি মনে করি সুরমা নির্দ্দোষী কেন সে কথা আর বিচার করিবে, পুলিস তো সন্তুষ্ট হইয়াছে, তুমি কেন আবার সে কথা তুলিতেছ? আমাকে যদি একটুও ভালবাস তবে আর ও কথা তুল না।" তাহার পিতা বলিলেন, "মা মনোরমা তোমাকে আমি ভালবাসিনা এ রকম মনে ক'র না, তোমাকে সুখী করিতে আমি চাহি না এ কথা ব'ল না, তোমার হাসি মুখখানি দেখিলে কত আনন্দ হয়, এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি যে আমার জীবনের একমাত্র সুখ। তবে দেখ আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দিও না। ইহার যদি বিচার না করি তবে আমার মহাপাপ হইবে, যে এক সময়ে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে তাহার জন্য আমি যদি ইহা না করি তবে আমার মহাপাপ হইবে।" মনোরমার অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল নিকটে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, তাহার জীবনের সুখসূর্য্য অস্তমিত প্রায় বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমার আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। রাজকুমার আসিয়া স্ত্রীর বিষন্ন মুখখানি দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইল পরে তাহার শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে সব কথা জানিতে পারিল। ইহার দুই দিবস পরে সুরমার নিকট হইতে মনোরমা একখানি পত্র পাইল। তাহাতে লিখিয়াছে—

"প্রাণের দিদি আমার, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন। তুমি যে আমার কত উপকার করিয়াছ তাহা বলিতে পারি না। আমার মত এত সুখী বোধহয় এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। কখনও যে জীবনে দুঃখ পাইয়াছিলাম তাহা মনে হয় না। যার জন্য এত সুখ পেলাম সেই প্রাণের বোন্‌টির জন্য সতত ভগবানের চরণে মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা দুই জনে যদি কিছুদিনের জন্য এখানে আইস বড় সুখী হইব। রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়া উভয়ে আসিও, নিরাশ করিও না।

তোমার বাল্যসঙ্গিনী সুরমা।

মনোরমা চিঠিখানি পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল হায় সুরমার এত সুখ, নিমেষ মধ্যে চলিয়া যাইবে? কি অসার ও ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ! মনোরমা তার স্বামীকে পত্রখানি পড়িতে দিল। রাজকুমার পত্র পাঠ করিয়া বলিল, "দেখ আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি সুরমার সঙ্গে বেশী ভাব রাখ, আমি তাহার বিষয় যে রকম শুনিলাম তাহা শুনিয়া তাহার সঙ্গে একেবারেই না ভাব রাখা উচিত মনে করি, আহা তাহার স্বামীর কি কষ্ট হইবে যখন এই কথা শুনিবে, অমন স্ত্রীর মৃত্যুই ভাল।" মনোরমা মৃদুস্বরে বলিল, "তুমিও সুরমাকে দোষী মনে কর? রাজকুমার বলিলেন, "যাহা শুনিলাম তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেখ মনো, তুমি কেন অত কষ্ট কর্‌ছ আমাদের ভগবান কত সুখ দিয়াছেন আমরা কত সুখী কেন পরের কথা ভেবে অত দুঃখ কর্‌ছ? যদি সে দোষী হয় তবে তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাওয়া

উচিত।" মনোরমা বলিল, "সে নির্দ্দোষী আমার বেশ মনে হচ্চে, কেন আর তাহাকে বিচার করা? রাজকুমার বলিলেন, "যদি নির্দ্দোষী হয় তবে তো ভালই হইবে, তাহার সঙ্গে আমরা আরও ভাব করিব।" মনোরমার দুঃখের ভার তথাপি লাঘব হইল না। পিতার অতুল স্নেহ, স্বামীর গভীর ভালবাসা আত্মীয় স্বজনের আদর প্রেম, সুখ স্বচ্ছন্দতা কিছুই তাহার হৃদয়ের দুঃখভার লাঘব করিতে পারিল না। সে বন্ধুর দুঃখে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। মনোরমার পিতা এদিকে যথাসাধ্য সন্ধান করিতে লাগিলেন। মনোরমার মুখ দেখিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত, কিন্তু কি করিবেন এ কার্য্য তাঁহার করা ধর্ম্ম এই জানিয়া তিনি প্রাণপণে ইহা সাধন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার মনোরমাকে বিষণ্ণ ও অত্যন্ত অসুখী দেখিয়া প্রাণপণে তাহাকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মনোরমা কাহারও সহিত দেখা করিতে ভালবাসিত না কাহারও বাটীতে যাইতে ইচ্ছা করিত না, যদি কখনও স্বামীর অনুরোধে যাইত তবে অল্পক্ষণ থাকিয়াই বলিত, "অসুখ করিতেছে বাড়ী যাইব।" তাহার প্রফুল্ল মুখখানি দিন দিন আরও বিষণ্ণ হইতে লাগিল। রাজকুমার স্ত্রীর কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত অসুখী হইল। ইহার এক মাস পরে এক দিন মনোরমার পিতা তাহার বাটীতে আসিয়া মনোরমাকে বলিলেন, "তোমার বড় কষ্ট হবে শুনে কিন্তু কি করিব আমি এত দিন চেষ্টা করিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছি সুরমাই দোষী তাহারই হস্তে শ্যামাচরণের মৃত্যু হইয়াছে। আমি কাল তাহার স্বামীকে এ বিষয়ে লিখিব।" মনোরমার পিতা ভাবিয়াছিলেন মনোরমা এ কথা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিবে ও সুরমা নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে চাহিবে। কিন্তু মনোরমা তাহা কিছুই করিল না। ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল একটি হস্ত বক্ষের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক করিয়াছ বাবা যে দোষী তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাওয়া উচিত, কিন্তু যে নির্দ্দোষী তাহার কোন কষ্ট পাওয়া উচিত নয় আর দোষীর জন্যও কোন নির্দ্দোষীর কষ্ট করা উচিত নয়, তাহা যেন কেহ না করে।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। তাঁহার পিতা একটু ভয় পাইলেন রাজকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা আমার বড় ভয় হচ্চে মনোরমার এ রকম মনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার মস্তিষ্কে কোন গোল হয় নাই তো?" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "তাহা হয় নাই বরং কয়েক দিন হইতে তাহার শরীরও ভাল বোধ হইতেছে মন প্রফুল্ল বোধ হইতেছে। আমার সঙ্গে এখন আর সুরমার বিষয় কিছু বলে না আগেকার কথা বলে, অনেকটা আগেকার মত হইয়াছে বোধ হয় এখন জানিতেছে সুরমাই যথার্থ দোষী।"

সে রাত্রিতে মনোরমার হাসি গল্প আর

থামে না। পূর্ব্বের কথা বলিয়া বিবাহের সময়ে কি হইয়াছিল সেই সকল কথা বলিয়া আমোদ করিতে লাগিল। মনোরমা পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ করিতেছে দেখিয়া রাজকুমারের অত্যন্ত আনন্দ হইল। সে দিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া মনোরমা বলিল, "প্রিয়তম কখনও আমাকে ভুলিবে না, চিরদিন ভালবাসিবে?" রাজকুমার একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মনো কি বল্‌ছ আমি কি তোমাকে কখনও ভুলিতে পারি? চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারিব না। তোমাকে ছাড়া কাহাকেও ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। কেন তুমি আজ এ প্রশ্ন করিতেছ বুঝিতেছি না।" মনোরমা ধীরে ধীরে নিজ হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয় স্বামীর হস্তে পরাইয়া দিল। রাজকুমার এ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইল ও ভাবিল আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রহরীর কার্য্য করিব মনোরমাকে কোথাও যাইতে দিব না আমার মনে হইতেছে সে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু হায় সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে সক্ষম হইল না। কেনই বা এক ঘোর নিশীথে পতিপ্রাণা গোপা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ গোপনে পলাইয়া গেলেন? কেনই বা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষে নিদ্রা আসিল যে সুযোগ পাইয়া চৈতন্যদেব চিরজনমের তরে তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরসন্ন্যাস ব্রত সাধনে বাহির হইলেন! এই অন্ধকার ঘোর নিশীথে তাঁহারা পলাইয়াছিলেন। সেইরূপ আজও মনোরমা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে নিদ্রিত স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া জন্মের মত একবার তাঁহার মুখ দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। নিদ্রিত রাজকুমার কিছুই জানিতে পারিল না ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল। মনোরমা চিরদিনের মত স্বামীগৃহ ছাড়িয়া চলিল, কোথায় যাইবে ঠিক নাই; যে দিকে চক্ষু যায় সেই দিকে চলিল। কেহই জানিল না কেহই বুঝিল না। এ দিকে রাজকুমার প্রাতে উঠিয়া দেখে ঘরে মনোরমা নাই যাহা ভয় পাইয়াছিল তাহাই ঘটিল নাকি? এই ভাবিয়া দৌড়িয়া বাহিরে গিয়া সমস্ত অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথাও না পাইয়া অবশেষে পুনর্ব্বার শয়ন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সেখানে দেখিল টেবিলের উপরে দুইখানি চিঠি রহিয়াছে, একখানি তার নামে আর একখানি তাহার শ্বশুরের নামে মনোরমার হাতের লেখা! তবে মনোরমা সত্যই পলাইয়াছে এই ভাবিয়া সে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। হায় সে কেন নিদ্রাভিভূত হইল কেন সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে পারিল না। এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সব ভাল যার শেষ ভাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

Bayswaterএ একটি লজিং হাউসে একজন বাঙ্গালি যুবক তাহার শয়ন ঘরে একটি ট্রাঙ্ক খুলিয়া, ভিতরের জিনিষ উল্‌টিয়া কি খুঁজিতেছিল। তাহার মুখ মলিন অধর শুষ্ক, চোখে চিন্তার ভাব। দ্বারের বাহিরে আরও দুই একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালি যুবক অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মুখ ও চক্ষু আরক্তিম দেহ টলিয়া টলিয়া পড়িতেছে। তাহার মধ্যে একজন জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল—"I say Roy, be quick, don't go to sleep over it.—(ওহে রায়, শীঘ্র কর, ঘুমাচ্ছ নাকি ?)

জ্যোতিন্দ্র নাথ রায় কোন উত্তর না দিয়া বাক্স ঘাঁটিতে লাগিল। হঠাৎ কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ফটো ঘরের মেজেতে পড়িয়া গেল। জ্যোতিন্দ্র দেখিল তাহার মাতার ফটো। বহুদিন পর আজ এই মুখচ্ছবির উপর তাহার নয়ন পড়িল, ছবিখানা হাতে উঠাইয়া লইল। জননীর সেই চিরপরিচিত স্নেহময়ী মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল যেন সেই স্নেহপূর্ণ নয়নে এক করুণ তিরস্কারের ভাব আসিল। গত দুই মাসের কথা সব মনে পড়িল, যুবকের চোখ জলে ভরিল, অধর কাঁপিতে লাগিল, আগ্রহপূর্ণ নয়নে সেই মুখের দিকে চাহিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল, "মা গো ক্ষমা কর, আর না, আর না—" ফোঁটা ফোঁটা চখের জলে ফটোখানা ভিজিল। এমন সময় বাহির হইতে তাহার বাঙ্গালি বন্ধু মাতৃ ভাষায় বলিয়া উঠিল,—"ওহে, আর কত দেরী। খেলা যে আরম্ভ হবে। না পাও, থাক্। আজ তো আমরা হার্‌বো না।"

জ্যোতিন্দ্রের এতক্ষণে জ্ঞান হইল। দ্বার খুলিয়া, দাঁড়াইয়া বলিল, "I say I am not going. And look here, don't you ask me to your infernal gambling games again." (আমি যাবো না, আর দেখ তোমাদের এই ছাই জুয়া খেলাতে আমাকে আর যেতে বলো না।)

"Hullo, what's the row.—(কি হলো আবার।)

"Nothing, I have got to study for my exam now."—(কিছু নয়, আমাকে পরীক্ষার জন্য পড়্‌তে হবে।)

"তোর হাতে এটা কি ?" বলিয়া একজন সেই ফটোখানা জ্যোতিন্দ্রের হাত হইতে হটাৎ কাড়িয়া লইল।

"আমার মার ফটো" তাহার দৃঢ় স্বরে "এখন দাও, আর যাও" বলিয়া জ্যোতিন্দ্র ফটোখানা লইল।

"রায় যে আজ হঠাৎ ধার্ম্মিক হলে। আহা, মার জন্য খোকার মন কেমন কর্‌ছে" বলিয়া কর্কশ স্বরে যুবক হা হা করিয়া বিদ্রূপ ভরিয়া হাসিল।

জ্যোতিন্দ্রের চোখ লাল হইল, ঘৃণাপূর্ণ নয়নে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "You better take care." (দেখ হে সাবধান হও।)

জ্যোতিন্দ্রের বলিষ্ঠ দীর্ঘ শরীরের প্রতি ও তাহার ক্রোধরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া বন্ধুদ্বয় দেখিল গতিক ভাল নয়। জড়িত স্বরে অনর্গল বকিতে বকিতে টলিতে টলিতে তাহারা নীচে নাবিয়া গেল। জ্যোতিন্দ্রের এত দিন পরে চোখ খুলিল, সঙ্গীগণ কি প্রকার তাহা আজ হঠাৎ বুঝিতে পারিল। নিজের কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহাও আজ বুঝিল। জ্যোতিন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাক্স ঘাঁটিতে লাগিল। যাহা খুঁজিতেছিল তাহা পাইল। একটি ছোট মখমলের কেসে একটি বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিল।

সেই পুরাতন কথা। বিলাতে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া বাঙ্গালি যুবক প্রলোভনময় লণ্ডন সহরের সমুদায় প্রলোভনে ডুবিয়াছে। মদ তো খাইত, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর এক ঘোর নেশায় মাতাল ছিল, ইহা জুয়া খেলা। এই বন্ধুদ্বয়ই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। প্রথমে তামাসার ছলে, আমোদের নামে এক পেনি চার পেনি এক সিলিং হইতে খেলা আরম্ভ হয়, ক্রমে এক পাউণ্ড হইতে ৩০।৪০ পাউণ্ড অবধি খেলিতে লাগিল। প্রথমে কেবল জিতিল, তাহার পর কেবল হারিতে লাগিল—কেন তাহার কারণ বুঝিতে পারিত না, কিন্তু সেই বন্ধুদ্বয় বোধ হয় জানিত। জ্যোতিন্দ্রের ক্রমে ৮০ পাউণ্ড ধার হইয়াছিল। আর দেরী করা যায় না। কিন্তু কিরূপে হঠাৎ এত টাকা সংগ্রহ করিবে। জ্যোতিন্দ্র দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র।

ভাবি শ্বশুরের নিকট কোন্ মুখে টাকা চাহিবে। জ্যোতিন স্বদেশে অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বাল্যকাল হইতেই সমুদায় পরীক্ষায় উত্তমরূপ উত্তীর্ণ হইয়া, বৃত্তি পাইয়া সকলের মনে অনেক আশা দেয়। পরলোকগত পিতার ধনী বন্ধু রাধানাথ বসু জ্যোতিন্দ্রকে জামাতা করিবেন স্থির করিলেন। তিনি হাই কোর্টের উকিল ব্রাহ্ম সমাজের লোক। রাধানাথ বাবুর কন্যা লীলার সহিত জ্যোতিন্দ্র Engaged হইয়া বিলাত যাত্রা করে, এবং তাঁহারই অর্থ সাহায্যে সমুদায় ব্যয় চলিতেছিল।

তখন লীলার বার বৎসর বয়স ছিল। আসিবার পূর্ব্বে মার নিকট পিতার এই আংটিটি চাহিয়া লইয়াছিল। আজ উহা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকার যোগাড় করিবে স্থির করিয়াছিল, আর বাকি টাকা ? উহা যোগাড় করিবার নিমিত্ত আর একজন বাঙ্গালি যুবকের মাথা খাইতে উদ্যত হইয়াছিল। এই ছেলেটি তাহার বন্ধুদ্বয়ের শিকার জালে পড়িয়াছিল। তাহারা জ্যোতিন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল যে খেলায় ঠকাইয়া এই ছেলেটির কাছে তিন জনে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিবে—বেশ সুবিধাও ছিল, কারণ এই নূতন সঙ্গী ধনীর পুত্র। কিন্তু পতির পতি, দরিদ্রের ধন যিনি তিনি আজ বিধবা জননীর সহায় হইয়া এই কুপথগামী যুবককে রক্ষা করিলেন।

জননীর সেই স্নেহময়ী আনন হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া পাপ হইতে বিরত করিল, উদ্ধার করিল, মৃতপ্রেমের জয় হইল। জ্যোতিন্দ্র সেই মুহূর্ত্তে শপথ করিল যে আর এইরূপে দিন কাটাইবে না, নূতন হইয়া নিজের কর্ত্তব্য করিবে। পরদিন প্রভাতে আংটি বিক্রয় হইল, কিন্তু তাহাতে সামান্য অর্থ পাইল, ধার শুধিবার কিছুই সুবিধা হইল না। তিন দিন পরে জ্যোতিন্দ্র জেলে (Debtors' prison) গেল। যখন দুইজন পুলিস কর্ম্মচারী লইতে আসিল তখন জ্যোতিন্দ্র অস্বাভাবিক শান্তস্বরে বলিল, "আমাকে একবার আমার মার নিকট দুই লাইন চিঠি লিখিতে দাও।" তরুণ বয়স্ক বিদেশীয় যুবকের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একজন ইংরাজ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "আচ্ছা লেখো, কিন্তু শীঘ্র কাজ সার, আমাদের অন্যত্র কাজ আছে।"

জ্যোতিন্দ্র লিখিল,—

মা, আমি আজ জেলে যাইতেছি খেলাতে অনেক টাকা হেরেছি, তাহা দিতে পারিতেছি না। মা গো আমায় ক্ষমা কর। আমি ভুলেছিলাম এত দিন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি আর করিব না। মা, আমায় একবার বিশ্বাস কর। আমার ৪০ পাউণ্ড প্রয়োজন। এই টাকা দিতে পারিলে খালাস পাইব। তাহার পর পরীক্ষা কাছে, পাস হইয়া শীঘ্রই তোমার কাছে ফিরিব। কোন রকমে এই টাকাটা পাঠাইয়া দিও।"

চিঠি খামে ভরিয়া যুবক ইংরাজ দুইজনের সহিত প্রস্থান করিল।

বঙ্গদেশে এক গ্রামে একজন বিধবা রমণী সেই চিঠি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মলিন মুখ নত, কপোল বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে। "বাছা কি কর্‌লি" বলিয়া রমণী অশ্রু মুছিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া করজোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "হরি, তাকে দেখো রক্ষা করো।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যোতিন্দ্রের মাতা উন্নতমনা, সুবুদ্ধিমতী নারী, দুর্ব্বল হৃদয়া নহেন। বৃথা কান্নাকাটি হায় হায় না করিয়া টাকার যোগাড় করিতে বাহির হইলেন।

পনের দিন পরে টাকা পাঠান হইল যথা সময়ে বিলাত পৌঁছিল, জ্যোতিন্দ্র জেল হইতে খালাস পাইল, কিন্তু সময় নষ্ট করিয়াছিল, সে বৎসর আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

Oh Love
You were just weak earth I knew
With much in you waste, with many a weed
And plenty of passions run to seed
But a little good grain too.
The man was my whole world all the same
With his flowers to praise, or his weeds to blame
And either or both to love.

কলিকাতায় বহুবাজারে এক বড় দ্বিতল গৃহে, একটি সুসজ্জিত কক্ষে এক

পনের বৎসরের বালিকা বসিয়া হার্মোনিয়ম বাজাইতেছিল। বালিকা সুন্দরী, নবযৌবনস্পর্শে সেই সৌন্দর্য্য আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু যৌবন তাহাকে ছুঁইয়াছিল মাত্র। সে স্পর্শ এত হাল্‌কা যে বালিকা তাহা টের পায় নাই,—সেই চঞ্চল বালিকাই ছিল। বালিকা সুমিষ্ট স্বরে গাহিতেছে—

"প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে
চারিদিকে হাসি রাশি
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।"

হঠাৎ ঝড়ের মত একটি বালক ঘরে প্রবেশ করিল। "দিদি, দিদি, চিঠি।" বলিয়া একটা চিঠি দেখাইল।

বালিকা জানিত কাহার চিঠি কারণ ইহার জন্য আজকের দিন সে গণিয়া আসিতেছে। চিঠি লইবার জন্য হাত বাড়াইল, বালক অমনি চিঠিখানা পিছনে লুকাইল।

"আঃ, বিরক্ত করিস্ না, অনেক কাজ আছে, চিঠিটা দে।"

"ছাই কাজ" বলিয়া বালক চিঠি হাতে লইয়া চারদিকে নাচিতে লাগিল।

"সুরেন, তুই বড় বাঁদর হয়ে যাচ্ছিস। আচ্ছা রোস্, তোর ঘুড়ির মান্‌জা আর কখনও তোয়ের করে দেবো না।"

"না না, এই নাও।" বলিয়া বালক চিঠিখানা ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া ঝড়ের মত প্রস্থান করিল। বালিকা চিঠিখানা তুলিয়া খুলিল। ছোট পাঁচ ছয় লাইনের চিঠি। বালিকা পড়িল—

My love,

আমি আজ বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না, আর সময় নাই, ডাক যাচ্ছে। আশা করি তুমি ভাল আছ। আস্‌ছে সপ্তাহে খুব লম্বা চিঠি লিখিব। আমি ভাল আছি।

তোমারই জ্যোতিন।

লীলার মুখের আনন্দজ্যোতি নিভিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানা ভাঁজ করিল। তিন চারিবার মেল হইতে এই রকম চিঠি আসিতেছে। এই সময়ে লীলার মাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"লীলা, তোর কাছে তো চিঠি এসেছে কেমন আছে, এবারও তোর বাবার কাছে চিঠি আসে নাই। ভাল আছে তো?" লীলা সলজ্জ ভাবে বলিল, "হ্যাঁ।"

"এক্‌জামিন কাছে তাই বোধ হয় চিঠি লিখ্‌তে সময় পায় না। যা স্নান কর্‌গে, বেলা হয়েছে।"

সাতটা দিন কাটিয়া গেল, লীলা আবার উদ্বিগ্ন চিত্তে ঘুরিতে লাগিল। মেলের চিঠি আসিবার সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু চিঠি আসিল না। আর কখনও পূর্ব্বে এরূপ হয় নাই। বালিকার জন্য সে দিনটা অন্ধকারময় হইয়া গেল। বৈকালে লীলার পিতা কাছারি হইতে ফিরিলেন। লীলা নিয়ম মত সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, আজ আর পিতার জন্য সেই হাসিভরা আদর মাখা মুখ নাই। কিন্তু রাধানাথ বাবু গাড়ী হইতে নাবিয়া কন্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ

না করিয়া একেবারে উপরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ডাকিলেন, "সুরেন, সুরেন।"

"আস্‌ছি" বলিয়া লীলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্র চারি লম্ফে সিঁড়ি পার হইয়া উপরে উপস্থিত হইল। রাধানাথ বাবু বলিলেন, "তোর মাকে ডেকে দে।"

রাধানাথ বাবুর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র, তিনি একটা ইংরাজি সংবাদ পত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার আদরের জামাই তো জেলে গেছে।"

"কি?" কোন উত্তর না পাইয়া, নিকটে গিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছো, কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"জ্যোতিন্দ্র রায় খেলাতে টাকা হারিয়াছে, সে টাকা না দিতে পেরে জেলে গিয়েছে।"

রাধানাথের স্ত্রী হতবুদ্ধির মত মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, তখনও যেন ভাল করিয়া কথাটা বোঝেন নাই। রাধানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখ, ওর সঙ্গে আর মেয়ের বিয়ে দেবো না। টাকা তো জলে গিয়েছে, মেয়েকেও জলে দিতে চাহি না। ও মদ খায়, জুয়া খেলে। আমার কাছে আর কখনও ওর নাম করো না।" একটু থামিয়া, "আমি এখন বেড়াতে যাচ্ছি।" বলিয়া নীচে নাবিয়া গেলেন। সকলের ছোট বীনা "বাবা বাবা" করিয়া দৌড়িয়া গেল কিন্তু পিতার মুখপানে চাহিয়া সরিয়া গেল। রাধানাথ বাবু গাড়ীতে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। সংসারের এই নিয়ম, স্ত্রীলোক ঘরে বসিয়া কাঁদে আর পুরুষ বাহিরে হাওয়া খেতে, মিটিং, কন্‌গ্রেস, কাছারি ইত্যাদি করিতে যায়।

সুরেন তাহার মার নিকটে গিয়া বলিল, "কি হয়েছে মা?"

"আর কি হবে, আমারই অদৃষ্ট। দেখ্‌ তো এ কাগজে কি লিখেছে।" বালক পড়িল, তাহার পর মাকে অনুবাদ করিয়া শুনাইল, তাহার পর বলিল, "জ্যোতিন বাবু টাকা শুধিতে পারেন নাই তাই জেলে গেছেন। এখন কি হবে মা।" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না; নীরবে মার নিকট ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া বালক গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। এই তাহার প্রথম শিক্ষা। বালক সংসার রঙ্গভূমির একটি দৃশ্য হঠাৎ দেখিয়া লইল। সে দিন আর সুরেনের ঘুড়ী ওড়ান হইল না। দিদিকে সে বড় ভালবাসিত।

সে দিন রাত্রে রাধানাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলাকে সব বুঝিয়ে বল। এখনি Engagement ভাঙ্গিতে হইবে। সতীশকে (লীলার মামাত ভাই) লিখে দেবো সে ওটার সঙ্গে দেখা করে লীলার সমস্ত চিঠি চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহার তো দেশে আসিবার আর বেশী দেরী নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এক বৎসরের মধ্যে লীলাকে সৎপাত্রে বিবাহ দিব।"

"লীলাকে কি ক'রে বোঝাব।"

"কেন এগার বৎসরে তো বিয়ের কথা

হয়, যাবার অল্প দিন আগে মাত্র ওদের দেখা সাক্ষাৎ, এখন ও চৌদ্দ বৎসর মাত্র তা অতটুকু মেয়ের আবার মতামত কি? সময়ে ভুলে যাবে। ওটার জন্য কি মেয়েটা চিরকাল আইবুড় থক্‌বে। আজ কাল ওরকম হয়ে থাকে।"

কিন্তু লীলা বুঝিল না। প্রথমে স্তম্ভিতের মত হইয়া রহিল, তাহার পর মার কোলে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া অনেক কাঁদিল। যখন অশ্রু মুছিল তখন জননীর কোলে তাহার বালিকা হৃদয় রাখিয়া প্রেম ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ রমণী হৃদয় লইয়া উঠিল। রাধানাথ বাবু! পবিত্র বালিকা হৃদয়ের ভালবাসার কথা কি বুঝিবে? যাহাকে স্বামী বলিয়া দুই বৎসর হইতে জানে তাহাকে কিরূপে ভুলিবে। একবার ভাবিল পিতা মাতার পায়ে ধরিয়া তাহার জন্য ক্ষমা চাহিবে কিন্তু পিতার স্বভাব বেশ জানিত, লজ্জাও আসিয়া বাধা দিল, সুতরাং বালিকার হৃদয় মধ্যেই তাহার এই ইচ্ছাটা রহিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক বৎসর ঘুরিয়া আসিল। লীলার সেই সৌন্দর্য্যের উপর এক গম্ভীর বিষাদময় ছায়া রাখিয়া গেল। সময়ের গুণে, পিতা মাতার স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ গৃহের গুণে ও যৌবনের জোরে লীলার ক্রমে মন স্থির হইল। জ্যোতিনের চিন্তা সে মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা যদিও পারিল না, তবুও হৃদয়ের এক গুপ্ত কোনে এমন করিয়া ঢাকিয়া রাখিল যে সকলে মনে করিল বালিকা অতীতের সে সব ভুলিয়া গিয়াছে।

একদিন রাধানাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামে একটি ছেলে স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া আসিয়াছে। ছেলেটির স্বভাব চরিত্র খুব ভাল, ঘরও ভাল, উহার সহিত লীলার বিয়ে দিব ভাব্‌ছি। একদিন মেয়ে দেখাতে হবে।"

দুই তিন দিন পরে বীরেন্দ্র রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে চা খাইতে আসিল। মেয়ে দেখা হইল। এক মাসের মধ্যে বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। পিতা মাতার বার বার অনুরোধে লীলা অসহায় নিরুপায়ের ন্যায় বিবাহে মত দিল। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্ম সম্বন্ধের ন্যায় এখানে কোর্টসিপ্ তেমন এগলো না। লীলা "হুঁ হাঁ" ছাড়া কথাই বলে না, বীরেন্দ্র নিজে লাজুক স্বভাবের লোক, ভাবিল বিবাহের পরেই Love-makingটা হবে; মেয়েটি লাজুক পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাহের দিন যত নিকট হইল লীলার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া থাকিত, গৃহকার্য্যেও মন দিত না, দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মাতা একদিন স্বামীর নিকট গিয়া বলিলেন, "দেখ, লীলার মন এখনও স্থির হয় নাই, এত শীঘ্র বিয়ে না দিলেই হতো।" তিনি উত্তর করিলেন, "ও কিছু নয়, বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলি তার পর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বিবাহের আর পনের দিন বাকি। বীরেন্দ্রের বাড়ীতে আজ আয়োজন হইতেছে, কয়েকজন বন্ধুকে রাত্রে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বৈকালে যখন বীরেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আহারের সমুদায় দেখিতেছিল, তখন তাহার বন্ধু মন্মথের একখানা চিঠি আসিল।

"Dear Ghosh,

May I bring a friend of mine over to-night? He is a Mr. Roy, who arrived from Bombay last evening and is my guest for the present.

Yours &c.

(প্রিয় ঘোষ,

আমার বাড়ীতে মিষ্টার রায় বলিয়া একজন বন্ধু আছেন, তাঁহাকে কি তোমার ওখানে আজ লইয়া যাইতে পারি? তিনি আমার অতিথি, কাল বম্বে হইতে আসিয়াছেন।"

তোমার ইত্যাদি।)

বীরেন্দ্র উচিত মত উত্তর দিয়া, আবার কাজে নিযুক্ত হইল। সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিতে লাগিল। অবিলম্বে হল ঘর পূর্ণ হইল। হাঁসি ঠাট্টা গল্পস্বল্পে পার্টি বেশ জমিয়া উঠিল। ইতি মধ্যে বীরেন্দ্র একবার মুখ হাত ধুইবার নিমিত্ত তাহার ড্রেসিং রুমে ঢুকিল। স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটা চেয়ারের উপর তাহার কাল কোট্ রাখিয়া গিয়াছিল, রুমাল বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়া রুমালখানা টানিল, অমনি একটা চিঠি বাহিরে পড়িয়া গেল। বীরেন্দ্র তাহা অন্যমনস্ক ভাবে উঠাইয়া লইল, পিছনের ল্যাম্পের আলো আসিয়া চিঠির উপর পড়িল। ইহা যে লীলার হস্তাক্ষর! বীরেন্দ্র চোখ সরাইতে পারিল না, দেখিল উপরে লেখা আছে; "প্রাণের জ্যোতিন্" পাত উল্টাইয়া দেখিল নীচে লেখা আছে "তোমারই লীলা।" বীরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল স্থির দৃষ্টিতে চিঠিখানার প্রতি চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া চাহিয়া দেখিল জানালার কাছে একজন যুবক দাঁড়াইয়া আছে। লোকটিও নিকটে আসিল, বীরেন্দ্র চিনিল প্রমথর Guest Mr. Roy, পেণ্টলুন পরা, কোট অঙ্গে নাই, কেবল সার্ট রহিয়াছে। তখন দেখিল আর এক চেয়ারের উপর আর একটা কাল কোট, উহা বীরেন্দ্রের। মুহূর্ত্ত মধ্যে বীরেন্দ্র যেন আভাসে সমস্ত বুঝিল। বলিল, "Mr. Roy, আমি ভুলে আমার কোট ভাবিয়া আপনার কোটের পকেটে হাত দিয়াছিলাম। এ চিঠিটা হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, উঠাইয়া দেখিলাম ইহা লীলার লেখা ও লীলার চিঠি।"

কোন উত্তর না পাইয়া বলিল "Mr. Roy, আপনি কি জানেন যে লীলার সহিত আমার শীঘ্রই বিয়ে হবে।"

"হ্যাঁ আজ তাহা শুনিয়াছি।"

"আপনার সহিতই কি একবার লীলার বিবাহের কথা হয়।"

"হ্যাঁ, এ চিঠি অনেক দিনকার; লীলার শেষ চিঠি।"

বীরেন্দ্র খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল তাহার পর বলিল, "Mr. Roy, বিবাহ কেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহা কি জানিতে পারি?"

প্রায় পনের মিনিট কাল দুজনের কথা বার্ত্তা হইল। কথা শেষ হইলে বীরেন্দ্র তখন হঠাৎ বাহিরে বারাণ্ডায় গিয়া সেখানে পদচারণ করিতে লাগিল। সেই কয়েক মিনিটে তাহার জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় জয়ী হইয়া ফিরিল। বীরেন্দ্রের নিকট কর্ত্তব্যই সর্ব্বপ্রধান। সেই মূহুর্ত্তে লীলার সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, ভবিষ্যতের পটে যে তাহারই চারিদিকে সুখময় ছবি আঁকিয়াছিল তাহা সমুদায় হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার সহিত জীবনেরও সমুদায় সৌন্দর্য্য মুছিয়া গেল, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইল। কিন্তু বীরেন্দ্র বীর, তাহার ভালবাসা নিঃস্বার্থ, উচ্চ হৃদয়ের গভীর ভালবাসা। জ্যোতিন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার হাত ধরিল ও দৃঢ় স্বরে বলিল, "Roy, I mean to break off my engagement with Lila." (আমি এই বিবাহ ভাঙ্গিব।)

জ্যোতিন অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"না, এ বিবাহ হইলে আমাদের জীবনে কাহারও সুখ হইবে না। লীলার যে আর একজনের সহিত বিবাহের কথা হইয়াছিল তাহা জানিতাম, কিন্তু এতদূর হইয়াছিল তাহা জানিতাম না। আমরা দুই মাস হইতে Engaged আছি সত্য কিন্তু লীলা আমার সঙ্গে কথাই মোটে কহিত না, তাহার কারণ এখন বুঝিলাম, সে এখনও আপনাকে ভোলে নাই।" একটু থামিয়া বীরেন্দ্র শুষ্ক ভাবে বলিল "আমাদের কোর্টসিপ বিশেষ এগোয় নাই, Engagement ভাঙ্গা অতি সহজ হইবে, সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

হৃদয়ের আবেগে, নানা প্রকার চিন্তায় জ্যোতিন্দ্রের বাক্যরোধ হইল, হাত বাড়াইয়া বীরেন্দ্রের হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে মনের ভাব ব্যক্ত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পর-দিন দ্বিপ্রহরে রাধানাথ বাবু ভাবী জামাতার একটি দীর্ঘ পত্র পাইলেন। পড়িতে পড়িতে, তাঁহার মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র সমুদায় ঘটনাটা লিখিয়া তাহার পর লিখিয়াছে,—"এ বিবাহ না হওয়াই ভাল। আপনার কন্যার যদি সুখ ও মনের শান্তি চান্ তবে জ্যোতিন্দ্রের সহিত বিবাহ দিবেন। বিলম্ব করিবেন না, সমস্ত প্রস্তুত আছে; জ্যোতিন্দ্র Debtors' prison এ গিয়েছিলেন, উহাকে ক্ষমা করিবেন। এখন যে স্বভাব একেবারে সংশোধন হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি এইরূপ করিলাম বলিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মঙ্গলের জন্য করিলাম। আপনার সহিত আর আমার শীঘ্র দেখা হইবে না, কারণ আমি বিশেষ কাজে আজ

এলাহাবাদ রওনা হইতেছি, সুতরাং পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমি আপনার নিকট বিদায় লইতেছি——”

চিঠি পড়িয়া রাধানাথ বাবু উত্তেজিত ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, “আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন। কখনও ওটার সহিত লীলার বিয়ে দেবো না।” তাহার পর তাঁহার স্ত্রীর নিকট গেলেন।

লীলা যখন শুনিল তখন তাহার মাথার উপর যেন বজ্র পড়িল। অপমানে অভিমানে, মনের আবেগে বালিকা কাতর হইয়া পড়িল। সে দিন রাত্রে লীলার জ্বর হইল। পনের দিন কাটিয়া গেল, মৃত্যুর দ্বার হইতে যেন বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণ ফিরিল। পারিবারিক ডাক্তার ও রাধানাথের বাল্যবন্ধু বৃদ্ধ সূর্য্যকান্ত বাবু লীলার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, উদ্বিগ্ন চিত্তে, কম্পিত স্বরে রোগীর পিতা মাতা নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন। সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, “এখন আর ভয় নাই, সময় কাটিয়া গিয়াছে তবে আবার Relapse হইলে কি হয় বলা যায় না।” একটু থামিয়া আবার বলিলেন, “রাধানাথ, আমার কথা শোন। লীলার জ্ঞান হইলে জ্যোতিন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাও।” রাধানাথ বাবু কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু সূর্য্যকান্ত বাবু বুঝিলেন, তিনি জ্যোতিন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পর-দিন প্রাতঃকালে লীলার সংজ্ঞা হইল, ডাক্তার রোগীর অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলা লীলার শয্যার পার্শ্বে সুরেন আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “দিদি, জান জ্যোতিন বাবু দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।”

বালিকার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল পরক্ষণেই বিবর্ণ হইয়া গেল।

“দিদি, জ্যোতিন বাবু বাবার সহিত দেখা করিয়াছেন, এখন এখানেই আছেন।”

এমন সময়ে কে ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেন তাড়াতাড়ি জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। হাতে হাত মিলিত হইল, বহুদিনের পর দুইজনের হৃদয়, আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হইল। প্রেমকে আসিতে দেখিয়া দূরে মৃত্যু তাহার অন্ধকারময় ছায়া লইয়া সরিয়া পড়িল।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কানা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, দুষ্ট হউন, তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু, পূজ্য ও ইষ্ট দেবতা। তাঁহার চরণসেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরমগতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতা মাতার সেবা, দেবরদিগের প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না। আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত, ধর্ম্ম, উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদিকার্য্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। তাহা দ্বারা যে ধন সঞ্চয় হইবে, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে সকল গৃহকর্ম্ম কি, বহ্নিপুরাণে তাহার এক বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—

“স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবে, তাহার পর স্বামী ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় অথবা জলের দ্বারা উঠান পরিষ্কার করিবে ও গৃহের কাজ কর্ম্ম শেষ করিবে। তাহার পর স্নান করিয়া দেবতা ব্রাহ্মণ ও পতির পূজা করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবে। সমস্ত গৃহকার্য্য শেষ হইলে অতিথি ও স্বামীর ভোজনান্তে পরম সুখে নিজে ভোজন করিবে।”

এই স্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম-সকলের উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল, জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁহারা ঐগুলি যদি সুন্দররূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার উপর অমায়িকতা, সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায়, সেই সকল গুণ থাকিলেই তাঁহাকে অতি উন্নতচরিত্রা বলিতে হইবে।

পাক বিধি।

আলুবোখারার খিচুড়ি।—এই খিচুড়ি অম্ল-মধুর আস্বাদের জন্য রসনায় যার-পর-নাই আদরণীয়। তেঁতুল কিম্বা অন্য প্রকার অম্ল অপেক্ষা আলুবোখারা দ্বারা পাক করিলে, খেচরান্ন সমধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষা ও শীত কালই পোলাও ও খিচুড়ি আহারের প্রশস্ত সময়।

এই খিচুড়ি জল দ্বারা রন্ধন না করিয়া নারিকেল-দুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে, অপেক্ষাকৃত মধুর-আস্বাদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য চাউলের পরিমাণ বুঝিয়া, ঝুনা-নারিকেলের দুধ বাহির করিয়া লইবে। নারিকেল-কুরাতে গরম জল মিশাইয়া, তাহা কাপড়ে নিংড়াইয়া লইলে, প্রচুর দুধ বাহির হইবে। এই দুধ, পাকের জন্য রাখিবে।

এদিকে, আলুবোখারা ভাসা জলে দুই চারি বার উত্তমরূপে ধুইয়া লইবে। আলুবোখারাতে যেরূপ ময়লা থাকে, তাহা ভাল করিয়া না ধুইয়া লইলে, খাদ্য-দ্রব্য মলিন ও অস্বাস্থ্যকর হইবে। এই ধৌত আলুবোখারা দুই একবার আগুনে ফুটাইয়া, নামাইয়া রাখিবে।

এখন, পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে পরিমাণমত ঘৃত ঢালিয়া দিবে। যে কোন খিচুড়িতে ঘৃত একটু অধিক দিয়া পাক করিলে, উহা সুখাদ্য হইয়া থাকে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাতা, লবঙ্গ, জীরা এবং দারুচিনি দিয়া নাড়িতে থাক। জ্বালে উহা চুড়চুড় করিয়া ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে আদা-বাটা দিয়া নাড় এবং মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দিতে থাক। মসলার উত্তমরূপ গন্ধ বাহির হইলে, ছোট এলাচ, চাউল দাইল উহার উপর ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে আরম্ভ কর। এই খিচুড়ির পক্ষে দাদ-খানি পেশোয়ারি প্রভৃতি চাউল এবং সোণামুগ কিম্বা খাঁটি মসুরের দাইলই ভাল হয়। ঘৃতে চাউল ভাজা ভাজা হইলে, পূর্ব্ব-রক্ষিত নারিকেলের দুধ তাহার উপর ঢালিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পাক পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। জ্বালে খিচুড়ি ফুটিতে আরম্ভ হইলে, পাক পাত্রের ঢাকনি খুলিয়া, মধ্যে মধ্যে ভাল করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। কারণ, এই সময় ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া না দিলে, উহা ধরিয়া যাইতে পারে।

এদিকে, অপর একটি পাত্রে চিনির রসের সহিত আলুবোখারা পাক করিতে থাক। উহা ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে ছোট এলাচের দানা, (অল্প থেঁত করিয়া) লবণ এবং জাফরাণ বাটা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখ। উনানস্থিত খিচুড়ি এক ফুট শক্ত থাকিতে থাকিতে, তদুপরি রসসহ আলুবোখারা ঢালিয়া দিয়া, এক বার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক পাত্রটি দমে বসাইয়া রাখিবে। এবং সুসিদ্ধ হইলে, দম হইতে তুলিয়া, খিচুড়ির উপর গোলাপজলের ছিটা মারিয়া, আর একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পরিবেষণ করিবে।

স্বর্ণরেণু।

ভবিষ্যতে সুখী হইব ইহাই সকলের আশা, এই আশাতেই সকলের আনন্দ।

স্নেহের বিনিময়ে স্নেহ দিবে এবং ক্রোধের বিনিময়ে শান্ত ব্যবহার করিবে।

লক্ষ্মীশ্রী কাহাকে বলে? মুখে গাম্ভীর্য্য ও লজ্জা, হৃদয়ে প্রফুল্লতা ও হস্তে পবিত্র ব্যবহার ইহাকেই লক্ষ্মীশ্রী বলে।

মৃত্যুর সাধ্য কি আত্মাতে প্রাণদান করে, এবং অসত্যের সাধ্য কি মনুষ্যকে সরলতা এবং সাধুতা প্রদান করে।

প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে যখন বিনীত-ভাবে সাধুভাব সকল গ্রহণ করিবে, সাবধান, কপটদিগের ন্যায় নীচ ব্যবহার করিও না।

সর্ব্বাপেক্ষা মুখের সৌন্দর্য্য কিসে বৃদ্ধি হয়? প্রফুল্লতার দ্বারা। সর্ব্বাপেক্ষা চক্ষের সৌন্দর্য্য কিসে বৃদ্ধি হয়? পবিত্রতার দ্বারা।

২৬ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১০। [৩য় সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. JUNLY, 1903. No. 3.

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ ...	৪৯	spiration) নামক বক্তৃতার অনুবাদ	৫৯
সাধ্বী সতী সীতা দেবী	৫০	মাতৃস্নেহ ...	৬২
যাত্রা ...	৫৪	পরিচয় ...	৬৫
ধন বড় না মান বড়	৫৫	সংবাদ ...	৭০
অন্তর-রাজ্য ...	৫৮	স্বর্ণরেণু ...	৭২
পূজনীয় আচার্য্য দেবের প্রত্যাদেশ (In-		পরিচারিকার নিবেদন	৭২

কলিকাতা,
৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;
আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

—•:o:•—

FULL PRICE.

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga: Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays: Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

			মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ	...	১৲
১৯ ঐ	২য় ভাগ	...	১৲
২০ ঐ	৩য় ভাগ	...	১৲
২১ ঐ	৪র্থ ভাগ	...	১৲
২২ ঐ	৫ম ভাগ	...	১৲
২৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	...	১৲
২৪ জীবনবেদ		...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ		...	১৲
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	১ম ভাগ	...	।৶৹
২৭ ঐ	২য় ভাগ	...	।৶৹
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে			১৷৷৹
২৯ সেবকের নিবেদন	১ম ও ২য় খণ্ড		১৷৷৹
৩০ ঐ	তৃতীয় খণ্ড	...	১৲
৩১ ঐ	চতুর্থ খণ্ড	...	১৲
৩২ ঐ	পঞ্চম খণ্ড	...	১৲
৩৩ নবসংহিতা		...	৸৹
৩৪ মাঘোৎসব		...	৷৷৹
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল)	১ম ভাগ	...	৷৷৹
৩৬ ঐ ঐ	২য় ভাগ	...	৷৷৹
৩৭ ঐ ঐ	৩য় ভাগ	...	৷৷৹
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর)	১ম ভাগ		৷৷৹
৩৯ ঐ	২য় ভাগ	...	৷৷৹
৪০ ঐ	৩য় ভাগ	...	৷৷৹
৪১ ঐ	৪র্থ ভাগ	...	৷৷৹
৪২ ঐ	৫ম ভাগ	...	৷৷৹
৪৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	...	৷৷৹
৪৪ ঐ	৭ম ভাগ	...	৷৷৹
৪৫ ঐ	৮ম ভাগ	...	।৶৹
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ		...	।৶৹
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১ম ভাগ		।৹
৪৮ ঐ	২য় ভাগ	...	।৹
৪৯ প্রেম কুসুম		...	।৹
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ		...	৶৹
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান		...	৶৹
৫২ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী		...	৶৹
৫৩ সুখী পরিবার		...	৵৹
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা	১ম ভাগ	...	৷৹
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ		...	৷৹
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর		...	৷৹
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার		...	৷৹

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.

A few slightly soiled books can be had, for a few days only, at Half Price. For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা আষাঢ় ১৩১০, জুলাই ১৯০৩ [৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বজ্রপাতের সময় আর্দ্র বসন পরিধান করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

আমেরিকাতে United States এ প্রায় দুই সহস্র রমণী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

সমুদায় সমুদ্রের জল পরিমাণ করিয়া বলা যায় তন্মধ্যে ২০০০,০০০ টন্ খাঁটি তরল রূপা মিশ্রিত আছে।

স্পঞ্জ টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া পুঁতিয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা গজিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

কাগজ হইতে নির্ম্মিত মোজা এখন ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা পশম কিম্বা সুতার মোজা অপেক্ষা সস্তা।

Indian Ink বা মশি শুনা যায় কর্পূরের অঙ্গার হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা কি উপায়ে তৈয়ার হয় তাহা কেবল চীনদেশীয়গণ জানে কিন্তু উহারা অন্য কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করে না।

Paris নগরীর রাস্তায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০০০ সহস্রটি ল্যাম্প বা প্রদীপ প্রতিদিন জ্বলে, এবং তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য ৩৭৫৩ ব্যক্তি নিযুক্ত আছে।

অষ্ট্রেলিয়াতে ১৮২, ফিট উচ্চ এক জলন্ত পর্ব্বত দেখা যায়। পর্ব্বতের নিম্ন দেশে কয়লার খনি আছে অনুমান করা যায়। উহা সর্ব্বক্ষণই জ্বলিতেছে।

Kimberlyতে হীরক-খনির মধ্যে ঘোর ধূসর বর্ণের একটি আশ্চর্য্য প্রস্তর-খণ্ড বা নুড়ি পাওয়া গিয়াছে। আকৃতিতে পায়রার ডিম্বের ন্যায়। ইহা আলোকের সম্মুখে ধরিলে ইহার অপর পার্শ্বে একটি পুরুষের মূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অন্য দিকে ফিরাইয়া দেখিলে পুরুষের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়। ব্রিটিস মিউসিয়াম্ ইহা ক্রয় করিবার জন্য ৫০ পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীধর্ম্মনির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপদেশ-বাক্য দেখা যায়। যথা :—

"স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস কথা কিছুই নাই। স্বামীর শুশ্রূষা করিলেই স্বর্গে তাহার প্রতিপত্তি হয়। যে রমণী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকে গমন করে। সাধ্বী রমণী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তির পর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।"

বিষ্ণুসংহিতার শেষ ভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে লক্ষ্মী! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর? এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন,—উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের পূজাপ্রিয়া, গৃহপরিমার্জ্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্মকর্ম্মে অভিনিবিষ্টহৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ।

সাধ্বী সতী সীতা দেবী।

সীতা দেবীর বিষয় লেখা দেখিয়া বোধ হয় পাঠিকাগণ মনে করিবেন এ তো বহু পুরাকালের কথা, রামায়ণে পড়া সকলেরই আছে। সে পুরাতন বিষয় এত দিন পরে আবার লেখা কেন? রামায়ণাদি পাঠ করিয়া বা লোকমুখে সীতা-চরিত্র অনেকেই শুনিয়া ও জানিয়া থাকিবেন। কিন্তু আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সকলে ইহা জানেন বলিয়া মনে হয় না। আর যদিই বা জানেন এরূপ জীবনীর কথা দুইবার শুনিতেও কাহারও বোধ হয় আপত্তি হইবে না। আমরা আশা করি লেখিকা মধ্যে মধ্যে এইরূপ সতী-চরিত্র লিখিয়া পরিচারিকার অঙ্গ সুশোভিত করিবেন। (পঃ সঃ)

সত্য যুগে লক্ষ্মীরূপা সীতা দেবীর জন্ম। এই ভারতবর্ষে কত কত সতী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্যে আজও শুষ্ক ভারত অনুরঞ্জিত। এক একটী সতী-জীবন জীবন্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। সীতা দেবী জনক রাজার দুহিতা, কেহ কেহ বলে তিনি পৃথিবীর কন্যা। অণ্ড হইতে তাঁহার জন্ম। মিথিলাধিপতি জনকরাজ তাঁহাকে নিজ কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছিলেন। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র "হরধনু" ভঙ্গ করিয়া সীতা দেবীর পানিগ্রহণ করেন। তাঁহাকে লইয়া স্বরাজ্যে আগমন করিবার সময় পথে পরশুরামকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সীতা দেবীকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে মঙ্গলসূচক বাদ্যধ্বনি করিতে অনুমতি দিলেন। পূর্ব্বে কৈকেয়ী

দেবীর নিকট রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সেই নিমিত্ত রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এবং ভরতকে রাজ্য পালনের ভার দেওয়া হইল ও রামকে বনে যাইতে হইল। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গমন করিলেন। সীতা দেবী অল্পবয়স্কা, রাজকন্যা ও রাজরাণী; তিনি রামের সহিত একান্তই বনগমন করিবেন স্থির করিলেন। পদব্রজে পতিপ্রাণা সতী সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতিসঙ্গে বনে গমন করিলেন। সেই দিবস হইতে জন্মদুঃখিনী সীতার পরীক্ষার আরম্ভ হইল। চিরজীবন তাঁহার দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল। জটাধারী রামচন্দ্রের সঙ্গী কেবলমাত্র সীতা দেবী এবং ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম এবং সতীত্বের সম্মাননা দিতে আর পৃথিবীতে কেহ নাই। অল্পবয়স্কা স্ত্রী উর্ম্মিলা, মাতা সুমিত্রা, সহোদর শত্রুঘ্ন, এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া জটাবল্কল পরিধান করিয়া সর্ব্বসুখে বিসর্জ্জন দিয়া কে কখন ভ্রাতার অনুগমন করিয়াছে? লক্ষ্মণই কেবল ইহা করিয়াছিলেন। সীতা দেবীকে মাতৃসম্বোধন করিতেন ও চতুর্দ্দশ বর্ষ তাঁর পদযুগল দর্শন করিয়াছিলেন, কখনও মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। কোনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন নাই। অল্পবয়স্ক লক্ষ্মণের বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার, ভ্রাতৃপ্রেম, সতীত্বের সম্মাননা, যেমন লক্ষ্মণ-জীবনে দেখা গিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। ধন্য লক্ষ্মণ তুমি! যুগে যুগে তোমার মাহাত্ম্য দৃষ্টান্তস্বরূপ পৃথিবীতে থাকিবে। চতুর্দ্দশ বর্ষ লক্ষ্মণ অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন এমন প্রবাদ। পঞ্চবটী বনে সীতা দেবীকে যখন রাবণ হরণ করিতে আসিল, সেই সময় মায়ারূপী সুবর্ণ হরিণ সীতা দেবীকে দেখা দিল, তিনি রামচন্দ্রকে তখন সেই মৃগটী তাঁহাকে দিতে বলিলেন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বান লইয়া সেই মায়া-হরিণের পশ্চাদ্গামী হইলেন। চারিদিকে মায়ারাক্ষসেরা, হা রাম! হা রাম! শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সীতা দেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন তুমি শীঘ্র যাও, প্রভুর বুঝি কোনও অমঙ্গল হইয়াছে। তাঁহার চিত্ত বড়ই অস্থির হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, প্রভুর আদেশ তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করেন তিনি দ্বার ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। সীতা দেবী বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দুই একটী কটু কথা বলিলেন। লক্ষ্মণ তখন অগত্যা যাইতে বাধ্য হইলেন। ইত্যবসরে রাবণ সুযোগ পাইয়া সীতা দেবীর নিকট ভিক্ষা লইতে আসিল। সীতা দেবী ঘরের ভিতর হইতে ভিক্ষা দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাবণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বাহিরে আসিয়া ভিক্ষা দিতে বলিল। ইহা না হইলে সে ভিক্ষা লইবে না স্থির করিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন বাহিরে যাইতেন একটী "গণ্ডী" দিয়া যাইতেন,

ইহার বাহিরে সীতা দেবী যাইলেই তাঁহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই জন্য সীতা দেবী "গণ্ডীর" বাহির হইতে অস্বীকৃত হইলেন। এদিকে অতিথি ভিক্ষুক শাঁপ দিতে উদ্যত হইল। তখন অগত্যা সীতা দেবী ঘরের বাহিরে আসিয়া যেমন ভিক্ষা দিবেন, দুরন্ত রাবণ সীতা দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। যতদূর রথে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল সীতা দেবী হা রাম হা রাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হস্তের সমুদায় গহনা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র পথে আসিতে আসিতে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া নানারূপ অমঙ্গল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি যেন তাঁর মনে হইল গৃহে গিয়া আর সীতাকে দেখিব না; যথার্থ তাহাই হইল। সীতা দেবী গৃহে নাই; গৃহ শূন্য। দুই ভ্রাতায় অতি দুঃখিত ও হতাশ হইয়া সীতার অন্বেষণে বাহির হইলেন। জীব জন্তু বৃক্ষ পক্ষী কাহারও নিকট সীতার অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে সীতা দেবীর অলঙ্কার সকল রাস্তায় দেখিয়া পথ চিনিলেন। পথিমধ্যে আহত জটায়ু পক্ষীর নিকট সীতার সকল কথা শুনিলেন। সমুদ্র পার হইয়া রামচন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে গমন করিলেন। সেখানে সীতা দেবী অশোক-বনে একাকিনী রাম নাম করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। দুষ্টমতি রাবণ কত প্রলোভন দেখাইয়াও সতীর সতীত্বের তেজে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিত না। চেড়ীগণ দিবারাত্র উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা সীতা দেবীর দেহ দগ্ধ করিত। সাধ্বী সতী পতিব্রতা সীতা দেবী অকাতরে রামনাম করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সকল সহ্য করিতেন। সেখানে তুমুল সংগ্রাম করিয়া রামচন্দ্র সীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন। প্রজাগণের মনরঞ্জনের জন্য তিনি জ্বলন্ত হুতাশনে সীতা দেবীর সতীত্বের অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন। সর্ব্বনাশকারী অগ্নিও সতীর পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। অগ্নিও পরাস্ত হইয়া গেল। সাধ্বী সতী সীতা দেবীর জীবনে নানারূপ কষ্ট-পরীক্ষার মূর্ত্তিখানি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। সীতা দেবীকে লইয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিলেন এবং রাজা হইলেন। কিছুদিন পরে শত্রুগণ (প্রজাবর্গ) সতীর নামে নানারূপ কলঙ্ক রটনা করিল। প্রজাবৎসল রামচন্দ্র প্রজার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সীতা দেবীকে বনবাস দিতে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন সীতা দেবীকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এখন কি ইচ্ছা হয়? সীতা দেবী উত্তর করিলেন মুনিপত্নিগণ সহিত তপোবন দর্শন করেন। রামচন্দ্র এই সুযোগ পাইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সীতা দেবীকে তপোবন দেখাইবার কৌশল করিয়া বনে লইয়া যাও।" সে সময় সীতা দেবীর অন্তসত্ত্বা অবস্থা। লক্ষ্মণ কখনও ভ্রাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না, ইহা তাঁহার জীবনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি রথে করিয়া তপোবন

দেখাইবার ছলে সীতা দেবীকে লইয়া বনে গমন করিতে লাগিলেন। সীতা দেবী বলিলেন, "কৈ লক্ষ্মণ, প্রভু তো সঙ্গে আসিলেন না? আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ?" লক্ষ্মণ কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ রহিলেন। দুর্গম বনে সীতা দেবীকে একাকী রাখিয়া জল খাইবার ছলে লক্ষ্মণ পলায়ন করিলেন। সীতা দেবী অতি কাতরে দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন সেই রোদনধ্বনি বনকে প্রতিধ্বনিত করিল। কথিত আছে তাঁহার চক্ষের জলে "গোমতী" নদী প্রবাহিত হয়। আজিও সে নদী বর্ত্তমান।

সতীর তেজে সমুদয় বন আলোকিত হইল। বাল্মিকী মুনি সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অনেক প্রবোধ বাক্যে সীতা দেবীকে নিজ কুটীরে লইয়া গিয়া কন্যাসম যত্নে রাখিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার লব কুশ নামে জমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সীতা দেবী সেই দুইটী পুত্রকে অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। লব কুশের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, যখন রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেই সময় বাল্মিকী মুনি দুইটী পুত্রকে অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সভায় আনিয়া উপস্থিত করেন।

তাহাদের মুখে রামায়ণ শ্রবণে সকলেই মোহিত হইল। অবশেষে পরিচয় পাইয়া, শ্রীরামচন্দ্র, তাহারা তাঁহার নিজ পুত্র জানিয়া, তাহাদের কোলে লইলেন। রামচন্দ্র সে সময় সোণার সীতা প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ প্রভৃতি ব্যাকুল হইয়া রামচন্দ্রকে সীতা দেবীকে আনাইবার জন্য বলিলেন। বাল্মিকী মুনিও অনেক অনুরোধ করিলেন। অবশেষে সীতা দেবীকে আনিবার জন্য রথ গেল।

বহুকাল পরে সীতা দেবী গৃহে ফিরিলেন; তথাপি রামচন্দ্র লোকনিন্দার ভয়ে তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। কৌশল্যা দেবী এবং ভ্রাতাগণের এত অনুরোধেও রামচন্দ্র কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বলিলেন প্রজাগণের সন্তুষ্টির জন্য সীতা দেবীকে পুনরায় অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া রাজ্যে মহাগোল উপস্থিত হইল। আত্মীয়েরা রামের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কৌশল্যা দেবী অনেকবার কহিলেন প্রজারঞ্জনের জন্য পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত নহে। রামচন্দ্র বলিলেন একবার অগ্নি পরীক্ষা না করিলে সীতা দেবীকে তিনি গ্রহণ করিতে অক্ষম। সীতা দেবী জন্মাবধি গভীর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু আর সহ্য করিতে না পারিয়া রামের নিকট সকল অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পৃথিবীকে, তাঁহাকে কোলে লইতে বলিলেন। পৃথিবী তাঁহার কন্যাকে আদরে ক্রোড়ে করিলেন। স্বামীর নিকট এত দুঃখ কষ্ট পাইয়াও বলিয়াছিলেন, "জন্মজন্মান্তরে যেন রামের মত স্বামী পাই।"

ধন্য ধন্য সীতা দেবী! জন্ম দুঃখিনী চির-

দিন দুঃখ পরীক্ষার তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, পৃথিবীতে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করাই সমস্ত নারী জাতির কর্ত্তব্য।

যাত্রা।

আজ কাল আর যাত্রার আদর নাই, সম্মান নাই। সভ্যসমাজে যাত্রা ঘৃণিত। "যাত্রার গানে বড় চীৎকার, সাজ সজ্জা বড় অসভ্যের মত।" সকলে সমস্বরে এই একই ভাবের কথা বলে। যাত্রার আদর আর কি এই আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমাজে হইতে পারে?

তবে কি পূর্ব্বকালে সকলেই অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল? তখন যে সকল মঙ্গলের কাজে, সকল অনুষ্ঠানে, গৃহস্থ, ধনী, সকলেই যাত্রার কথা বলিত, যাত্রা দিয়া নিজে সুখী হইত ও শত শত প্রাণ সুখী করিত।

যাত্রার মাধুর্য্য, ধার্ম্মিক জীবন নহিলে কে বুঝিবে? একটি যাত্রা দিতে হয় তো এক একটা ভাবের কথায় এক শত কি দেড় শত টাকা খরচ হইল কিন্তু কত লোকের কাছে হরিনাম প্রচার হইল। এক একটা গানে শত শত প্রাণ বিগলিত ভাবে মগ্ন। কত ধন্য তাহার জীবন যে এই সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এত প্রাণ সুখী করিয়া প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করে। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে যাত্রার নাম শুনিলে কত দূর গ্রাম হইতে লোক আসিত, কত লোকের ভিড় হইত। ছোট ছোট বালকদলও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা শুনিত এবং যাত্রাদলের লোকেরা দর্শকবৃন্দের উৎসাহে এত উৎসাহিত হইত যে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যাত্রা শেষ করিতে পারিত না। শুনিয়াছি এক একজন অধিকারী অর্থাৎ যাত্রাদলের নেতা, হরিগুণ গাইতে গাইতে এত প্রমত্ত হইত যে নিজে কাঁদিয়া শত শত দর্শকবৃন্দকেও চক্ষের জলে ভাসাইত। সে ভাব কি সুন্দর! হয় তো একটি দরিদ্র, বিদ্যায় অপটু (ইংরাজি একেবারে জানে না) সে সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া একা এমন গান করিল যে শত শত প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইল। যে শুনাইল সে ধন্য হইল, যে শুনিল সেও ধন্য হইল। এত যদি যাত্রার গৌরব, মহিমা, তবে কেন লোকে আরও যাত্রার সাহায্য করিবে না, যাহাতে ইহার উন্নতি ও আদর বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবে না? দেশীয় এমন একটি সৎকার্য্য রহিয়াছে লোকে চেষ্টা করিয়া কেন তাহা সুসম্পন্ন করিবে না? আমাদের দেশে পূর্ব্বকালের কাজ কর্ম্ম তো প্রায় কিছুই নাই, আবার যে অল্প পরিমাণে সেই সকল পবিত্র আমোদের আছে তাহাও দেশের শিক্ষিত সভ্যদল সমূলে উৎপাটন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমরা দুর্ব্বল; দেশের উন্নতি, দেশীয় আচার ব্যবহারের পদমর্য্যদা বৃদ্ধি বিষয়ে আমরা একেবারেই অকর্ম্মণ্য; তবে কেবল এই

বলিতে পারি, আমাদের সকলেরই যাত্রা ভাল লাগে এবং ইচ্ছা হয় সকলে এই যাত্রার উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল হয়।

ধন বড় না মান বড়।

মিসেস্ রায়ের At homeএ অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সকলেই চা খাইতে, খেলিতে গল্প করিতে ব্যস্ত। কেহ কেহ Tennis, কেহ বা Badminton খেলিতে ব্যস্ত। নিমন্ত্রিত সকলে পাঁচ ঘটিকার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় একখানি Rubber tyreএর টম্‌টমে একটি অতি সুন্দর সুপুরুষ যুবা মিসেস্ রায়ের বাড়ী আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তিনি কে? পরে শুনিলেন তিনি একজন Rising Barrister, ইংলণ্ডে খুব নাম করিয়াছেন, Parliamentএর Member হইতে পারেন। তাঁহার নাম অজয় গুপ্ত। মিসেস্ রায় তাঁহাকে লইয়া তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। বাগানের এক কোনে একটি টেবিলের চারি ধারে কয়েকজন অবিবাহিতা বালিকা বসিয়া গল্প করিতেছিল। এমন সময় সেখানে মিসেস্ রায় গিয়া বলিলেন, "একজন নূতন লোকের সহিত তোমাদের আলাপ করাইয়া দিতে চাই।" বালিকাদিগের ভিতর একজন বলিয়া উঠিল, "কার সঙ্গে? মিষ্টার গুপ্ত? আমার সহিত তাঁহার আলাপ আছে।" মিসেস্ রায় বলিলেন, "আলাপ আছে তো, তুমি তোমার বন্ধুদের সহিত আলাপ করাইয়া দাও।" বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। পরে সেই বালিকা উক্ত যুবকের সহিত তাহার বন্ধুদিগের আলাপ করাইয়া দিল। সে বালিকার নাম সুলতা। সুলতা যখন মিসেস্ রায়ের বাড়ী হইতে নিজ গৃহে গমন করিতেছিল তখন সে তাহার গাড়ীতে রোমা নামে তাহার এক বন্ধুকে বাড়ী লইয়া যাইতেছিল। সুলতা বলিল, "আজ অনেকের তোর উপর যা হিংসা হচ্ছে।"

রোমা বলিল, "কেন আমার দোষ কি?"

সু। দোষ আবার কি? অজয় তোর সঙ্গে অত কথা বলেছে সেই জন্য।

রো। বেশী কিছু কথা বলেন নাই।

সু। ঐ যা কথা বলেছে তাই ঢের, ওর মানেই তোকে তার পছন্দ হয়েছে।

রোমা অবাক হইয়া রহিল; কিছু বুঝিতে না পারিয়া কথার উত্তর দিল না। তখন সুলতা বলিল, "তুই ভাব্‌ছিস কি? দেখ্ আমি তোদের দুজনের বিয়ে দিই কি না।"

সে দিন রাত্রে রোমা যখন নিজ গৃহে শুইয়া আছে তখন সে একবার সমস্ত দিনের ঘটনাগুলি একে একে মনে করিতে লাগিল। পরে অজয় গুপ্তের কথা মনে হইয়া মুখ রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল। নিজের ঘরের দিকে একবার তাকাইল। পরে ভাবিল, "এ কথা

তাঁকে জানাইতে হইবে।” রোমার পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের বড় দুরবস্থা হইয়াছে। ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রোমা ও তাহার মাতা কোন রকমে দিন কাটায়। সংসারের কাজ কর্ম্ম, রন্ধন ইত্যাদি সকলই রোমার করিতে হয়। সে দিন রায়েদের বাড়ী সুলতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সুলতা রোমাকে বড় ভালবাসিত। সুলতা ধনীর কন্যা, নিজের বসন ভূষণ দিয়া রোমাকে সাজাইয়া বাহিরে লইয়া যাইতে ভালবাসিত। সুলতার নিকটে রোমার মতন সুন্দরী পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না। সুলতার অন্য বন্ধুরা বলিত সুলতা রোমার রূপের কথা বাড়াইয়া বলে। কিন্তু তাহা নয়, সত্যই রোমা অতি সুন্দরী।

মিসেস্ রায়ের বাড়ী পার্টি হইবার প্রায় দেড় মাস পরে সুলতাদের বাড়ী রোমা একদিন গিয়াছে। সুলতা বলিল, রোমা, কেমন দেখ্ আমার কথা ঠিক হয় কি না। এখন দুজনেরই পরস্পরকে পছন্দ হয়েছে, ভাল লেগেছে; এখন আর দেরি কিসের জন্যে?” রোমা সে কথার উত্তর কিছু দিল না। বাড়ীতে আসিয়া সমস্তক্ষণ তাহার মনে হইতে লাগিল, “কি করিয়া নিজের অবস্থা জানাইব? যাঁহার Parliamentএর Member হইবার ইচ্ছা ও Ambition, তিনি কি আমার অবস্থা জানিলে আমায় বিবাহ করিবেন? কেন এত দিন বলি নাই? কি করিয়া বলিব?” এইরূপ ভাবনায় রোমা সে রাত্রি কোনরূপ কাটাইল। তাহার পর-দিন সন্ধ্যার সময় যখন গৃহের কাজ করিতেছে, দেখিল খুব বৃষ্টি হইতেছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। এমন সময় একখানি ভাড়া গাড়ীতে এক জন যুবক রোমাদের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ জলে ঘোঁড়ার পা পিছলাইয়া ঘোঁড়াটি পড়িয়া গেল। ঘোঁড়াটি পড়িতে গাড়ীর কোচুয়ান উপর হইতে পড়িয়া গেল। ভাগ্যক্রমে যুবকটির কিছু লাগিল না। তিনি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এই সকল দেখিয়া রোমা চীৎকার করিয়া বাহিরে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল যুবক কোচুয়ানকে উঠাইতে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার আঘাত লাগাতে সে বসিতে পারিতেছে না। তখন রোমা গৃহ হইতে বলিল আমি কি কিছু আপনার সাহায্য করিতে পারি? পরিচিত স্বর শুনিয়া যুবক ফিরিয়া দেখে রোমা। এ যুবক আর কেহ নয়, অজয় গুপ্ত। রোমার বেশ দেখিয়া তিনি রোমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একখানি আধ-ময়লা বসন—তাহার অঞ্চল কোমরে বাঁধা। মাথায় একখানি ঝাড়ন বাঁধা এক হাতে এক খানি ঝাড়ন ও আর এক হাতে একটি রাঁধিবার বাসন। যুবক দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “আপনার যদি কোন কষ্ট না হয় তো আপনার বাড়ী এই কোচুয়ানকে বসাইয়া আমি লোক ডাকিয়া আনি।” তিনি লোক ডাকিতে

যাইবার আগে কোচুয়ানকে কোন রকমে রোমার গৃহে লইয়া গেলেন। অজয় নিজে একবার নিজের পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি করিলেন; পরে রোমার বসন দেখিয়া লজ্জা হইল। তিনি যে সুসজ্জিতা সুন্দরী রোমাকে দেখিয়াছিলেন সেই রোমার এই বেশ! তিনি এই রোমাকে দেখিয়া তাঁহার কাজ ভুলিতেছিলেন! Parliamentএর Member হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতেছিলেন! এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া রোমার দিকে না তাকাইয়া পকেট হইতে কিছু অর্থ কোচুয়ানের হস্তে দিয়া সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। রোমা অজয়ের মনের ভাব বুঝিল, অহঙ্কারে, অভিমানে, দুঃখে, কষ্টে, তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া গেল। যুবক কি ধন, মান, ঐশ্বর্য্য ব্যতীত আর কিছু চাহে না? তাহাদের হৃদয় কি নিষ্ঠুর! অমন কোমল হৃদয়খানি ভাঙ্গিবার জন্যই কি সে আসিয়াছিল? পরে অজয়ের ভৃত্যগণ আসিয়া কোচুয়ানকে ও তাহার গাড়ী ঘোড়া লইয়া গেল। এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে সুলতার ঘরে রোমা একখানি Sofaতে শুইয়া রহিয়াছে ও সুলতা মাঝে মাঝে রোমার মাথায় গোলাপ জল দিতেছে ও মাথায় হাত বুলাইতেছে। সুলতা বলিল, “রোমা, একবার বল্ দেখা কর্‌বি।” রোমা নীরবে রহিল, উত্তর করিল না।

সু। তোর প্রাণ বাঁচাইয়াছে একবার ধন্যবাদ দিবি না?

রো। না ভাই আর আমায় কষ্ট দিও না।

সু। তোকে বাঁচাইতে গিয়া নিজের প্রাণ যাইত। তোর গাড়ীর ঘোড়া যখন ক্ষেপিয়াছিল কেহ সে ঘোড়ার কাছে যাইতে সাহস করে নাই, তোর নাম শুনিয়া অজয় গিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিল। যদি ঘোড়া লাথি মারিত অজয় এতক্ষণ কোথায় থাকিত? তোর জন্য উহার প্রাণ যাইত। এই দুই বৎসর সে যে কি করিয়া কাটাইয়াছে তাহা যদি শুনিস্ তাহলে অবাক হোস্। অত যে Ambition ছিল সব গিয়াছে। বলিয়াছে রোমাকে না পাইলে আমি কিছুই চাহি না। তোর কি একটুও দয়া হয় না? দুঃখ হয় না? তোর অহঙ্কার এত? তুই বল্‌তিস্ ওর এত মান অপমান যে তোর সঙ্গে কথা বলিতে পারে নাই সে দিন, এখন যে তার চেয়ে তোর অনেক মান অপমান হইয়াছে যে একবার তার সঙ্গে দেখা করিতে চাস্ না তোর অপমান হবে বলে? ও যে রকম কষ্ট পাচ্ছে তুই জানিস না।”

রো। আমাকে যে রকম কষ্ট দিয়াছেন তাহা বোধ হয় তিনি জানেন না।

সু। সে জানে ও তাহার জন্য কষ্ট সে অনেক পাচ্ছে। রোমা, তুই যদি আমায় ভালবাসিস্ তো একবার অজয়ের সহিত দেখা কর্। তোর কিন্তু কিছু দয়া মায়া নাই। অজয়কে কখন বোধ হয় ভালবাসিস্ নি।

এই বলাতে রোমা চক্ষের জল আর

বন্ধ করিতে পারিল না; সুলতার কোলে মাথা রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি দেখা করিব।" তখন সুলতা মনে মনে বলিতে লাগিল, "এত ভালবাসা কি করে চেপে রেখেছিল?" তখন বলিয়া উঠিল, "দশ বৎসর (দুই বৎসরকে বাড়াইয়া) প্রায় রোজ রোজ সেধে সেধে আজ মন হ'ল!"

যখন অজয় ঘরে ঢুকিলেন, দেখিলেন রোমা কৌচে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আশা করি তুমি ভাল আছ, কেমন আছ নিজে দেখিবার জন্য আসিলাম। আমি বিলাতে চলিয়া যাইতেছি, এ দেশে আমার আর থাকিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক যদি তুমি থাকিতে বল তবে থাকিব। আমার কোন আশা নাই, কোন Ambition নাই। আমার যাওয়াই ভাল। তোমার জন্য আমি সকল ত্যাগ করিয়াছি। তোমায় পাইলে সকলই পাইব। নয় তো আমার কিছু দরকার নাই। যাইব কি?"

রোমা রুমালের ভিতর মুখ লুকাইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। মুখ উঠাইয়া বলিল, না, "যাইও না।"

রোমার বিবাহ সুলতাদের গৃহে হইল। বিবাহের পর অজয় রোমাকে বিলাতে বেড়াইবার জন্য লইয়া গেলেন। দুই জনে সুখে—পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

অন্তর-রাজ্য।

ভাই পাঠিকা, তোমরা কি কখনও অন্তর্জগতে গিয়াছিলে? আমি সে দিন মনমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একেবারে আত্মারাজ্যে গিয়া উপস্থিত! কি করি! একেবারে অপরিচিত স্থানে গিয়া যেন সব ভুলিয়া গিয়া কেমন "হতভম্বা" হইয়া রহিলাম। সেই অজানিত চিন্ময় আত্মারাজ্যে অসংখ্য আত্মা, সকলেই এক অপরিচিত পৃথিবীর অদ্ভুত জীব দেখিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, আমি তো ক্রমেই আরও যেন জড় সড় হইয়া অতি সঙ্কুচিত চিত্তে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এদিকে সেই আত্মাগুলি পরস্পর পরস্পরের মনোভাব ইঙ্গিত ইসারায় জানাইতে লাগিল। আমিও একটু সাহসে ভর দিয়া তাহার ভিতর হইতে পূর্ব্ব-পরিচিত কোন আত্মা চিনিয়া লইবার জন্য খুঁজিতে লাগিলাম। হয় তো কাহাকেও শৈশবে দেখিয়াছি কেবল স্বপ্নের ন্যায় একটু স্মৃতি-ছায়া আছে মাত্র, তাঁহাকে দেখিয়া কেমন যেন লজ্জা হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইল পরিচয় দিই, অথচ কথা আসিল না। মুখেই কথা বাধিয়া গেল। চারিদিক চাহিলাম আপনার জন কাহাকেও চিনিয়াও চিনিতে পারিলাম না, ধরি ধরি ধরিতে পারিলাম না। কি যেন একটা বাধা আসিয়া পড়িল। সে সুখের রাজ্য—সকলের আমোদ প্রমোদের মধ্যে একটী সংসারের জীব প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া

যেন সেই অসংখ্য আত্মারাজ্যে একটী কি গোলমাল, একটী মহা-আন্দোলন আসিয়া পড়িল!

আমি যে একজন নিরপরাধী তাঁদের কোনই ক্ষতি করিতে আসি নাই, এটা আর কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। অথচ আমার প্রাণটাও সেই আত্মাদের সঙ্গে মিলিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইল। কেবলই কোন একটি পরিচিত লোক খুঁজিয়া বাহির করিবার আশায় দেখিতে লাগিলাম। যাহাদের পরিচিত বলিয়া মনে হইল তাহারাও সেই আত্মাদিগের সহিত এমন ভাবে মিলিত যে যেন সকলেই একই বন্ধনে বাঁধা। একটিকেও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না। তোমাদের কি কখনও এমন হইয়াছে যে প্রাণের ভাব কাহাকেও জানাইতে বড়ই বাসনা হইতেছে অথচ পারিতেছ না? আমারও তাহাই হইল। যতই মুখ খুলিতে যাই, ততই কথা বন্ধ হইয়া যায়। শেষে কি জানি সেই অজানিত আত্মাগুলিও আমার কষ্ট বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিলেন। কারণ কিছুক্ষণ এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে এক এক করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমেই সকলে চারিদিক হইতে আমায় ঘেরিয়া ফেলিলেন। আমিও এই অপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া জড় সংসার, পৃথিবী সব ভুলিয়া গেলাম। কেবল ইচ্ছা হইল ইহাদের প্রাণের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া দিই। কিন্তু যাই একটু পরিচয় হইবার উপক্রম হইতেছে অমনি সংসার হইতে ডাক পড়িল এবং সেই সঙ্গে অন্তররাজ্যও কোথায় অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া গেল। বুঝিলাম এখনও সংসারের কাজ শেষ হয় নাই; তাই আবার ভাই এখানে চলিয়া আসিলাম। তোমাদের কাছে আমার এই অপূর্ব্ব কাহিনীটি না বলিয়াও থাকিতে পারিলাম না। আমাকে কি তোমরা পাগল মনে করিবে?

পূজণীয় আচার্য্য দেবের প্রত্যাদেশ (INSPIRATION) নামক বক্তৃতার অনুবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেখ অদূরে ঐ প্রস্রবণ হইতে নির্ম্মল স্নিগ্ধকর বারিধারা অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইয়া কত কত মনুষ্য ও কত জাতির উপকার সাধন করিতেছে। আমি যদি তৃষার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া ঐ প্রস্রবণতীরে গমন করি, ঐ শীতল জল পান করিয়া আমিও স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত হইব; কিন্তু আমি যদি দূরে দণ্ডায়মান থাকি, তবে কিরূপে ঐ প্রস্রবণের উপকারিতা লাভ করিতে পারিব। সেইরূপ পরমেশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় বিধান সকল অবিরত আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, যাহারা প্রার্থনাশীল অন্তরে, ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তাঁহার কৃপাবারি মস্তকে গ্রহণ করে, তাহারা পরিত্রাণ লাভ করে এবং শুদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তাঁহার

সন্নিকটে অগ্রসর হইতে অসম্মত এবং বহুদূরে দণ্ডায়মান থাকে, তাহারা আপনাদিগকে বঞ্চিত করে। যখন সমুদ্রে প্রবলবাত্যা উপস্থিত, কর্ণধার উত্তাল তরঙ্গোপরি আন্দোলিত ক্ষুদ্র তরী সম্মুখদিকে চালনা করিতে যথাশক্তি প্রয়াস করে, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মনুষ্যের ক্ষীণ বাহুবল নিষ্ফল হয়, প্রতিকূলস্রোত এত প্রবল যে তাহার দৃঢ় চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ঐ জাহাজ পশ্চাদ্গামী হয়। কিন্তু যখনই অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হয়, পাল তুলিয়া দিয়া, সমুদ্রের প্রবল স্রোত ও তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া অনুকূল বায়ুভরে সহজে চলিয়া যায় এবং আপনার গম্যস্থানে উপনীত হয়। তদ্রূপ যাহারা আপনাদের ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের সহায়তার জন্য প্রার্থনা করে, তাহারা প্রবৃত্তিনিচয়ের প্রবল স্রোত ও পরীক্ষার উত্তাল তরঙ্গ সকল উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত হয়।

সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণের অধিকারী হইয়া এবং সমগ্র অন্তরে যত্ন করিয়াও কি কারণে আমরা পূর্ণ পরিমাণে সাধুতা লাভ করিতে অক্ষম হইতেছি। সংসারে তো আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইয়াছি। কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে আমরা সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ পাপে নিপীড়িত হইতেছি? একবার উত্থান করিয়া পুনরায় পতন হইতেছে। সাধুতা ও চরিত্রের উৎকর্ষের গৌরব করিলে কি হইবে, আমরা প্রকৃত শুদ্ধতা ও পবিত্রতা হইতে বহুদূরে রহিয়াছি। ইহার হেতু নির্ণয় কিছু বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে। আমরা যদি প্রকৃত শুদ্ধতা আকাঙ্ক্ষা করি, তবে আমাদিগকে পুণ্যপ্রস্রবণের নিকট যাইতে হইবে। আমাদের স্বীয় জ্ঞান বা স্বীয় বল আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তিতেই আমাদের পরিত্রাণ। যখন আমরা প্রার্থনাশীল অন্তরে সম্পূর্ণ নির্ভরের সহিত আমাদিগের করুণাময় পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিব, তখন আমরা স্বর্গের আলোক ও অনুকূল বায়ু লাভ করিব এবং স্বর্গ হইতে অনন্তজীবনধারা বর্ষিত হইয়া আমাদের প্রাণ পূর্ণ করিবে। ইহাই প্রার্থনার শাস্ত্র, ইহা স্বচ্ছ কাচের ন্যায় পরিষ্কার, ইহাতে এমন কিছু গূঢ় অবোধ্য তাৎপর্য্য নাই, যাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। পরিত্রাণের জন্য পিপাসু হইয়া বিনীতভাবে ভগবানের পদতলে উপবিষ্ট হইলেই, তাঁহার আলোক ও শান্তি আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হইবে। "ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত জনেরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।"

তোমরা বলিও না যে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং আমাদের অভাব সমুদায় তাঁহাকে জানাইবার পূর্ব্বেই তিনি জানিতেছেন, অতএব তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে কেবল মাত্র মনের অবিশ্বাস ও সংশয় প্রকাশ

পায়। জগতের সমুদায় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে না এ কথাও বলিও না। এ কথা স্বীকার করি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার আলোক আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, তিনি তাহা অবগত আছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক আলোক যে আমাদের প্রয়োজন, তাহা কি তিনি জ্ঞাত নহেন। তথাপি তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে সূর্য্য আকাশে প্রতিদিন উদিত হইয়া কিরণ বর্ষণ করিবেন। আমরা যদি আমাদের বাসগৃহ আলোকিত করিতে চাই, তবে গৃহের দ্বার জানালা উন্মুক্ত করিলে সূর্য্যালোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিবে। পরমেশ্বর দয়া করিয়া সকলেরই জন্য আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসরণ করিলে তাহা প্রাপ্ত হই। ভগবান ঠিক এই নিয়মানুসারে আধ্যাত্মিক আলোক বিতরণ করেন। জড়জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও তাঁহার নিয়ম সমূহ অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তণীয়। আমাদের পরিত্রাণের জন্য কি প্রয়োজন, তাহা তিনি বাক্যে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই জানেন। আমাদের পাপ দুর্ব্বলতার বিষয় কি মুখের কথা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে জানাইতে হইবে? তিনি তাহা সমুদায়ই জানেন। আমরা যে পাপ অপবিত্রতার মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছি, তাহা তাঁহার সর্ব্বদর্শী চক্ষু দর্শন করিতেছে, এবং তাঁহার মুক্তিপ্রদ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই আমাদিগকে অপবিত্রতা ও পাপ দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু তিনি বলিতেছেন, দেখ সন্তান, আমার নিকট জীবন-বারির প্রস্রবণ রহিয়াছে, আমার সন্নিকটে আগমন কর এবং আমি ইহা তোমাদিগকে প্রদান করিব। ইহার জন্য প্রার্থনা কর, নির্দ্দিষ্ট উপায়ে তোমরা ইহা অন্বেষণ কর, আমার বিধানের বিধি সমূহ পালন কর, তাহা হইলে এই জীবনবারি তোমরা লাভ করিবে।

ইহাতে কি বিধাতার চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়মনিচয়ের সহিত কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে? ভগবানের প্রসাদবারি লাভ করিতে হইলে, তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। পরমেশ্বর এই বিধি দ্বারা তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তদ্দ্বারা তাঁহার শাসন বিধির মহত্ত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তাই সপ্রমাণ করিতেছেন। ইহাতে কোন মতচাঞ্চল্য বা ব্যক্তি বিশেষের অভিলাষ পূর্ণ করিতে যথেচ্ছ নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে না। ইহা প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুযায়ী কার্য্য। মানবের সৃষ্টি কাল হইতে প্রার্থনার অপরিবর্ত্তনীয় বিধি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগত নিয়মিত হইতেছে। "Ask and it shall be given you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you." প্রার্থনা কর, ইহা তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে, আঘাত কর, তোমাদিগের প্রতি দ্বার

উন্মুক্ত হইবে; ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের প্রতি পত্রে এই বিধি অঙ্কিত এবং সমুদায় প্রার্থনাশীল মনুষ্যসন্তান স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের আলোক লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের হৃদয়কে প্রার্থনার ভাবে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে, কোন কালে এ নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এবং কখন হইবে না। পরমেশ্বর যখনই আমাদের প্রার্থনার অনুরূপ ফল দান করেন তখনই তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করেন, এরূপ চিন্তা অতিশয় মূর্খতা। প্রার্থনানুরূপ ফল দানে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হয় না, প্রত্যুত তদনুযায়ী কার্য্য করা হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টির নিয়ম এবং প্রার্থনা সম্বন্ধে যে সমুদায় সংশয় অনেকের মন চঞ্চল করে, সে সমুদায় মনের কল্পনা মাত্র। সাহসের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হও, তাহা হইলে সে সমুদায় নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে। ঈশ্বরের করুণা এই একমাত্র প্রার্থনার প্রণালী দ্বারা চিরদিন পাপী জগতের ভিতর কার্য্য করিতেছে। সকল কালে সকল দেশে ভগবান প্রার্থনার ভিতর দিয়া পাপীদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং তৃষিত আত্মাতে নিজ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। বহুল দৃষ্টান্ত ও সত্য ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ন্যায় অদ্যাপিও মানবের মুক্তিবিধান এই নিয়মের উপর সংস্থাপিত। সেই করুণাময় পরিত্রাতা আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি যেরূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন এখন আমাদেরও প্রার্থনা সেই প্রকার স্নেহ প্রেমের সহিত পূর্ণ করিতেছেন। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের প্রার্থনা সম্বন্ধে জীবনের কোন অভিজ্ঞতা আছে প্রমাণার্থ তাঁহাদিগের নিকট আমি নিবেদন করিতেছি। আপনারা বলুন যে "যাহারা যাচঞা করে, তাহারা প্রাপ্ত হয়, যাহারা অন্বেষণ করে, তাহারা লাভ করে," এই কথা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ সত্য ছিল, এখনও ইহা তদ্রূপ সম্পূর্ণ সত্য কি না। যাঁহারা এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় বা অবিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা যে প্রকারে যে উপায়ে সম্ভব হয় আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করুন। প্রার্থনার শক্তি কেবল কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে, এবং আমি ইহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যদি আপনারা নিজ জীবনে সাধন করিয়া ইহা পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে আমার প্রত্যেক বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ হইবে সন্দেহ নাই।

রাঃ লঃ সেন।

(ক্রমশঃ)

মাতৃস্নেহ।

রুমানিয়ার সাম্রাজ্ঞী যাঁহাকে আমরা সচরাচর "কার্ম্মেন্ সিল্‌ভা" (Carmen Sylva) বলিয়া থাকি, তিনি তাঁহার সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতাকে যে

পত্র লেখেন তাহার ভাবার্থ অনুবাদ করিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রখানি বড় সুন্দরভাব ও বিশ্বাসে পূর্ণ। পত্রের মর্ম্ম;—"ভগবান তাঁহারই স্নেহে আমার সন্তানকে তাঁর কাছে টানিয়া লইয়াছেন। আমায় যে অতুল সুখ দিয়াছিলেন তার জন্য তিনি অনন্তকাল মহীয়ান্ ও ধন্য হউন। পুত্রশোকাতুরা জননী Niobeর ন্যায় প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া চিরক্রন্দনও বরঞ্চ আমার বাঞ্ছনীয়, তথাপি বন্ধ্যানারীজন্ম লইয়া জননী না হওয়ার যে দুঃখ তাহা আমি চাই না। বাস্তবিক একটি ক্ষুদ্র প্রাণে এত অপরিমিত সুখ! আমার সন্তান কত সুখে আছে, আর আমার স্নেহও মৃত্যু অপেক্ষা দৃঢ়, তাই তাহার সুখে আমিও আনন্দ করিতে সমর্থ। সেই ক্ষুদ্র শিশুটির বিষয় বলিবার এত আছে, তাহার এত সদ্‌গুণরাশি এমন স্বভাবের সরলতা ও বিশেষত্ব ছিল; কিন্তু তথাপি সে অনন্তকাল আমারই। আমার সন্তান অন্য কাছ হইতে পৃথক হইয়াছে বলিয়া মা হওয়ার যে গৌরব তাহা আমি হারাই নাই। এই গভীর দুঃখরাশি দ্বারা যে সুখ ক্রয় করিয়াছি তাহার তুলনায় এ শোকও অধিক নয়। ওজন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই এ দুঃখের ভার অপেক্ষা সুখের ভারই অধিক, কারণ পূর্ব্বে নিষ্কণ্টক আনন্দ ছিল আর বর্ত্তমানের যে দুঃখ তাহাও আনন্দপূর্ণ দুঃখ। সত্যই, ভগবান আমাকে অনেক দিয়াছেন, অত্যন্ত বেশী দান করিয়াছেন। এমন পিতা, এমন মাতা, এমন ভ্রাতা, এমন স্বামী, আর এমন সন্তান—কতই দিয়াছেন! এবং যদিও তাহারা আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল হয় কিন্তু তাঁর স্বর্গীয় দান তিনি কখনও ফিরাইয়া লন্ না। কারণ তাহারা চিরদিন আমাদের স্মৃতিরাজ্যে বাস করে। আমার মনে হয় যে এত সুখের পর আর কোন বিষয় আমার বলিবার অধিকার নাই। আজ পর্য্যন্তও আমার মনে যে আনন্দ আছে এ দুঃখরাশিও আমায় মুহ্যমান করিতে পারে না। আমি সর্ব্বদাই বলি যে মাতার স্নেহ, মৃত্যু অপেক্ষাও দৃঢ়; তাই আমি আমার সন্তানের সুখ ভাবিয়া সুখী হইতে পারিতেছি। কিন্তু পৃথিবী আমার কাছে চির-অন্ধকার ও নিরানন্দময়, ইহা আর অন্যরূপ কখনও হইবে না। এবং যতদিন বাঁচিব ইহা আমার সহ্য করিতেই হবে।"

* * * *

তাঁহার স্বরচিত পদ্য দুইটি ও Sir Edwin Arnold কর্ত্তৃক অনুবাদিত পদ্যটি যাহা উক্ত পত্রে ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, কারণ ইহাতে তাঁহার মনের ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতেছে।

(নিজ-রচিত)

The chill frost came in the night; the night,
And my flower all withered lies
His icy touch was so light, so light,
But it closed her fair blue eyes.

Ah me! is it thus that my joys depart,
While striken and mute I stand.
O frost, let the fire that burns at my heart,
Be quenched by thy cold, wet hand.

"I long to feel thy little arm's embrace,
Thy little silver-sounding voice to hear,
I long for thy warm kisses on my face,
And for thy bird-like carol blithe and clear.

I long for every childish, loving word,
And for thy little footsteps, fairy light,
That hither, thither moved and ever stirred
My heart with them to gladness infinite.

And for thy hair I long that halo blest
Hanging in golden glory round thy brow.
My child, can aught such longing lull to rest?
Nay, heaven's bliss alone can end it now?"

Wherefore give to poor weak women
To Earth-Mothers-babes from Heaven,
God, O God?

Fairy boons, seen but to vanish
Like a light-ray, like an air-waft!
Must then that which was one's soul's soul,
Be so reft away, and leave us,
Leave us, struck in life's midfullness
Deathly-sorrowful, and faltering?
Wherefore mads't Thou us so humble,
So in lowliest clay entangled,
God, O God?

That we, with our own dear children
No more to consort are worthy?
So that, from our arms unskilful
Thou dost them withdraw, O Father?
When our sad frail hearts were breaking?

Formerly 'twas sunshine round us,
Days of peace and long rejoicing,
God, O God!

Now is mortal silence o'er us,
Now is icy hush of heart!
As when storms have wrought their direst,
Mastless, anchorless the barque drifts,
So on Death's grey waves we welter,
And we still must live, O Father!

(Translated by Sir Edwin Arnold.)

পরিচয়।

যে দেখিত সেই বলিত সুরেন্দ্রনাথের মত সৌভাগ্যবান ও সুখী এ জগতে আর কেহ নাই। বাস্তবিক সুরেন্দ্রের এ সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। সুরেন্দ্র ধনী সন্তান; বিদ্যা, রূপ, স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই ছিল, তাহার উপর অনেকগুলি সদ্‌গুণও ছিল যদ্দ্বারা সুরেন্দ্র ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের পত্নী লক্ষ্মীস্বরূপা অমিয়া সুন্দরীকে যে দেখিত সেই তাঁহার অতুল রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তবে সুরেন্দ্রকে সর্ব্ব-সুখে সুখী বলিব না তো কি বলিব? কিন্তু তথাপি সুরেন্দ্রের জীবন যেন পূর্ণসুখী নহে। হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল; সুরেন্দ্রের কত উৎসাহ, উদ্যম, দেশের কিসে উন্নতি হয়, নূতন প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া কিরূপে ছাত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্য কর্ম্ম করিবার যে অনুরাগ ছিল, হঠাৎ তাহা কেন নিবিয়া গেল? বন্ধু বান্ধবদের লইয়া নিত্য আমোদ প্রমোদ সব ক্রমে থামিয়া আসিল কেন? সুরেন্দ্রের সেই সরল উৎফুল্ল হাস্যধ্বনি আর সকলকে আমোদিত করে না কেন? সদা প্রফুল্ল হাসিভরা মুখে বিষাদময় গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল কেন? সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, কি একটা গুরুতর চিন্তা-ভারে হৃদয় যেন সদা অবনত। ইহার কারণ কি? বাহিরে যে সকল বিষয়কে সচরাচর "সুখ" বলিয়া থাকে তাহার কোন অভাব নাই, বরঞ্চ প্রচুর পরিমাণে তাহা আছে। কাজ কর্ম্ম যখন করেন এক প্রকার বেশ থাকেন, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সময় যেন মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া আসে। তবে কি অমিয়াকে তিনি ভাল-বাসেন না? তাহাই বা কেমন করিয়া বলি; সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যসমাজের শিক্ষিত যুবা, নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। তবে বিবাহের পূর্ব্বে অমিয়ার সহিত বিশেষ পরিচয় হয় নাই।

তবে কি অমিয়া ভাল স্ত্রী নন্? তাহারও কোন প্রমাণ নাই। গৃহে গিয়া দেখ, অমিয়া সকল কাজ কর্ম্ম অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। স্বামীর যে সময়ে যাহা প্রয়োজন তখনই তাহা পান, কোন দিন কোন গোলমাল কি বিশৃঙ্খলা হয় না। অথচ সুরেন্দ্রের এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণই বা কি? চল ভাই পাঠিকা, একবার আমরা সুরেন্দ্রের সহিত গার্হস্থ্য সুখের ছবি দেখিয়া আসি। সুরেন্দ্র কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিলেন, অমিয়ার স্থির প্রশান্ত-মূর্ত্তি—চা জলখাবার প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন; স্বামী ব্যগ্রভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া অমিয়ার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, কিসের আশায় যেন অমিয়ার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু অমিয়া নিশ্চল, প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির; তাঁর মুখে কোন প্রকার ভাবের বিকাশ নাই। সুরেন্দ্র অমনি নিরাশ দৃষ্টিতে অদূরে এক খানি চেয়ারে বসিয়া জলখাবার খাইতে লাগিলেন। অমিয়া ধীরে ধীরে আমরা যাহাকে নিতান্ত Matter of fact বলি সেই ভাবে অফিসের, ঘর সংসারের কথা বলিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যেন কি আশা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে আঘাত পাইয়া নীরব হইয়া রহিলেন, এক আধবার অন্যমনস্কভাবে "হুঁ" "হাঁ" উত্তর দিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা দিনের পর দিন ঘটিতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের কাছে অপরিচিত রহিলেন। সুরেন্দ্রের হৃদয় প্রেম-পূর্ণ, অনুরাগময়; কিন্তু অমিয়ার হৃদয় কি স্নেহভালবাসা শূন্য? তাহাও নহে; কিন্তু অমিয়া ভাব প্রকাশে অক্ষম। অন্তরে তাঁর যে ভাব আছে তিনি কখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না; কিন্তু মানুষের মন এমনি ভাবে সাধারণতঃ গঠিত যে সে ভালবাসার নিদর্শন দেখিতে চায়, তাহা না পাইলে বিশ্বাস থাকে না। সেরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি কয়জনের আছে যাহা বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া অন্তর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথাকার যথার্থ ভাব জানিতে পারে? আর এটাও মনে হয় যেখানে যত বেশী স্নেহ সেখানে তত বেশী পরিমাণে প্রতিদান পাবার আকাঙ্ক্ষা। স্নেহের আব্দার বড় বেশী আব্দার। সুরেন্দ্র তাঁর অন্তরের গভীর প্রেমরাশি দিয়াছেন কিন্তু তাহার পরি-বর্ত্তে কিছু প্রতিদানের নিদর্শন অমিয়াতে না দেখিতে পাইয়া ক্রমেই মন নিরাশ হইতে লাগিল। অমিয়ার সেই নীরব মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি অথচ শুষ্ক ভাবশূন্য কথা সুরেন্দ্রকে আর সুখী করিতে পারে না। এক এক সময় মনে ধিক্কার আসিলে বলিতেন, "একটি প্রস্তরমূর্ত্তি কিনিয়া ঘরে রাখাও যা, আর অমিয়ার মত স্ত্রীও তাই।" অমিয়া ভালবাসা দেখাইতে জানেন না, অমিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিতে জানেন না, অমিয়া জানেন কেবল পুঁতুলের ন্যায় নীরব থাকিয়া কাজ কর্ম্ম কর্ত্তব্য পালন করিতে। তাই আজ দশ বৎসর বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী কেহই কাহাকে চিনিতে পারিলেন না। উভ-য়ের মধ্যে কত দূরতা, কত ব্যবধান!

অমিয়া কি সুরেন্দ্রের পরিবর্ত্তন দেখিতে পান না, তাঁর মনে সে জন্য কি কোন কষ্ট হয় না? সকলই বুঝিতেছেন, তাঁর জীবনের সুখসূর্য্য যে ক্রমেই অস্তমিত হইতেছে তাহা বেশ জানিতেছেন, কিন্তু সে সূর্য্য ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। সুখের সময়েও নীরব ছিলেন, দুঃখের সময়ও নীরবে রহিলেন। অমিয়ার সন্তা-নাদি হয় নাই সুরেন্দ্রের সংসারে ইহাও একটি বড় অভাব। একটি শিশু সন্তা-নের সুকোমল স্নেহ প্রাণের গভীর যাতনা তার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি দিয়া কেমন সরাইয়া দেয়, আধআধ সুমিষ্ট কথায় কত সান্ত্বনা দেয়! কিন্তু সুরেন্দ্র—অমি-য়ার জীবন সে সুখের আস্বাদ জানিল না। ক্রমেই একটু একটু করিয়া উভ-য়ের নিকট হইতে উভয়ে দূরে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। এতদিন যে ভাল-বাসার ডোরে সুরেন্দ্র বাঁধা ছিলেন তাহা যেন ক্রমেই শিথিল হইয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতে লাগিল। অমিয়ার স্নেহ পাইবার আশায় সুরেন্দ্র অনেক বৎসর কাটাইয়াছেন, তাঁহার ধৈর্য্য আর রহিল না; অমিয়ার ভালবাসায় তাঁহার অবিশ্বাস আসিল, সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রের স্নেহময় হৃদয় বড়ই আহত হইল। কিন্তু এত দুঃখও দুইজনকে একত্র করিতে পারিল না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। পর-স্পর দেখা শুনাও বেশী হইত না, যদি কেহ বন্ধু বান্ধব আসিতেন তবেই দুই জনকে এক স্থানে দেখা যাইত। সুরেন্দ্র একদিন তাঁর এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। ইনি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন। ইঁহার নাম ব্রজেন্দ্রকুমার রায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্র বাবুকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। ব্রজেন্দ্র বাবু সুরেন্দ্র অপেক্ষা বয়সে বড়; পৃথিবীর অনেক স্থান বেড়াইয়াছেন, অনেক দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দূরদর্শিতাও বৃদ্ধি হইয়াছিল। নানা রকম লোকের সঙ্গে বাস করিয়া নানা লোকের চিত্র আঁকিয়া স্বভাব সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। তিনি সুরেন্দ্রের বাড়ী কয়েক দিন যাতায়াত করিয়া সুরেন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিলেন। কিরূপে অমিয়ার মনের ভাব জানিবেন এ জন্য নানা রকমে চেষ্টা করিতেন। অমিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিলেন। তাঁহাতে যেন একটি সহৃদয় বন্ধু পাইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমিয়া কখনও সে ভাব প্রকাশ করিলেন?—না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন নীরব ছিলেন এখনও সেইরূপ। তবে অনেক সময় Art সম্বন্ধে বা কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক মতামত প্রকাশ করি-তেন যাহা স্বামীর নিকট একদিনও মুখ খুলিয়া বলিতে পারেন নাই। ব্রজেন্দ্র বাবু কিসে এই দুটি প্রাণের মধ্যে মিলন সন্ধি হবে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। একবার অমি-য়ার অন্তরের ভাব খুলিয়া যদি সেই ছবিখানি সুরেন্দ্রকে দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত। চিত্র-বিদ্যা শারীরিক সকল সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিতে পারে, মনের ভাবগুলি

কেন আঁকিতে পারে না? তবে মনের ভাব অনেক সময় চোক্ষের দৃষ্টিতে, প্রফুল্ল হাসিতে বাহির হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু অমিয়ার তাহাও যে নাই। সে প্রশান্ত নীরব মূর্ত্তি, স্থির দৃষ্টির মধ্যে কাহার সাধ্য কোন চঞ্চলতা বা হৃদয়ের গভীর ভাব বুঝিতে পারে? কিন্তু সুচতুর ব্রজেন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন অমিয়া হৃদয়বিহীন স্নেহশূন্য প্রাণ নহেন। সে গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, সেই স্থির নীরব ভাবের মধ্যে, অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় গভীর ভালবাসার স্রোত বহিতেছে। কেবল কেহ তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

ইহার কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে ব্রজেন্দ্র বাবুর সকালে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর একটি সুরেন্দ্রের বন্ধু তাঁহার পত্নী ও একটি পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর সকলে গল্প করিতেছেন সেই সময় অমিয়া ঘরের এক পার্শ্বে গিয়া একা বসিয়া ছিলেন, সেইখানে হরেন্দ্রনাথের শিশু কন্যাটিও খেলা করিতেছিল। শিশুটি কিয়ৎক্ষণ খেলা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অমিয়ার কোলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, অমিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে লইয়া বক্ষে রাখিয়া অজস্র স্নেহচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা যেন মূহুর্ত্ত মধ্যে জাগিয়া উঠিল; স্নেহবারি পাইবার জন্য প্রাণ তৃষিত হইয়াছিল, এই শিশুটি কোলে লইয়া যেন তাহা কতকটা মিটিল। হঠাৎ অমিয়ার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। স্নেহের বেগ আর রোধ মানিল না। মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল, চক্ষে মুখে স্নেহছটা বাহির হইয়া অমিয়ার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বাড়াইয়া দিল। কত দিনের আশা যেন এই এক মূহুর্ত্তে পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিলেন। শিশুটি কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া অমিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন সময় তাহার মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বীণা, বাড়ী চল্।" অমিয়া বীণাকে আর একবার চুম্বন করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিলেন। মনে হইল অমিয়ার দুইটি চক্ষু জলে পূর্ণ। অমিয়া মুখ বাড়াইয়া জানালার বাহিরে যেন কি দেখিতে গেলেন। তাহার পর যখন মুখ ফিরাইলেন সে মুখ সেই পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর, স্থির। মূহুর্ত্তের জন্য শিশুর কোমল স্নেহ যে স্নেহদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল হঠাৎ সে দ্বার আবার বন্ধ হইয়া গেল। যে "বীণা" হৃদয়বীণাকে স্পর্শ করিয়া একবার ঝঙ্কার করিয়া বাজাইয়া সে বীণার সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কারও থামিয়া গেল।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি একজনের চক্ষু দেখিতে পাইল; একজনের নিকটে মূহুর্ত্তের জন্য অমিয়ার হৃদয় পরিচিত হইয়া গেল। সে আর কেহ নহে ব্রজেন্দ্রকুমার! ব্রজেন্দ্রকুমার আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। গিয়াই রং লইয়া একটি ছবি আঁকিতে বসিলেন। ছবিখানি একটি অপূর্ব্বসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি, মুখখানিতে কি একটি সুন্দর স্বর্গীয় ভাব! চক্ষে কি কাতর ব্যাকুলতাপূর্ণ দৃষ্টি! সেই কাতর দৃষ্টিতে প্রাণের অতৃপ্ত আশা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখ যেন নীরব, যেন কথা কহিতে অক্ষম; কিন্তু চক্ষের ভাবে কত অব্যক্ত ভাষা, কত দুঃখের কাহিনী, প্রাণের লুক্কায়িত স্নেহরাশি ব্যক্ত করিতেছে। ছবিখানি কাহার পাঠিকা বলিতে পার কি? এ আর কেহ নহে, সেই এক মূহুর্ত্তে অমিয়ার মুখে যে ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল তাহারই প্রতিরূপ! ব্রজেন্দ্রকুমার ইহার নাম দিলেন, "Dumb Love" অর্থাৎ "নীরব ভালবাসা।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সুরেন্দ্র-

নাথ একদিন ব্রজেন্দ্রকুমারের বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। চারিদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ঐ অমিয়ার ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ে। তিনি সেখানি দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। বলিলেন, "ব্রজেন্দ্র এখানি কবে আঁকিলে, কি দেখিয়া আঁকিলে? এখানি আমায় দিতে হবে। এরূপ সুন্দর ছবি আমি কখনও দেখি নাই।" নির্ব্বোধ সুরেন্দ্র বুঝিলেন না এ সুন্দরী তাঁহারই পত্নী! কিন্তু সুরেন্দ্রেরই বা দোষ কি? তিনি অমিয়াকে এভাবে কখনও তো দেখেন নাই তাই চিনিতে পারিলেন না। ব্রজেন্দ্রকুমার প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে মনে মনে ভাবিলেন ইহা হইতে পরিণাম ভাল হইতে পারে; প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা, লইয়া যাও কিন্তু তুমি ছাড়া অন্য কেহ যেন দেখিতে না পায়।" সুরেন্দ্রও স্বীকৃত হইলেন। এবং ছবিখানি নিজের বসিবার ঘরে একটি নিভৃত জায়গায় রাখিয়া দিলেন। প্রতিদিন সেখানি দেখিতেন আর সেই ছবির ভিতরে যে লুক্কায়িত গূঢ় রহস্য রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য কতই ভাবিতেন।

একদিন ব্রজেন্দ্রকুমার ও সুরেন্দ্র তাঁহাদের বসিবার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন; অমিয়া সে দিন তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। গল্প করিতে করিতে সুরেন্দ্র বলিলেন, "দেখ ব্রজেন্দ্র, তোমায় একটি কথা বলি। তোমাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসি তাই মন খুলিয়া কথা বলিতেছি। আমার জীবন তুমি দেখ্‌ছ। আমি আর এ ভাবে থাকিতে পারিতেছি না, গৃহ ছাড়িয়া দিন কতক দেশ বেড়াইতে যাইব মনে করিতেছি। বাড়ী ফিরিবারও আর ইচ্ছা নাই; যদি বিদেশে আমার মৃত্যু হয় ভালই, আর নয় তো যখন সব ভুলিতে শিখিব তখন ফিরিব।" ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আর তোমার স্ত্রী?" এ কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অমিয়ার কোন দুঃখ হবে না; বেশ সুখে থাকিবে। সে জন্য কোন চিন্তা নাই!"

সুরেন্দ্র তখন সেই ছবিখানি লইয়া দেখিতেছিলেন আর কি ভাবিতেছিলেন এমন সময় অমিয়া নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীর ঘরে কথার শব্দ পাইয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া দাঁড়াইলেন এবং কথার শেষভাগটুকু শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমিয়ার কথা কি হইতেছে?" উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু তাড়াতাড়ি সেই ছবিখানি যেমন লুকাইবেন হাত হইতে তাহা পড়িয়া গেল। অমিয়াও তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া লইলেন। ছবি দেখিয়া বুঝিলেন! ব্রজেন্দ্র বাবু যে চোরের মত তাঁহার হৃদয়ের ভাবটি জানিয়া লইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। আর ব্রজেন্দ্র বাবু লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া রহিলেন। সুরেন্দ্র এ কিছুই বুঝিলেন না। তখন অমিয়া তাঁহার গর্ব্বিত সৌন্দর্য্যছটা বিকীর্ণ করিয়া দুই বন্ধুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজেন্দ্র বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনি আমায় জানিতে পারিয়াছেন ইহার কোন সন্দেহ নাই, এই ছবি দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। একজনও যে আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়াছে তাহার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই।" ব্রজেন্দ্র বাবু নীরব, উত্তর আর কি দিবেন? তার পর সুরেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার জন্য তোমার বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে না, আমিই চলিয়া যাইতেছি, আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার সুখের জীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু সে জন্য তোমায় আমি দোষ দিতেছি না। এ আমার নিজেরই দোষ। আমার

মনের ভাব আমি অন্যের মত প্রকাশ করিতে পারি না। আমি কতবার চেষ্টা করিয়াছি একবার তোমায় মন খুলিয়া মনের ভাব বলি কিন্তু কথা মুখেই মিলাইয়া যায়। আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। আমি জানি তোমায় আমি খুব অসুখী করিয়াছি; আমার বিবাহ করাই ভুল হইয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল তুমি সময়ে হয় তো আমায় চিনিতে পারিবে আর তাহাতে উভয়ে সুখী হইতে পারিব। কিন্তু সে আশা আমার মিথ্যা।" সুরেন্দ্র তখন যেন ক্ষমা চাহিবার জন্য কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অমিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "না, তুমি নিজেকে এখন বুঝিতেছ না, ব্রজেন্দ্র বাবু একদিন মাত্র আমার অন্তরের গোপন দ্বার খোলা দেখিয়া মনের ভাব জানিয়া ঐ ছবি আঁকিয়াছেন, সে দ্বার আবার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ যে তোমার কাছে মন খুলিয়া কথা কহিলাম তাহাও হঠাৎ আমার মনে হইল, এ ভাব আমার থাকিবে ঘটনাচক্রের, পরের মত আবার নীরব না। আমি পুনঃ ব্রজেন্দ্র বাবু ঠিক বলিয়াছেন আমার মুখ বোবা, [illegible] ন্যায় বাসা নীরব। আমি অন্য নারীর [illegible] মুখখানার কি [illegible] মনের ভাব কখনও প্রকাশ করিতে পারিব না। তুমিও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না, আমায় বিদায় দাও।" এই সময় ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এই বেলা নিজের মনের যথার্থ ভাবটাও বলিয়া লও, কেন যাইবে তাহার কারণ বল।" এই বলিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। অমিয়া তখন স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কোন দিন যাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই, চিরদিনের মত বিদায়ের কালে তাহা বলিব, আমার পবিত্র ভালবাসা তুমি জানিলে না। আমার হৃদয়ে স্বামীর ছবি ভিন্ন আর কাহারও ছবির স্থান নাই। আমি যদি যথার্থ পতিব্রতা সতী হই, আমরা পরলোকে আবার মিলিব। তুমি জানিও অমিয়া পতি ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না।"

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু খুলিয়া গেল। যে ছবিখানি তিনি সযত্নে অমিয়ার কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতেন যে অমিয়া ইহার ভাব বুঝিবেন না সেই ছবি অমিয়ার! অমিয়ার জীবন্ত মূর্ত্তির সঙ্গে না হউক তাঁহার ছবির ভিতর দিয়া অমিয়াকে চিনিয়া লইয়াছেন। আর কি তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে পারা যায়। তিনি অমিয়ার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "অমিয়া, আমায় আর লজ্জা দিও না। আমি যে এত দিন তোমার পরিচয় পাই নাই, তাই অবিশ্বাস করিয়াছি। আজ তোমাকে চিনিতে পারিলাম; এখন যদি চিরদিন কথা না কও তবুও আমার কিছু ভাবান্তর হবে না। যেখানে যথার্থ অন্তরের পরিচয় হয় সেখানে ভাষার প্রয়োজন নাই!" এত দিনে সুরেন্দ্র—অমিয়ার অন্তর পরস্পরের নিকটে পরিচিত হইল। আর ব্রজেন্দ্র বাবু নিজ গৃহে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এত দিনে ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

সংবাদ।

বিগত ১১ই জুন সার্ভিয়াতে যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ভিতরে, গভীর রজনীতে অসহায় অবস্থায় রাজা রাণীকে বধ! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড!!

প্রকৃত ঘটনা বলিবার পূর্ব্বে আমরা সার্ভিয়ার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলিয়া লই। সার্ভিয়া অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারির দক্ষিণ বিভাগে স্থিত। পূর্ব্বে ইহা তুর্কীর অধীনস্থ রাজ্য ছিল। কেবল মাত্র এক শতাব্দী হইল ইহা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। Kara George নামক সামান্য

বংশোদ্ভব কৃষকজাতীয় এক ব্যক্তি সে সময় অত্যন্ত বীরত্ব দেখায় এবং অনেকটা তাহারই ক্ষমতাবলে সার্ভিয়া স্বাধীনতা পায়। তজ্জন্য সার্ভিয়াবাসীগণ তাহাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ উহাকে রাজত্বপদে বরণ করে। ইঁহার কিছুদিন পরে তথায় আর এক প্রতিদ্বন্দী আসিয়া উপস্থিত হয়। বংশ ও জাতিতে সেও কারাজর্জেরই সমতুল। সেই সময় হইতে দুই পক্ষে ক্রমাগতই বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে লাগিল। এই এক শতাব্দীর মধ্যে যে সাত জন রাজা ক্রমান্বয়ে সিংহাসন প্রাপ্ত হয় তন্মধ্যে তিনজনকে প্রাণে বধ করিয়াছে। অপর তিনজনকে প্রাণভয় দেখাইয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। সম্প্রতি যে রাজার হত্যা হয় তাঁহার নাম আলেকজাণ্ডার। ইঁহার পিতার নাম মিল্যান। মিল্যান রুষিয়া সৈনিকের এক পরমসুন্দরী কন্যা বিবাহ করেন কিন্তু নিজ স্বভাবদোষে সুখী হইতে পারেন নাই। পরিশেষে বহু বিবাদ বিসম্বাদ ও অসুখে থাকিয়া উভয়ে পৃথক হয়েন। তাঁহাদের ঐ একটি মাত্র পুত্র, সে সময় তাঁহার বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। পুত্র মাতার বড় অনুরাগী ছিলেন, মাতা যখন দেশ ত্যাগ করিয়া প্যারিসে আসেন সে সময় পিতা আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করতঃ পুত্রকে মাতার নিকট হইতে লইয়া আসেন। কিন্তু মিল্যান এ ঘটনার কিছুদিন পরে স্বইচ্ছায় পুত্রকে রাজ্য দিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আলেকজাণ্ডার তখন ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহার উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া প্রজাগণ সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভাগ্যলক্ষ্মী যেন চিরদিনই তাঁর প্রতি বিমুখ। শৈশবে পিতা মাতার মধ্যে অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহার বাল্যজীবনে পরীক্ষার ছায়া পড়িয়াছিল। বালকের সরল ভাবের পরিবর্ত্তে কেমন একটা সকলের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাস আসিয়াছিল। প্রতিকূলতা ও ভাগ্যদোষ যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। এই সময়ে তাঁহার মাতার নিকটে "ড্রাগা" (Madam Draga Maschin) নাম্নী এক বিধবা রমণী সহচরী ছিলেন। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আলেকজাণ্ডার তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে পিতা মাতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রজাগণও অত্যন্ত বিরক্ত হয় ও নিরস্ত করিতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সকলের অমতে তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে লইয়া আসেন। আলেকজাণ্ডারের উপর রাজ্ঞীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। রাজ্ঞী স্বামীর অপেক্ষা যদিও নয় বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রেম তাহাতে কিছুমাত্রও কম ছিল না; পৃথিবীর মধ্যে তিনি কেবল স্ত্রীকেই বিশ্বাস করিতেন। ১৯০০ শতাব্দীতে ইহাদের বিবাহ হয়। আলেকজাণ্ডারের জন্ম ১৮৭৩ খৃঃ।

ইঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই। রাজ্ঞীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল; তাহাই এরূপ দুর্ঘটনার একটা প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। রাজ্যের লোকেরা রাজ্ঞীকে বড় ভালবাসিত না এবং নানা দোষে তাঁহাকে দোষী করিতে চায়, কিন্তু সে বিষয় আমাদের আলোচনা করিবার দরকার নাই। নিজের সন্তানাদি না হওয়ায় রাজ্ঞী নিজ ভ্রাতাকে রাজ্য দিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ইহাতে সার্ভিয়াবাসীগণ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। রাজা রাণী উভয়ের প্রতিই প্রজাগণ চটিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে নানা গোলমাল বিদ্রোহভাব চলিতেছিল। সেই সময় যখন রাজ্ঞী তাঁহার ভ্রাতাকে

লইয়া সাভিয়াতে উপস্থিত হইলেন একেবারে বিদ্রোহানল যেন জ্বলিয়া উঠিল। কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী মিলিত হইয়া ১১ই জুন রাত্রিতে রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হয়, দ্বাররক্ষী ও রাজবাটীর কর্ম্মচারীগণ তাহাদের দলস্থ সুতরাং দ্বার উন্মোচন ও গৃহপ্রবেশ কিছুমাত্র কঠিন হইল না। যে যেখানে ছিল সকলকে হত্যা করিতে করিতে রাজা রাণীর শয়ন ঘরের দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিতে বলে। অবশেষে দ্বার উন্মুক্ত হইল না দেখিয়া ডাইনেমাইট দ্বারা দ্বার উড়াইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। সেই ঘোর রজনীতে অসহায় দুইটি প্রাণ কতই না ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু সে নৃশংস রাজদ্রোহী প্রজাদের প্রাণে দয়ার লেশও ছিল না। রাজার হস্তে একটি পিস্তল ছিল কিন্তু এতগুলি অস্ত্রধারী লোকের সম্মুখে সে আর কতক্ষণ রক্ষা করিবে? প্রথম রাজাকে আক্রমণ করে, তিনি তখন স্ত্রীকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য পিস্তল তুলিলেন, কিন্তু নিমেষ মধ্যেই তাহারা অতি নিষ্ঠুররূপে তাঁহাদের উভয়কেই হত্যা করিল। পরে জানালা হইতে সেই মৃতদেহ দুইটি বাহিরে বাগান মধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহার পরদিন এই বীভৎস কাণ্ডের কথা শুনিয়া সমুদায় দেশবাসীগণ আনন্দ কোলাহলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতে লাগিল! কি ভয়ানক কাণ্ড! কি অমানুষিক ব্যাপার! রাজা ও রাজ্ঞীসহ রাজ্ঞীর দুই সহোদর ও আরও ৮।৯ জন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীদলকেও ঐ এক রাত্রি মধ্যে নিহত করিয়াছে।

ষড়যন্ত্রকারীগণের এ কার্য্যে কিছুমাত্র বোধ হয় দুঃখও নাই। রাজা ও রাজ্ঞীর মৃতদেহ অতি সামান্য লোকের ন্যায় কবরস্থ করা হইয়াছে। এমন কি শুনিতে পাওয়া যায় কবরস্থ করিবার পূর্ব্বে সেই মৃত দেহের উপরে আরও অস্ত্রচালনা করিয়াছিল! কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা যায় না। এখন যাঁহাকে রাজা করিয়াছে তাঁহার নাম Peter। পিটার Franco-Prussian যুদ্ধকালে ফরাসীদিগের হইয়া যুদ্ধ করেন। পূর্ব্বসম্বন্ধে সার্ভিয়ার সহিত সম্পর্ক আছে। ইহার দুইটি পুত্র আছে। সুতরাং ইহার রাজত্ব স্থায়ী হইলেও হইতে পারে।

স্বর্ণরেণু।

পৃথিবীর সৃজন হইল অনন্তকালসাগরমধ্যে।

আমাদের স্বর্গরাজ্য এই অসীম সাগরে ভাসিতেছে।

ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে একবার সেই অনন্তকালের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে আর বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

পরিচারিকার নিবেদন।

বিশ্বজননীর কৃপায় পরিচারিকা পুনঃ নববর্ষে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইল। যে সকল বঙ্গনারীর সুন্দর রচনা ও সুললিত পদ্যে ইহার অঙ্গ সুশোভিত এবং যাঁহাদের সাহায্যে পরিচারিকা আজও জীবিতা তাঁহাদের নিকট পরিচারিকা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। পরিচারিকা যে কেবল মহিলাগণকর্ত্তৃক পরিচালিত তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। অবলা পরিচারিকার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, সহৃদয়া পাঠিকাগণ, আশা করি, ইহার প্রতি চিরকৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। এবং যাঁহাদিগের নিকটে মূল্য পাওনা আছে তাঁহারা দেয় মূল্য ত্বরায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন এই বিনীত নিবেদন।

২৬ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩১০। [৪র্থ সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. AUGUST, 1903. No. 4.

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভবে সকলই অসার ...	৭৩	গল্প ...	৮৩
সরলতা ...	৭৩	পত্র ...	৮৭
স্বপ্ন ...	৭৫	সুন্দর জীবন কাহাকে বলে	৯০
পদ্য ...	৭৯	Mottoes from the (B. P.) Diary ...	৯৪
বৌদ্ধ-উদাসীন ...	৮০	বিবিধ প্রসঙ্গ ...	৯৫
সংসার নিরাপদ স্থান নয়	৮১	সংবাদ ...	৯৫
অপূর্ব্ব তীর্থস্থান ...	৮২	স্বর্ণরেণু ...	৯৬
বেবিধন ...	৮৩		

কলিকাতা,

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

FULL PRICE.

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″ × 13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

	মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯ ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০ ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১ ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২ ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪ জীবনবেদ	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৵০
২৭ ঐ ২য় ভাগ ...	।৵০
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১৷৷০
২৯ সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১৷৷০
৩০ ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১ ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২ ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩ নবসংহিতা ...	৸৹
৩৪ মাঘোৎসব ...	৷৷৹
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	৷৷৹
৩৬ ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৷৹
৩৭ ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৷৹
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	৷৷
৩৯ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৷
৪০ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৷
৪১ ঐ ৪র্থ ভাগ ...	৷৷
৪২ ঐ ৫ম ভাগ	৷৷
৪৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	৷৷
৪৪ ঐ ৭ম ভাগ ...	৷৷
৪৫ ঐ ৮ম ভাগ ...	।৵
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৵
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	৷
৪৮ ঐ ২য় ভাগ ...	৷
৪৯ প্রেম কুসুম ...	৷
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৵
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵
৫৩ সুখী পরিবার ...	৵
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	১০
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	১০
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	১০
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	১০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.

A few slightly soiled books can be had, for a few days only, at Half Price. For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা শ্রাবণ ১৩১০, আগষ্ট ১৯০৩ [৪র্থ সংখ্যা

ভবে সকলই অসার।

ইহকাল পরকালের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ কি? এ জীবন কি স্থায়ী হইবে? এই এত ধনরত্নের অধিকারী ছিল, কিন্তু কালের গতিকে সম্ভোগ করিতে না করিতে ইহলোক হইতে অপসৃত হইল। কত আশা, কত সুখের স্পৃহা, কত উৎসাহ আনন্দ তিলেকের মধ্যে সব কোথায় অপসৃত হইল! আহা এই কি দেহের পরিণাম! দেখিতে দেখিতে বৎসর, মাস, দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেই সময়, সেই মূহুর্ত্ত, সেই দিন হৃদয়-পটে চির-মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর সুখ সম্পদ আনন্দ যত কেন আসুক না, যে তার ছিঁড়িল সে আর জোড়া লাগিবে না। একদিকে সুখ ঐশ্বর্য্য কোলাহলপূর্ণ বৃহৎ অট্টালিকা, কিন্তু সে যে গরীব নিরীহ দুঃখী, অসহায় অবস্থায় ভীষণ রোগের যন্ত্রণা, প্রাণ প্রতি মূহুর্ত্তে কত অসহ্য ভাবনায় অস্থির কাতর, সে যন্ত্রণা সে বেদনা আর কে বুঝিবে? নির্জ্জনে বসিয়া সেই অন্তর্যামীর চরণে জানাইয়াছি। সে সকল দুঃখ বেদনা স্মৃতি-পথে উদয় হইলে অন্য সকল ভুলিয়া যাই। নিরন্তর সেই কষ্টই স্মরণ হয় তবে আর আমার কে? কেন পৃথিবীর লোকের স্নেহ করুণা সাহায্য প্রার্থনা করি? এ পৃথিবীতে কেহ কাহারও নয়। এ পরিচয় পাইয়াছি, জানিয়াছি, বুঝিয়াছি।

কষ্ট দুঃখ শোক পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এক এক আঘাতে কত সংসার পরিবার ছিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আমরা যেন বিশ্বাসী হইয়া তাঁহারই চরণে পড়িয়া থাকি যাঁহার হস্ত হইতে এই সকল আত্মীয় পরিজনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হই, যাঁহারই চরণে পরিণামে সকলের সঙ্গে লয় হইব।

সরলতা।

সরলতা এই গুণটি সংসারে বড় দুর্ল্লভ, সেই জন্য ইহা খুব আদরণীয়। সংসারের ভিতর থাকিতে হইলে সরল ও সত্যবাদী হওয়া বড় কঠিন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। সরল হওয়া ও সত্য কথা বলা এই দুয়ের ভিতর বিশেষ যোগ আছে। যাঁহারা যথার্থ সরল তাঁহারা প্রায়ই মিথ্যা

কথা বলেন না; আবার যাহারা কপট, মিথ্যাই তাহাদের মন্ত্র। মানুষ যদি তাহার সমস্ত জীবনে সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার অনেক দোষ থাকিলেও সাধু বলিয়া গণ্য। সরলতা, এই কথাটীর এখন একটী অন্য অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকে বলে সরল লোকেরা নির্ব্বোধ হয়। পল্লিগ্রামের লোকেরা সহরের লোকের চেয়ে সরল। মার্জ্জিত বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাব হইতে যে সরলতা সম্ভূত, তাহা যথার্থ সরলতা নয়। পল্লিগ্রামের লোকেরা কতকগুলি কুসংস্কার অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, এবং তাহাই লইয়া জীবন কাটাইয়া যায়। তাহাদের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই, তাহারা কোনও মানসিক বৃত্তির চর্চ্চা করে না। আপনার ঘর-কন্না, পুত্র পরিবার লইয়া নিশ্চিন্ত সুখে কালযাপন করে। তাহাদের সেই নদীর স্রোতের মত একটানা ও সহজ জীবনযাত্রা দেখিতে মন্দ লাগে না। অনেক সময় মনে হয় সহরের কপট জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে পল্লিগ্রামের নির্ব্বোধ হওয়া ভাল। তাহাদের কাজ আছে এবং বিশ্বাস আছে, তাহা সত্যের উপরই হউক বা অসত্যের উপরেই হউক। আজ কাল পল্লিগ্রামেও সেইরূপ সহজ সরলভাব শিথিল হইয়া আসিতেছে। সেকালে, এক একটী প্রকাণ্ড একান্নবর্ত্তী পরিবারে গৃহিণী, বধুদের সংসারে এত কাজ করিবার থাকিত যে অন্য চিন্তা করিবার তাঁহাদের অবসর থাকিত না। প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানান্তে দেবার্চ্চনা করিয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, গুরুজন সেবা, অতিথি সেবা, পশু সেবা কিছুই বাদ যাইত না। সকলকে খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ তাঁহারা সানন্দে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেন। সেই গৃহলক্ষ্মীদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পূর্ণ, পবিত্র সরল জীবন আজ কাল শিক্ষিতা সমাজে খুব দুর্ল্লভ।

আধুনিক সমাজে কৃত্রিমতার খুব প্রাবল্য দেখিতে পাই। চাল চলন, পোষাক, কথাবার্ত্তা সমুদায়ের ভিতর স্বাভাবিক সরলতা খুব কম দেখা যায়। লৌকিকতার আবরণে আন্তরিকতাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যদিও লোকসমাজে থাকিতে গেলে লৌকিকতা কতকটা প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতার অভাব থাকা উচিত নহে। অনেকে মনে করেন যে মন খুলিয়া নিজের কথা ঘরের কথা যে বলিতে পারে সে সরল। কিন্তু দর্পণ যেমন সব প্রকাশ করিয়া দেয়, সেইরূপ তাহারাও সব প্রকাশ করিয়া ফেলে। আবার কেহ কেহ এত চাপা যে তাঁহারা কাহারও সহিত মিশিতে বা সহানুভূতি করিতে পারেন না। এ দুয়ের কোনটীই তত ভাল বোধ হয় না। কথাবার্ত্তার ভিতরে স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের মনে যেন একটা মঙ্গল-উদ্দেশ্য থাকে। অবশ্য সেই উদ্দেশ্য যে প্রকাশ করিতে হইবে তাহা নহে, কথাবার্ত্তা যাহাই হউক না কেন, কাহারও মনে যেন কোন নীচ উদ্দেশ্য না

থাকে। সরল হইতে গেলে নিজের একটী উচ্চ লক্ষ্য থাকা দরকার। সেই অনুসারে সহজ ও সরলভাবে কাজ করিয়া যাইতে হয়। প্রকৃতি সরলতার আদর্শ। আমরা দেখিতে পাই, গ্রহ নক্ষত্রাদির একটী নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে এবং সেই কাজটি তাহারা কেমন সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে। আমাদের সকলেরও এক একটী নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে কিন্তু আমরা তাহা সহজ ও সরলভাবে করি না। পরস্পরের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমরাও যদি মঙ্গল উদ্দেশ্যে আমাদের কাজগুলি সরলভাবে করিয়া যাই; তাহা হইলে আমরাও বোধ হয় প্রকৃতির মত সরল এবং সুন্দর হইতে পারি।

স্বপ্ন।

আমি একা; শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া অনন্ত আকাশের তলে শয়ন করিলাম, সন্ধ্যা সমীরণ দেহকে শীতল করিয়া বহিয়া চলিল, পুষ্পরাজি সুগন্ধ দানে, প্রাণে আমোদ ঢালিয়া দিল, নীরবে আকাশের পানে তাকাইয়া চক্ষু মুদিয়া আসিল, সুযোগ পাইয়া নিদ্রা দেবী স্বপ্নকোলে দেখা দিলেন।

স্বপ্ন দেখিলাম, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত, শয্যার চারি পাশে প্রিয়জন, স্বজন। আমি বাক্‌শক্তি রহিত। স্বামী মুখের পানে তাকাইয়া নীরবে অশ্রু ফেলিতেছেন, পুত্র কন্যা, "মা" "মা" আর্ত্তনাদে আমার ক্ষীণ প্রাণ কম্পিত করিতেছে, আর ভ্রাতা, ভগিনীর শোকের ক্রন্দনে আত্মীয় বন্ধুর রোদনে ঘর পূর্ণ হইল। কত চেষ্টা করিতে গেলাম তাহাদের সান্ত্বনা দিতে, কিছুই পারিলাম না; কেবল জানিলাম তাহাদের "ছাড়িব", ভাবিয়া আমারও চক্ষে জল বহিল। শেষে আমার সেই বাক্‌হীন প্রাণ, অস্থির নির্জ্জীব দেহের মধ্যে মৃত্যু যন্ত্রণা এক ভয়ের রূপ দেখাইয়া ভীত করিল। ভাবিলাম "মরিব?" "আমি মরিব?" "এই সুখের সংসার ছাড়িয়া আমি মরিব?" তখন বাঁচিতে বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে মৃত্যু যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করি সাধ্য কি? একটু যুঝিতে না যুঝিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আর কিছুই শক্তি নাই। দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি সকলই ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল। মহা-অন্ধকার-সাগর পারে প্রাণ পার হইতে চলিল; সঙ্গে কেবল সেই বিধিবাধ্য দূত "মৃত্যু" সঙ্গে কেহ নাই। একা যাইতেছি। সেই মন, সেই প্রাণ, সেই ইচ্ছা, সেই বাসনা, কামনা সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইতেছি! মহা গভীর জলের উপর দিয়া ছোট নৌকা করিয়া যাইতেছি, এত গভীর অন্ধকার কিছুই দেখা যাইতেছে না। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল, সঙ্গের দূতকে বলিলাম, "আমি বাড়ী যাব" দূত উত্তর দিলেন "বাড়ীইত যাচ্ছ" আমি আবার কিছুক্ষণ পরে বলিলাম "না আমি

নিজের বাড়ী যাব", ভেবেছিলাম হয়ত বুঝিতে পারেন নাই, তাইতে আবার উত্তর পেলাম, "বাড়ীইত যাচ্ছ।" তখন আমি বুঝিলাম পরকালে যাইতেছি। ভয়, ভাবনা, যাতনা হৃদয়কে বড় অস্থির করিল, দূতকে বারবার বলিলাম যদি আমাকে দয়া করিয়া পৃথিবীতে রাখিয়া আসিতে পারেন। কিছুতেই সেই ছোট নৌকায় স্থির হইতে পারিলাম না, ভয়ে প্রাণ কেমন হইল। উপরে অন্ধকার, কিছু দেখিতে পাইতেছি না। মধ্যে যেন অন্য নৌকার শব্দ পাইলাম কিন্তু কোথা হইতে আসিল কে আসিল, সেও আমার মত নীরবে কাঁদিতেছে কি না জানিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কিছু জানিতে পারিলাম না। দেখিলাম কেবল অন্ধকার! নৌকা আপনাপনি চলিল। আমি তখন মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে কথা বলিলাম—

হে মৃত্যু, তুমি কেন এখন, এমন অসময়ে আমার কাছে আসিলে? আমি এই সবে সংসার আরম্ভ করিয়াছি। আমার এই অল্প বয়স, আমি কত সাধ করিয়া সংসার আরম্ভ করিলাম কেন ভোগ করিতে দিলে না? আমার স্বামী যে আমি ছাড়া একদিন সংসার করিতে পারেন না। সন্তানদিগকে দেখিবার কেহ নাই, কোলের শিশু "মা" বই কিছু জানে না। হে মৃত্যু, কেন তুমি এত নিষ্ঠুর হইয়া আমাকে আনিলে?

মৃত্যু। আমাকে বৃথা দোষ দিও না দেবি। আমি নিজ ইচ্ছায় কখনও কাহারও ঘরে, সংসারে যাইতে পারি না। আমি প্রভুর দাস, প্রভুর আজ্ঞা চিরদিন পালন করি। আমি কখনও অসময়ে কাহারও নিকট আসি না। সময় পূর্ণ হইলে জীবের নিকট আমি আসি। জন্মিবার পূর্ব্বে জীবাত্মা যখন স্বর্গধামে বলিয়া আসে, প্রভুর আদেশ পালনার্থ পৃথিবীতে আগমন করে, তখনই তাহার মৃত্যুর দিন ঠিক হয়। সেই নিয়ম অনুসারে নিরূপিত দিনে আমিও সেই মানবের কাছে আসিয়া দাঁড়াই। এইত আমার কাজ করিয়াছি আর যত দিন বাঁচিব এই কাজ করিব। লোকে আমায় জানে আমি বড় নিষ্ঠুর, তাহারা ভাবিতে পারে, কারণ আমার নামই "অন্তিম" "কাল" "মৃত্যু।" কিন্তু লোকে আমায় ঘৃণাই করুক আর ভয়ই করুক আমাকে যেন বলে "মৃত্যু"র মত প্রভুর বাধ্য ভৃত্য এমন আর কেহ নাই।"

আমি এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নীরবে রহিলাম। পরে ভীত, ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, "যদি এত শীঘ্র আসিব জানিতাম, তাহা হইলে কিছু হয়ত পরকালের কাজ করিতাম।"

ইহার উত্তরে মৃত্যু বলিল, "দেবি, আমায় ক্ষমা কর, কিন্তু এ কথা তোমার ভুল। অনেকেই আমার সঙ্গে যাইবার সময় এই কথা বলে কিন্তু আমি অনেকবার এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছি এবং আজও করিতেছি। আমাদের বিধাতার যে বিধি তাহা পালন করিতে কেহ কখনও অসময়ে আহূত হয় না।

সকলেরই ঠিক সময়ে আহ্বান হয়। তুমি হয়ত মনে করিবে যে শৈশবে, যৌবনে কেন আমি আসিয়া দেখা দিই, তাহাদের সংসারে শোকের তীব্র জ্বালা আনিয়া দিই। ইহা জানিও, দেবি, বয়সে কাহারও জীবনের কাজ বদ্ধ থাকে না। যদি কেহ পরকালের কাজ করিতে ইচ্ছা করে, সে অল্প বয়সেও পারে, যৌবনেও পারে, আবার ইচ্ছা না হইলে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কিছুই না করিয়া অলসভাবে পৃথিবীর দিন কাটায়। অতএব বয়সের ন্যূনাধিক্যে পরকালের কাজের কিছু ব্যতিক্রম হয় না। আমাকে ক্ষমা করিও কিন্তু এ কথায় প্রতিবাদ আমার করিতেই হইল। বিধির বিধি মঙ্গলময়, সে বিধির উপর কেহ অবিশ্বাস করিলে পাপ করিবে।" দূতের কথা শেষ হইল, নীরবে চক্ষের জল শতধারে ফেলিয়া আমি সকল কথা শুনিলাম। তখন মনে এক অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কেবল মনে মনে বলিলাম কেন কিছু ভাল কাজ করি নাই। ইহকালের কত কথা মনে হইতে লাগিল, অনুতাপের আগুন ভীষণ স্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কত ঘণ্টা যে এই ভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ এক কঠিন পদার্থের আঘাতে নৌকা একটু হেলিয়া উঠিল, আমি চীৎকার করিয়া "ডুবিলাম" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। শেষে দেখি নৌকা শূন্য "মৃত্যু" সঙ্গে নাই। এক রকম আলোকে দেখা গেল তীরে নৌকা লাগিয়াছে। সাগরবক্ষ অতিক্রম করিয়াছি ভাবিয়া নিরাপদ ভাবিলাম। তীরে উঠিলাম, যদিও তখন অল্প আলো দেখা দিয়াছে, তথাপি অন্ধকার একেবারে যায় নাই। সেই মৃদু আলোতে দেখিলাম, সমুদ্রতীর হইতে প্রশস্ত পাকা রাস্তা। সেই পথ ধরিয়া আমি চলিতে লাগিলাম, হঠাৎ স্ত্রীলোকের ভীষণ চীৎকার ক্রন্দন শুনিয়া থামিলাম। সেই সময় দুএকজন করিয়া লোকের ভিড় হইল, কত পরিচিত মুখ দেখিলাম। এ সকল দেশের নাম ধাম আর বলিব না। এই দেশের এবং অন্য দেশে অবস্থান কালে কত বিভীষিকা, বীভৎস ব্যাপার সকল দেখিলাম। প্রাণে কত ভয়, ভাবনা হইল। অনুতাপই সেই সকল ভয়, ভাবনা, দুঃখ যাতনা তাড়াইল। বহুদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক সূক্ষ্ম ভূমিখণ্ডের উপর দাঁড়াইলাম, সে স্থানে আর কেহ নাই, সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে অনন্ত জলরাশি, উপরে অনন্ত নীলাকাশ। একবার ভাবিলাম সেই গভীর জলে ঝাঁপ দিয়া, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, এবং সকল দুঃখের শেষ করি। কিন্তু অমনই মনে হইল, আরত মৃত্যু হবে না, মৃত্যুত আর আসিবে না। তখন প্রাণের গভীর স্থানের ব্যথিত প্রার্থনা আপনা হইতেই উঠিল এবং আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অবস্থায় সাগরতীরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এই সময় অতি সুন্দর পাখীর গানে আমি জাগিয়া উঠিলাম। সে সাগর নাই, সে নির্জ্জনতা, সে ভয়ের

আকার কিছু নাই। এক মনোহর স্থান, পাখী ডাকিতেছে, হরিণাদি অহিংস্র পশুদল হিংস্র পশু সার্দ্দূল প্রভৃতি পশুর সহিত সুখে বিচরণ করিতেছে। আমি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতেছি, এমন সময় ছোট ছোট কয়েকটি শিশু আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কোথায় লইয়া চলিল। কত দেবালয়, কত শিবালয় দেখিলাম। এক নদীর কাছে আসিয়া দেখি সাধ্বী, সতী, পতিব্রতাদল কেহ কেহ জল খেলা করিতেছেন, কেহ ফুল তুলিতেছেন, কেহ পাখীর সঙ্গে মিলিয়া গান করিতেছেন; আমি এই শোভা দেখিতে লাগিলাম, শিশুর দল আমাকে এই স্থানে রাখিয়া তালে তালে নাচিয়া, হরিগুণ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। আমাকে এই সাধ্বীদের মধ্যে দুই চারি জন আসিয়া সুন্দর তটিনীজলে টানিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আর পবিত্রতার সৌরভ পাইয়া ইচ্ছা হইল, কোথাও লুকাইয়া যাই। কিন্তু এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে সেই পুণ্যচরিত্রা দেবীদলের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমার হাত ধরিলেন; আমি যেন কুণ্ঠিত ভীত হইলাম, তাঁহারা আমায় তটিনীজলে ফেলিয়া দিলেন। নদীজল স্পর্শে প্রাণ, মন কি শীতল হইল! দুঃখ কষ্ট বলিয়া যে জীবনে কোন কথা ছিল একেবারে ভুলিয়া গেলাম। নদীতে কতক্ষণ ডুব দিয়া রহিলাম। স্নান করিয়া উঠিয়া দেখি, সেই দেবীদল আমার সাজ সজ্জা যত্নে গুছাইয়া রাখিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি কত অপরাধীভাবে, তাঁহাদের পদতলে দাঁড়াইলাম। তাঁহারা বস্ত্রাদি আমাকে নিজ হস্তে দিলেন। গৈরিক বসন পরিবা মাত্র, তাঁহারা কেহ চন্দন ফোঁটা কেহ সিন্দুর ফোঁটা দিয়া আমাকে সাজাইলেন। শেষে ফুলের মালা গলায় পরাইয়া আমাকে একজন বলিলেন, "আমাদের মনে নাই? বাড়ী, দেশ সব ভুলিয়া গিয়াছ? এইখানে কত খেলা করিয়াছি, ভুলিয়া গিয়াছ?" ফুলের মালার এমনই মহিমা! আমার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিবা মাত্র আমার স্মৃতিশক্তি উজ্জ্বল হইল। জন্মিবার পূর্ব্বে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, সকলই জানিতে পারিলাম। দেবীগণের স্পর্শে হৃদয়, মনে কি স্বর্গীয় আনন্দ হইল। পবিত্র সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দেবীগণের পদ স্পর্শ করিলাম। তাঁহারা আমাকে লইয়া পূজার ফুল তুলিতে গেলেন। ফুল তোলা হইলে বলিলেন, "চল আজ অনেক দিন পরে মার মন্দির সাজাবে চল।" "মার" মন্দিরে আমি প্রবেশ করিব, "মার" মন্দিরে আমি ফুল দিব! আমি যে জন্মাবধি অপরাধী প্রাণে এই কথা প্রতিঘাত হইতে লাগিল। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ও আমার মনের কথা সকল জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভুলিয়া কি গিয়াছ মা আমাদের দয়াবতী? মার দয়া অনন্ত, অসীম। পাপের শেষ আছে, কিন্তু মার দয়ার শেষ নাই।" সকল কথা মনে পড়িল।

দেবী দলের সঙ্গে মাতৃ দর্শনে গেলাম। পথে যাইতে যাইতে কত কথা মনে পড়িল। সেই দেশ, সেই বাড়ী, পুলকে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আমিত শিশু হইলাম, "আমার মা কৈ?" হৃদয় "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল অমনই দেখি চির-পরিচিত স্নেহময়ী মা আমার সম্মুখে! সেই পূর্ণস্নেহমাখা স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। মাতৃহারা পথহারা হইয়া পৃথিবীতে কত দিন ঘুরিয়াছি আজ মার স্নেহ, মার আদরে প্রাণটা বিচ্ছেদের যাতনা ভুলিয়া চরণে লুটাইয়া কেবল "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা আমায় স্নেহভরে উঠাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মার স্নেহবাক্যে আমার নয়ন ঝরিল। মা বলিলেন, "চল সেই মার মা, জননীর জননীকে দেখিবে চল।" মাকে পাইয়া আর আমি কাহাকেও চাহিলাম না, মার কোমল, সুন্দর হাতের মধ্যে আমার হাত রাখিলেন, মার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে মার মাকে দেখিতে চলিলাম। সঙ্গে দেখি দেবীদল, শিশুদল, পক্ষীদল, পশুদল সবই আসিতেছে। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা এ কোথা এসেছি, কেন মা ইহারা সকলে সঙ্গে আসছেন?" মা বলিলেন, "বাছা, এই আনন্দরাজ্যে আনন্দময়ীর পূজা সকলে এক প্রাণে, এক তানে করে। দেব দেবীগণ, পশু পক্ষীগণ সকলে এক স্বরে মার পূজা করে। মার মন্দির পূর্ণ মার সন্তান দ্বারা। এখানকার পূজার শেষ নাই। এ রাজ্যে কেবল আনন্দ।" অদূরে দেখিলাম নানা রত্নখচিত অপূর্ব্ব মন্দির, দেবগণ তুরী ভেরী বাজাইতেছেন, পুষ্পগুচ্ছ হস্তে লইয়া শত শত দেবী মন্দিরে ফুল সাজাইতে প্রবেশ করিলেন। দেবগণমধ্যে মন্দিরদ্বারমুখে দেখি সেই চির-আনন্দময় পিতৃমূর্ত্তি, পদতলে পড়িয়া বলিলাম "বাবা!" পিতৃদেব হস্ত ধরিয়া তুলিলেন; পিতা মাতার পদতলে দাঁড়াইলাম। ধূপ ধূণায়, ফুলের গন্ধে, পিতা মাতার স্নেহে, আনন্দ ভুবনের শোভায় প্রাণ নাচিয়া উঠিল, মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিব, বিশ্বজননীমূর্ত্তি দেখিব ভাবিয়া এত ব্যাকুল হইলাম, যে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পদ্য।

(হিন্দুমহিলা রচিত)

জনমিয়ে ভূমণ্ডলে চিরদিন দুঃখানলে
দগ্ধ হইতেছে এ হৃদয়;
একদিন পৃথিবীতে সুখলেশ নাহি চিতে
প্রফুল্লের না হল উদয়;
কাঁদিতে কাঁদিতে নামি ভূমিষ্ঠ হইনু আমি
সে রোদন না হল নিবারণ;
আর কাঁদিতে না পারি, কৃপা কর ওহে হরি
ভিক্ষা করি ধরে শ্রীচরণ।
মিনতি করিছে দাসী মুক্ত কর পাপরাশি
তুমি ভিন্ন আর গতি নাই;
হরিনাম পাপ হরে এই কথা সর্ব্বতরে
সাক্ষী তার জগাই মাধাই;
হইতেছে দিন দিন ক্রমাগত তনুক্ষীণ
শেষ দিন হইল নিকট।

মনে হইতেছে ভয় পাছে আসি সে সময়
দাঁড়ায় কৃতান্ত সে বিকট।

কোথা হে অখিলনাথ শ্রীমধুসূদন
কৃপা করে এ দাসীরে দাও দরশন ;
অসার সংসার বনে করি পর্য্যটন,
ঢেকেছে ভাবনা মেঘে হৃদয়গগন।
এখন উপায় নাথ বল কিসে তরি,
মহারিপু মায়া মোহ এড়াই কি করি।
কে দিবে সে উপদেশ কার কাছে যাই,
তত্ত্ব কথা শুনে আমি জীবন জুড়াই ?
তাতে মত্ত থাকি সদা এই আকিঞ্চন,
বিষয় বাসনা সুখে দিয়ে বিসর্জ্জন ;
তব কৃপা বিনে প্রভু না দেখি উপায়,
দিন দিন ক্ষীণ তনু দিন যায় যায়।
ক্ষণেক চৈতন্য হয় ক্ষণেক অচৈতন্য,
এমনে কেমনে রাখি বল হে চৈতন্য ?
এখন বাসনা এই শুন দয়াময়,
তব পদে প্রাণ মন হয় যেন লয়।
নয়ন সতত যেন হেরে সে চরণ,
কর্ণ যেন হরিগুণ করয় শ্রবণ।
দেবালয়ের সুগন্ধ নাসা যেন লয়,
মন যেন হরিগুণে মগ্ন হয়ে রয়।
হরির কীর্ত্তন সদা কররে রসনা,
করিতে দেবসেবা কখন ভুল না।
পদ যেন সদা করে তীর্থ পর্য্যটন,
দেহ তব কার্য্যে যেন করি সমাপন।
আর এক নিবেদন করি দয়াময়
ঘুচাও আমার এই অন্তর সংশয়।
একান্ত তোমাতে যেন থাকেহে বিশ্বাস,
কিছুতে না করি আমি সংসারের আশ।
নিতান্ত হয়েছে আমার মন বোকা চাষা,
ভাবেনাক শেষে ক্ষেত্রের কি হইবে দশা।
দেহ-জমির ভার লয়ে, আছে সে ভুলে,
চষা, খোঁড়া পাট করা দিয়াছে তুলে।
যদি মন বলে আমি লাগাই চাষেতে,
ছটা দুষ্ট গরু এমন জোড়ে নাহি তাতে,
ঐ ছটা বলদ যেন প্রবল না হয়,
দয়া করে দয়াময় করহে উপায়।
নিবৃত্তি কোদালে জমি করিয়ে খনন,
জ্ঞান-মই তাহাতে করিও চালন ;
সার বীজ হরিনাম তাহে ছড়াইয়া
মোহ, জঞ্জাল ঘাস দেয় উপাড়িয়া ;
উর্ব্বরা করিতে ক্ষেত্র মনে ছিল আশা,
সাধু-সঙ্গ-সার কিন্তু না পাইল চাষা।
প্রবৃত্তি বন্যায় জল আসি ডুবাইল ;
কেমনে সিঞ্চিব জ্ঞান-সেচান ভাঙ্গিল ?
ভরসা শ্রীপদ তব, তরণী কেবল,
কুপ্রবৃত্তি বায়ুভরে করে টলমল ;
হরিনামে বাঁধে আল যদি হয় রক্ষা
তবেত কাটায়ে লই এবারের ধাক্কা।

বৌদ্ধ-উদাসীন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করে। ইহাদের বাসগৃহের নাম বিহার ; কিন্তু বৎসরে কয়েক মাস বনবাস করিয়া বৃক্ষতলে কালযাপন করিতে হয়। ইহারা স্বহস্তে চীরপুঞ্জ পরিধান করিয়া তাহার আবরণ স্বরূপ একটী পীতবর্ণ আল্-খেল্লা ব্যবহার করে। শ্মশ্রু ওমস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখে। স্ত্রী ও নৃত্য গীতাদি

অন্য অন্য যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখ-ব্যাপার পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়। ইহারা একাহারী ; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-পর্য্যটনপূর্ব্বক আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ন কালেই একস্থানে একত্র ভোজন করে ও একরূপ উপবিষ্ট হইয়াই নিদ্রা যায়। গৃহস্থ লোককে উপদেশ দান এবং মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। এই সম্প্রদায়ের মতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম। কি জানি কোন ক্ষুদ্র কীট উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় ইহারা সন্ধ্যার পর ভোজন করে না। কি জানি কোন ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ইহারা সন্ধ্যার পর ভোজন করে না। কি জানি কোন ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ইহারা উপবেশন স্থল মার্জ্জিত করিয়া উপবেশন করে। কি জানি নিশ্বাস সহকারে কোন কীট পতঙ্গ উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। দান, ধ্যান, শীল, তিতিক্ষা, বীর্য্য, প্রজ্ঞা এই কয়েকটি পরমোৎকৃষ্ট প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠান করা ইহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অন্য দুইটি নাম শ্রমণ ও শ্রাবক। গৃহীদের নাম উপাসক ও উপাসিকা। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্ম-ব্রত পালন উদ্দেশ্যে ইচ্ছানুসারে গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া থাকে। তাহাদিগকে ভিক্ষুণী ও শ্রমণা বলে। রোমান কেথলিক্ নামক খৃষ্টিয় সম্প্রদায়ের নন্ এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কুমারী শ্রমণা প্রায় তুল্য রূপ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শাক্য মুনির সময়েই ঐ শ্রমণা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রমণারা সর্ব্বতোভাবেই শ্রমণদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা এবং তাহাদের উপদেশ গ্রহণ ও আদেশ পালন করা শ্রমণাদের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। শ্রমণদিগকে উপদেশ দান, তাহাদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং স্বেচ্ছানুসারে কুত্রাপি গমনাগমন করা শ্রমণাদের পক্ষে বিধেয় নয়। তাহাদিগকে উপদেশ গ্রহণ বা ধান্যাদি সাধনার্থ কুত্রাপি গমন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

সংসার নিরাপদ স্থান নয়।

"সংসারেতে ভয় ঘোচে না, সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি ; অভয়চরণ দাও দয়াময়, ভয়কে ভয় দেখায়ে রাখি।" এই পুরাতন সঙ্গীতটি প্রায়ই হৃদয়ে জাগরিত হয়। সংসার—যে নিরাপদ স্থান নয়—ইহার প্রমাণ প্রতিক্ষণই দেখাইতেছে। স্থির হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কোন রকমে কাটাইতে পারি না। যত বয়স বৃদ্ধি হইতেছে তার সঙ্গে ভাবনাও বৃদ্ধি হইতেছে। সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ কেমন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। কোন বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মীয়ের রোগ শোক প্রাণকে চমকিত করিয়া তোলে। সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ভাব। নিশ্চিন্ত হইতে

কিছুতেই পারি না। যতক্ষণ কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি অন্যমনা হইয়া কতক সময় কাটিয়া যায়। আবার নিদ্রার সময়ও চিন্তা আসিয়া মনকে উদাস পরিশ্রান্ত অবসন্ন করে। সংসারে থাকিতে হইলেই কি দুশ্চিন্তা আসিয়া মনকে অবসন্ন করে। এই যে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ইহার পরপারে কি লুক্কায়িত আছে কে জানে? কেন মন পরিশ্রান্ত হও? সাহস, বল ধর, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়াছ এখন নিরাশ অবসন্ন হইলে চলিবে না। কার্য্য কর, তাঁর দিকে তাকাও। যাঁর হস্তে সমুদয় ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান, তাঁর চরণে সমুদয় জীবন সমর্পণ করিয়া, ভবিষ্যৎ সুখের আগার, এই চিন্তা করিয়া সাহসের সহিত কার্য্য করিয়া যাই। বিচারপতি যিনি, ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় বিচার তাঁহারই হস্তে। তবে আমরা কেন বিচার করি, যুক্তি তর্ক করি? তাঁর কার্য্য তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। তবে বৃথা ভাবনা ভয়ে কেন দিন কাটাই? তাঁর মঙ্গল পদে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া থাকি তবে জীবন্মুক্ত হইব। স্বধামে চলিয়া যাইব।

অপূর্ব্ব তীর্থস্থান।

(প্রাপ্ত)

পৃথিবীতে কত স্থান সৃষ্টিকর্ত্তা সুন্দররূপে রচিত করিয়া রাখিয়াছেন। কত সুন্দর পর্ব্বত, নদ নদী, বন উপবন আছে যাহা আমাদের চক্ষের অদৃশ্য। সময়ে সময়ে শ্রান্ত নয়নকে তৃপ্ত করিবার জন্য বিশ্বস্রষ্টার রচিত বিশ্বকার্য্য দেখা প্রয়োজন। সুন্দর নদী গিরি ভেদ করিয়া অবিরত ধারে ছুটিতেছে। মধ্যে সুন্দর পর্ব্বত নদীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, এ সকল কি সাধনের স্থান নহে? বাল্যকালে জব্বলপুরে যে জলপ্রপাত দেখিয়াছিলাম সেই শোভা এই জয়ন্তী নদীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্মরণ হইল। এ ঘোর জঙ্গলের ভিতর যে এমন অপরূপ দৃশ্য লুক্কায়িত আছে কে জানিত? যেমন খনির মধ্যে হীরক মনি লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ অজানিত দেশের মধ্যে কত স্বর্গীয় দৃশ্য অপূর্ব্ব শোভা লুক্কায়িত আছে। যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন যেমন সুন্দর ছবি আকাশে উদিত হয় কিন্তু দেখিতে দেখিতেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়; "আমরা বলি মনুষ্যের পাপ চক্ষের নিকট সুন্দর শোভা কতক্ষণ থাকিবে, দেখিতে দেখিতে আকাশের গায়ে বিলীন হইয়া গেল" তেমনই সে দিন সুন্দর জয়ন্তী সখীকে দেখিতে গিয়া স্বপনের নগর ও তার দৃশ্যটি মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন ভাবিলাম পাপীর ভাগ্যে স্বর্গরাজ্যের শোভাও এইরূপ, সম্ভোগ করিতে না করিতে, দেখিতে না দেখিতে, পর্দা পড়িয়া গেল। সুন্দর শোভা অদৃশ্য হইল। জয়ন্তী সখীর নির্ম্মল সলিলে উত্তপ্ত দেহ উত্তপ্ত মস্তক স্নিগ্ধ করিলাম। এ সকল সাধনের স্থান যোগী ঋষিগণের স্থান। এখানে পাপী সংসার ছাড়িয়া আসিয়া সাধন করিবে। পবিত্র তীর্থস্থানে ভগবানের চরণে ভক্তি অঞ্জলি দিবে। এমন সুন্দর স্থানে আমার মত পাপীর মন নির্ম্মল হউক, শুদ্ধ হউক।

বেবিধন।

[শ্রীপ্রমোদনাথ, জন্ম ৮ই অক্টোবর ১৮৯৮ স্বর্গগমন ১১ই জুলাই ১৯০৩]

আদরের বেবিধন গেলি কোথা হায়
দুদিনের তরে এসেছিলি কি ধরায়?
কেন তবে মিছে সবে বাঁধিলি মায়ায়
দুদিনের খেলা ক'রে যাবি যদি হায়!
প্রমোদ নামেতে ধ্রুব জীবন লইয়ে,
দিলিরে কতই স্নেহ হৃদয়ে ঢালিয়ে।
দেখিতে সে, বাপ, তোর মুখ ভরা হাসি,
শুনিতে সে মিষ্ট বাণী বড় ভালবাসি।
"মা আমায় ভাল কর" বলি সে প্রার্থনা,
আর কিরে বাপ মোরা শুনিতে পাবনা?
"গরীবের ঠাকুর হরি বড় দয়াময়"
বলে কিরে নেচে বেড়াবিনে পাড়াময়?
পাঁচ বৎসর বয়স পুরেনি এখন,
কোথা তবু পেলি এত বুদ্ধি ধর্ম্ম জ্ঞান?
তোর মত ছেলে ভবে দেখিনি কোথায়,
তাই বুঝি পলালিরে চমকি সবায়?
হইতে সবার বড় সদাই চাহিতে,
তাই বুঝি পলালিরে সবার আগেতে।
মা বাপের শত আশা বিফল করিয়ে,
গেলি চলে আমাদের সবে কাঁদাইয়ে।
সামান্য জ্বরেতে বাছা কাতর হইয়া
সুখী ছেলে গেলি তুই তনু তেয়াগিয়া।
জানিনে কতই কষ্ট দিছি মোরা তোরে,
ভাবিলে বিদরে হিয়া দুনয়ন ঝরে।
কি পাপে হারানু মোরা তোমা হেন ধনে,
কেন শেল হেনে গেলি আমাদের প্রাণে।
যদিও ছিলিরে তুই পৃথিবী মাঝারে,
স্বর্গের জীবন তোর ছিল স্বর্গপুরে।
তোর বুঝি যোগ্য মোরা নহিরে বলিয়া,
স্বর্গধামে গেলি ধন মোদের ত্যজিয়া?
স্বর্গের কুসুম তুই স্বর্গে থাকিবার,
কেন আমাদের কাছে রবি তুই আর?
থাক ধন সুখে স্বর্গে জননীর কোলে,
পাই যেন সঙ্গ তোর লীলা সাঙ্গ হলে।

শ্রীশরৎ কুমারী বসু। (কটক)

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে দিন সুরমার খুল্লতাতের মৃত্যু হয় সে দিনের ঘটনা আমরা সব জানিতে পারি নাই। শ্যামাচরণ বাবু সুরমার চিঠিখানি না পাঠাইয়া নিজে যখন এক খানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, সেই সময়ে তাঁহার এক ভৃত্য মনোরমাকে পত্রখানি দিয়া আসিয়া পুনরায় সুরমার হস্ত লিপিখানি পরে মনোরমাকে গোপনে দিয়া আসে। সুরমাদের সে ভৃত্যটি অতি পুরাতন, সুরমাকে সে জন্মাবধি দেখিয়াছে ও তাহার কার্য্য করিয়াছে। যে সময়ে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামাচরণ বাবু সুরমাকে তিরস্কার করিতেছিলেন তখন সে অন্তরাল হইতে কিছু কিছু কথা শুনিয়াছিল। সুরমার বিপদ দেখিয়া

তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। শ্যামাচরণ বাবু যখন সুরমার হস্ত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া আসেন তখন সেখানি তাঁহার টেবীলের উপর রাখিয়া অন্য পত্র লিখিয়া ভৃত্য হস্তে মনোরমাকে পাঠাইয়া দেন। পরে ভৃত্য গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্যামাচরণ বাবুর অজ্ঞাতসারে সুরমার চিঠিখানি গোপনে অতি সতর্কে মনোরমার নিকটে লইয়া যায়। মনোরমা পত্র পাঠে অত্যন্ত বিস্মিত হইল ও ক্লেশ পাইল। সে তৎক্ষণাৎ পত্রখানি জ্যোতিন্দ্রের নিকটে প্রেরণ করিল। জ্যোতিন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে গমন করে। পরদিন কি ঘটনা হইল তাহা আমরা জানি। জ্যোতিন্দ্র উক্ত ঘটনা শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত হয় ও মনোরমাকে বলে "দেখ আমি যখন শ্যামাচরণ বাবুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসি তখন তো বেশ ছিলেন, প্রথমে তিনি আমার কথা কোন মতেই শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না অনেক করিয়া বলাতে তবে সুরমার সহিত আমার বিবাহ দিতে মত দিলেন। আপনি এ কথা প্রকাশ করিবেন না, কারণ আমি যে রাত্রিতে গিয়াছিলাম তাহা শ্যামাচরণ বাবু ও আপনি ব্যতীত আর কেহ জানে না।" মনোরমা এ কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিল না। মনোরমার জ্যোতিন্দ্রের উপরে কণামাত্র সন্দেহ হয় নাই। যখন তাহার পিতা সুরমাকে সন্দেহ করিলেন তখনই তাহার মনে সন্দেহ ঢুকিল, মনে হইল হয় তো সুরমাকে পাইবার জন্য জ্যোতিন্দ্র এ ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছে। মনোরমা কি করিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। যদি সুরমাকে বাঁচাইতে হয় তবে জ্যোতিন্দ্রকে জেলে দিতে হয়। জ্যোতিন্দ্র জেলে যাইলে সুরমা চিরদুঃখিনী হইবে। এই চিন্তা মনোরমার মনকে অস্থির করিতে লাগিল। মনোরমা উভয়কে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে স্থির করিল। জ্যোতিন্দ্র যে শ্যামাচরণ বাবুকে হত্যা করিয়াছে এ সন্দেহ দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। এক দিন রাত্রিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। নিজে যদি চিরদুঃখিনী হইয়াও দুটি জীবনকে সুখী করিতে পারি এই ভাবিয়া সে রাত্রিতে মনোরমা স্বামীগৃহ ছাড়িয়া একাকী চলিয়া গেল।

রাজকুমার পত্র পাঠে মর্ম্মাহত হইলেন। আর মনোরমার বৃদ্ধ পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মনোরমাই কি তবে দোষী? কি ভয়ঙ্কর! এ কথা স্মরণেও শরীর শিহরিয়া উঠে। বৃদ্ধ পিতার যদিও কন্যার জঘন্য কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল তথাপি কন্যার প্রতি মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি মনোরমার সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজকুমার মনোরমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও গুণে বশীভূত ছিলেন। মনোরমার গুণ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেবীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। ভালবাসা রহিল কিন্তু অন্য ভাবটি রহিল

না, যাহাকে দেবী জ্ঞানে কত সম্মান করিতেন তাহার হস্ত আজ ঐ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মে কলঙ্কিত! রাজকুমার এ কথা চিন্তা করিতে পারিতেন না, অতি যতনের পবিত্র প্রতিমা আজ তাঁহার পদতলে ধূলায় লুণ্ঠিত! উচ্চ সিংহাসনে যাহার দেবী মূর্ত্তি পূজিত হইত আজ সে সেস্থান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। রাজকুমার মনোরমাকে এখনও ভালবাসেন কিন্তু এ ভালবাসার সঙ্গে সে প্রেমের তুলনা হয় না। হায়, হতভাগিনী মনোরমা জানিত না যে বন্ধুকে বাঁচাইতে গিয়া সে কি সুখের স্থান হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইল। রাজকুমার ও মনোরমার পিতা উভয়ে কাহারও নিকটে এ কথা প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন। মনোরমা তাহার এক খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীর গৃহে বাস করিতেছিল। তাহার পিতা অনুসন্ধান করিয়া তাহার ঠিকানা পাইলেন। যে দিন মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন, সে দিনের দৃশ্য অতি ভয়ানক। মনোরমা পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া ভাবিল তাঁহারা উহাঁকে নির্দ্দোষী জানিয়াই আনন্দে দৌড়িয়া দেখিতে আসিয়াছেন। গিয়া তাঁহার পা দুখানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা ক্ষমা কর;" তাহার পিতার এতক্ষণ মনোরমাকে না দেখিয়া যেন প্রাণ কেমন করিতেছিল—অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, মনোরমাকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, সজোরে তাহার হস্ত পা হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিস্ না, তোর কলঙ্কিত হস্তে আমার পদ স্পর্শ করিতে সাহস করিস্ না। যদিও আমি তোর পিতা, তথাপি বলিতেছি ভগবান উপরে আছেন তিনিই শাস্তি দিবেন।" মনোরমার দুঃখে অভিমানে ঘৃণায় লজ্জায় হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তাহার তখন পিতার প্রতি ভয়ানক অভিমান হইল, পিতা তাহাকে সন্দেহ করিলেন, এই ভাবিয়া তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। হায়, বালিকা মনোরমা, তুমি এখনও বালিকা, কি ভয়ঙ্কর দোষে নিজেকে দোষী করিয়া এখন পিতার উপর অভিমান করিয়া কষ্ট পাইতেছ! মনোরমা নিজের কথা ভাবে নাই, সুরমাকে ও জ্যোতিন্দ্রকে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে ভাবিয়া সে ইহা একটা গৌরব মনে করিত। এক্ষণে পিতার একটি একটি কথা তাহার হৃদয়ে একটী একটী শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। মনোরমা মনের ভাব বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিল না। অভিমান ও দুঃখে তাহার বাক্য রোধ হইল। মনোরমাকে নীরব দেখিয়া, তাহার পিতা বলিলেন, "গাড়ী আসিয়াছে এক্ষণে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মনোরমার কাঁদিতে কাঁদিতে শরীর অবসন্ন হইল। তাহার বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী যত্নে উঠাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন রাগ করিয়া মনোরমা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তাহার

পিতা এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজকুমারের ইচ্ছাতে মনোরমাকে বিদেশে লইয়া যাওয়া হইল, সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য দাসী রহিল। মনোরমার পিতা তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। রাজকুমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, তাঁহার মনে তেমন জোর ছিল না হয় তো মনোরমার ক্রন্দন দেখিয়া হৃদয় বিগলিত হইবে ও তাহার সকল দোষ ভুলিয়া যাইবেন এই ভাবিয়া দেখা করিলেন না। আপনার লোকেদের বলা হইল মনোরমার শরীর অসুস্থ তজ্জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনে বিদেশে গমন করিয়াছে। মনোরমার পিতা মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতে আসিতেন। মনোরমা দুঃখিনী নির্ব্বাসিতা সীতার ন্যায় একাকী বাস করিতে লাগিল। প্রতিদিন সে আশা করিয়া থাকে রাজকুমার দেখা করিতে আসিবেন, কিন্তু প্রতিদিনই নিরাশ হয়। রাজকুমার সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক পত্র অবধি লিখিতেন না খোঁজও লইতেন না। ইহাতে কি রাজকুমারের কষ্ট হইত না? তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। মনোরমা এক এক সময়ে ভাবিত এ জীবন রাখিয়া কোন সুখ নাই। কিন্তু এ কার্য্য করিলে পাপ হইবে, দুইটি প্রাণ বিনষ্ট হইবে এই ভাবিয়া নিরস্ত ছিল। কয়েক মাস পরে মনোরমার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। পুত্রটি দেখিতে অতি সুন্দর। রাজকুমার এ সংবাদ পাইলেন বটে কিন্তু দেখিতে আসিলেন না। মনোরমার পিতা দেখিতে আসিলেন। সন্তানটিকে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত মায়া হইল। মনোরমার মনের কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইল। সন্তানটিকে পাইয়া তাহার অনেক কষ্ট দূর হইল। সন্তানটি তাহার জীবনের এক মাত্র সুখ। দিন যায় মাস যায়, রাজকুমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইয়া আসেন না দেখিয়া সকলের মনে এক সন্দেহ হইল, তাহারা ভাবিল রাজকুমার মনোরমাকে আর ভালবাসেন না।

এত দিন আমরা সুরমার সংবাদ পাই নাই। সে পরম সুখে দিন যাপন করিত। প্রতিদিন মনোরমার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিত। প্রায় পত্রাদি লিখিত কিন্তু কোন উত্তর পাইত না বলিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইত, ভাবিত আর মনোরমা বুঝি তাহাকে স্নেহ করে না। হায় মনোরমা যাহার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতেছে সে এই কথা কি করিয়া ভাবিতেছে? অবশেষে মনোরমার সন্তান হওয়া সংবাদ পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চিঠির উত্তর পাইল না। সে চিঠি মনোরমার নিকটে পৌঁছিল না। জ্যোতিন্দ্রের ইচ্ছায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুরমা পত্র লেখা বন্ধ করিল।

ইহার তিন বৎসর পরে মনোরমা এক দিন সন্তানকে সাজাইয়া ভৃত্যের সঙ্গে বাহিরে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া, নিজের দুঃখের কথা ভাবিতেছে। এমন সময় দেখিল এক দরিদ্র রোগগ্রস্থ ভিক্ষুক

তাহার গবাক্ষের নিম্নে ভিক্ষা চাহিতেছে। তাহা দেখিয়া মনোরমার অত্যন্ত কষ্ট হইল, তাহাকে চাউল ডাল পয়সা দান করিল। ভিক্ষুক অনেকক্ষণ মনোরমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল অবশেষে যাইবার পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "ভগবান তোমার সকল দুঃখ দূর করুন।" তাহার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া মনোরমার চক্ষে জল আসিল, সে নিজ দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া যায় সন্তান আর গৃহে ফিরিল না, ভৃত্যকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে দাসীকে তাহাদের অন্বেষণে প্রেরণ করিল। রাত্রি পর্য্যন্ত মনোরমা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। ভগবান কি তাহার অতি আদরের অতি স্নেহের ধনটিকেও একমাত্র সুখের সামগ্রীকে লইবেন এই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মন অস্থির হইতে লাগিল। পরে দেখিল দাসী ও ভৃত্য ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার গৃহাভিমুখে আসিতেছে সঙ্গে সন্তান নাই দেখিয়াই সব বুঝিল। ভৃত্য ও দাসী গৃহে ঢুকিয়া দেখিল মনোরমা মূর্চ্ছিতা, ভূমিতে পড়িয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

পত্র।

(প্রাপ্ত)

অনেক দিনের সাধ একবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হই। কিন্তু সকলেই বাধা দিতে লাগিলেন। এত দিন আমিও তাঁহাদের বাধ্য হইয়া ছিলাম। কিছুদিন হইল প্রাণ আবার তীর্থ যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইল। শ্বাশুড়ী ননদ, জা সকলকে কত কাকুতি মিনতি করিলাম, প্রথমে সকলে উপহাস করিলেন পরে ক্রোধপরবশ হইয়া কুৎসা করিলেন। কেহ কেহ আমার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া বলিলেন, "জানি তুই কোথা যাবি। তীর্থের দোহাই দিয়ে আর কারও কাছে দিন কাটিয়ে আস্‌বি। কিন্তু তা আর পার্‌বি না, একবার যাস্‌ত জন্মের মত যা।" কথা শুনিয়া অবাক হইয়া নিজের ঘরে আসিয়া কাঁদিতে বসিলাম। মনকে ধিক্কার দিলাম যে, সে কেন আমাকে বারবার এমন ব্যাকুল করিয়া তোলে। কিন্তু ধিক্কার দিতে গিয়া আরও ফাঁদে জড়াইয়া পড়িলাম। মন যেন বলিল, "যে সংসারে এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা, যে সংসারে সেবার পরিবর্ত্তে রূঢ়বাক্য কঠিন ব্যবহার, প্রণয়ের প্রতিদানে অবিশ্বাস, অপ্রেম, সেই সংসারের জন্য তীর্থ করিবে না? এ সৌন্দর্য্যময় জগতের কিছু দেখিবে না?" আর পারিলাম না। প্রাণ চঞ্চল হইল। স্বামী আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে যথাসাধ্য সেবা করিয়া তাঁহাকে আহার পান করাইলাম, সন্তানদিগকে আহারাদি করাইয়া শয়ন করাইলাম। পরে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, "আমাকে এবার তীর্থ দেখাইতে পাঠাও" স্বামী আমার এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতে জানিতেন আজ

ইহাতে সেই জন্য কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না। তবে আমার অনেক সানুনয় বিনয়ের ভিক্ষা অগ্রাহ্য করিলেন না। ইহার পূর্ব্বে কেবল আপত্তি করিতেন। স্বামী আমার পরম গুরু, তিনি বিবাহাবধি সযত্নে আদরে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রেম আমি কখনও বুঝিতে পারি নাই, কারণ তাঁহার সন্দেহ, অবিশ্বাস অতি প্রবল। কখনও আমার সাজ সজ্জা তাঁহার ভাল লাগে নাই। একখানা ভাল কাপড় পর্য্যন্ত পরিয়া ঘরের বাহির হই, ইহা স্বামী পছন্দ করিতেন না। বেশী কথা, হাসি একেবারে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতেন, ছোট সমবয়স্কাদিগের কাছে কিছুক্ষণ থাকিলে বারবার ডাকিয়া পাঠাইতেন। নানারূপে বুঝিয়াছিলাম কেমন একটা অবিশ্বাস স্বামীর হৃদয়াকাশে উঠিয়াছে। আমার এ হৃদয় ভেদ করিয়া সে অবিশ্বাস অস্ত্ররূপে আঘাত করিয়াছে। কিন্তু এখন ভাবি স্বামী আমার মঙ্গলের জন্যই সব করিয়াছেন। স্বামীকে ভালবাসা, সন্তানদিগকে স্নেহ, সকলই আমি করিয়াছি দিয়াছি, কিন্তু আমার এ প্রাণটা যেন আরও কিছু চাহিত। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা, দেশ উদ্ধার এ সকল কথা সেরূপ আনন্দ আমাকে কখনও দেয় নাই যে আনন্দ রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধ-চরিত পাঠে দিয়াছে। যেখানে ধর্ম্মালোচনা হয় সেখানে কিছুক্ষণ বসিলে প্রাণে কত আরাম পাইতাম। এই সকল নানা কারণে আমি এবার তীর্থ যাইতে ব্যাকুল। স্বামীর অনুগ্রহে টাকা পাইলাম, দুই একখানা অলঙ্কারও সঙ্গে লইলাম। সঙ্গিনী কয়েকটি মিলিল, সকলের মহা-আনন্দ, "তীর্থে যাইব" ভাবিয়া। নির্দ্দিষ্ট দিনে, যথা সময়ে সকলের নিকট বিদায় লইলাম। স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইলাম, মাথায় হাত দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলাম, সকলের সঙ্গে পারিলাম কিন্তু শিশু সন্তানগুলির কাছ হইতে আসিবার সময় প্রাণটা বড় কাঁদিল। "মা" ব'লে তাহারা যখন কাঁদিল তখন এ প্রাণ অস্থির হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলাম যদি আমি না ফিরি যেন মায়ের মত ছোট ভাই ভগিনীগুলিদের দেখে। কোলের শিশুকে "দাদার কোলে" বসাইয়া চলিয়া আসিলাম।

অনেক তীর্থে গেলাম। পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, নাসিক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেক স্থান ঘুরিয়া হরিদ্বারে আসিলাম সকল সঙ্গিনীরা একে একে গৃহে ফিরিয়াছেন, কেবল একটি মাত্র সঙ্গিনী কাছে। হরিদ্বার হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কত ক্রোশ হাঁটিলাম কত দূর আসিলাম। এখানে রাস্তা নাই দেখিয়া এবং মধ্যে মধ্যে বন্য পশুর ডাক শুনিয়া আমার সঙ্গিনী ফিরিতে অনুরোধ করিলেন আমি কিন্তু একেবারে অনিচ্ছুক সুতরাং আমার সেই একমাত্র দেশের সঙ্গিনীটিও আমাকে ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আমি এখানে তাই একা। কিন্তু সত্য একা নহি। কত সঙ্গিনী, কত সুখে দিবানিশি আছি। আমার সঙ্গিনীটি চলিয়া গেলেন তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। দিনের আলোতে সজোরে উত্তর দিকে চলিলাম। কি সুন্দর প্রকৃতির শোভা। পর্ব্বত শ্রেণী, নির্ঝরিণী পক্ষীদল, পুষ্প সকল হাসিয়া যেন আকুল। কে বলে প্রকৃতি কথা বলে না, নীরবে থাকে আমিত কত কথা শুনিলাম। আবার মধ্যে ব্যাঘ্রের ডাকও শুনিলাম। আমি ক্রমাগত চলিতেছি, ক্রমে পশ্চিমের আকাশ রক্তিম করিয়া সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। নির্ঝরিণী তটে বসিয়া একটি পুরবী সুরে গান করিতেছি এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে যেন পদশব্দ পাইলাম, কেন জানি না, তাকাইয়া দেখিলাম না। ভাবিলাম দস্যু হয় যদি মারিয়া ফেলিবে আর ঋষি হয়ত আশ্রয় দিবেন। আমি না তাকাইয়া আরও গান করিতে লাগিলাম, হঠাৎ দেখি একটি নহে দুইটি নহে দশ বার জন গৈরিক সাড়ি পরিধিতা, লাবণ্যময়ী মুনিপত্নীদল আমার চারি পাশে। আমি দৃশ্য দেখিবামাত্র বোধ করি কিছুকালের জন্য অচেতন হইলাম। কারণ সেই ঋষিপত্নীগণ নিজ হস্তে সেই নদীর শীতল জল আমার চক্ষে বক্ষে দিলেন। কি যে তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি আমি কি বলিতে পারি, না লিখিতে পারি? তাঁহারা আমার চারিধারে বসিলেন আমাকে আবার গান করিতে বলিলেন আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম তাঁহাদের কাছে মুক্ত স্বরে দুই তিনটি গান করিলাম। শেষে তাঁহারা সমস্বরে সকলে মিলিয়া কি মধুর গান আরম্ভ করিলেন। আমি তখন জানিলাম এই পৃথিবীতে এখনও স্বর্গ দেখা যায়, এখনও সীতা, সাবিত্রীর দলের সতীদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহাদের গান শুনিতে শুনিতে আমি সংসারের পৃথিবীর নিজের সকল কথা ভুলিয়া গেলাম, কেমন এক অপূর্ব্ব স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিলাম। স্নানান্তে সকলের চরণ ধূলি লইতে গেলাম সকলেই নিষেধ করিলেন, সুতরাং পবিত্র অঙ্গ তাঁদের স্পর্শ করিতে পেলাম না। সন্ধ্যা হইল; সকলে আরতির সময় বলিয়া উঠিলেন, আমিও উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়াই কি কোন কারণে মনে নাই একজন বলিলেন, "তুমি কোথায় যাবে?" তখন আমি কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া তাঁহাদের আশ্রয়ে রাখিতে ভিক্ষা চাহিলাম। তাঁহারা সম্মত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন। কি দুর্গম পথ। পর্ব্বতের উপর কত যে বৃক্ষ, লতা; শিলার উপর দিয়া গুল্মের ভিতর দিয়া বৃক্ষের শাখা ধরিয়া সেই মুনিপত্নীদল কেমন নিঃশব্দে চলিলেন, আমার যে কত কষ্ট হইতে লাগিল। এক একবার মনে হইল আর বুঝি পারিব না।

(ক্রমশঃ)

সুন্দর জীবন কাহাকে বলে ?

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

আমরা সকলেই এক একটি সুন্দর জীবন লাভ করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু যাহাদিগের মধ্যে এ ইচ্ছা নাই তাহারা ঈশ্বরের উপযুক্ত সন্তান নহে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের আত্মার মধ্যে স্বর্গের গৌরব নিহিত আছে সেই ভাবেই আমাদের জীবন নির্ব্বাহ করা উচিত। আমাদিগের ভিতরে অমরত্বের বীজ আছে এবং যে ব্যক্তি আত্ম জীবন মধ্যে সেই লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য দেখিতে ও জীবনে ধারণ করিতে চেষ্টা না করে সে জীবন মৃতের ন্যায়। সেই জীবন সুন্দর যাহা নিজ জীবনের মহোদ্দেশ্য সাধন করে। "প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ভগবানের অঙ্কিত চিত্র।" এ প্রসিদ্ধ বাক্য অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং যিনি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে পারেন তিনি অতি দীন হীন হউন না কেন তাঁহারই জীবন সৌন্দর্য্যময়; পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য। পাপের যে মূল তাহার অর্থ সেই দেবনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যচ্যুত হওয়া! ভগবানের আদেশ রক্ষা তাঁহার ইচ্ছা পালন, তাঁহার অভিপ্রায় সাধনই জীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য যখন হারাইয়া ফেলি তখনই জীবনের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। লঙ্ঘন বা Transgression এ কথার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল সেই নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করা, ঈশ্বরের নিরূপিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করা। "পাপ" ইহার অর্থও তাহাই অর্থাৎ অনুপযুক্ততা, যাহা সত্যের বিরুদ্ধ সুতরাং কুৎসিৎ। সেই দেব ইচ্ছিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন চিত্র বিনষ্ট করাকেই আমরা অন্যায়, দোষ বলি। যেমন কোন কারীকর যদি গৃহ নির্ম্মাণের জন্য একটি নক্সা অঙ্কিত করে এবং মিস্ত্রী অজ্ঞতা বা অসাবধানতা বশতঃ সেই নক্সার অনুরূপ না করিয়া গৃহটি অন্যভাবে নির্ম্মাণ করে কারীকরের মনের মতও হয় না, এমারৎটি সুন্দরও হয় না, কারণ তাহা তাঁহার অভিপ্রায় মত হইল না; সেইরূপ যে জীবন সেই বিশ্বকর্ম্মার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করে, সে জীবন ক্ষুদ্র হউক বা মহৎ হউক, জানিত হউক বা লুক্কায়িত থাকুক তাহা সুন্দর হইবেই। আমাদিগের খুব বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিবার জন্য বৃহৎ ব্যাপার অন্বেষণ করিতে হইবে না। এ সংসারে প্রত্যেক মানব-জীবনে ভগবানের ইচ্ছা সাধনই সর্ব্বোচ্চ কর্ম্ম এবং তাহাই জীবনের যথার্থ সৌন্দর্য্য। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভাব আছে যাহা কতক পরিমাণে এই জীবন—সৌন্দর্য্যের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারে। তন্মধ্যে একটি Victoriousness বা জয়লাভ। অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের সকল বিষয়ে পরাজিত হওয়া একটা অভ্যাসের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আরম্ভ শৈশবে। পড়া অত্যন্ত কঠিন, বালকের তাহা অভ্যস্থ হইল না, খেলিবার সময় আলস্যতা বশতঃ কিম্বা প্রথম হইতেই "জিতিতে পারিব না" এই আত্মসংশয়ের

জন্য বালক খেলিতে পারিল না। এই রূপে বালিকাগণও ভাল লাগে না বলিয়া পাঠাভ্যাসই হউক বা বাদ্য শিক্ষায় হউক অনেক বিষয় অবহেলা করিয়া নিজের দুর্ব্বলতার নিকটেই পরাস্থ হইতে অভ্যাস করে। বাল্যকালে ক্রোধ ক্ষুধা এ সকল দমন করা কঠিন বোধ হয় সুতরাং বালক সংগ্রামের পরিবর্ত্তে শিথিলতায় আত্মসমর্পণ করেন। অতএব মানব জীবন আরম্ভেই যে যুদ্ধে পরাজিত সেই শিথিলতা দুর্ব্বলতা অনেক সময়ে সমুদায় ভবিষ্যৎ জীবন অধিকার করে। সকল সময়েই তাহার ঐ ওজর "কর্ত্তব্যরাশি অতি বিস্তৃত, পড়া অতি কঠিন, নিয়মাবলী কঠোর, ইন্দ্রিয়াদি অতি প্রবল!" জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাহার দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বল জীবন চতুঃপার্শ্বস্থিত ঘটনাবলীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ও সংগ্রাম করিতে অক্ষম। বাল্যাবস্থা হইতে নিজেকে পরাজিত হইতে দেওয়া এই যে একটি কুঅভ্যাস ইহা বড় অনিষ্টজনক। তাহা হইলে জীবন যেরূপ সুন্দর হইতে পারিত তাহা আর কখনও হইবে না।

অপর দিকে শৈশব হইতেই যদি বালককে অপরাজিত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয় সমুদায়ই অন্যরূপ হয়। পাঠাভ্যাস, ব্যায়াম ইত্যাদি সমুদায় অভ্যস্থ হইয়া যায়, আলস্যতা কোন বাধা দিতে পারে না। এবং পরিশেষে জীবনের দায়িত্ব যখন অধিকতর বৃদ্ধি হয়, নিয়মাবলী কঠিনতর হয়, কত পরিশ্রম বলের প্রয়োজন হয়, সংসারের প্রবল বাত্যা আত্মার শেষ শক্তিবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত যখন আলোড়িত করিয়া জীবনকে পরীক্ষিত করে তখন সেই বাল্যকালের চিরঅভ্যস্থ অপরাজিত থাকিবার যে অভিলাষ তাহাই সেই আন্দোলনের সময় জীবনকে সহায়তা দান করে। মূহুর্ত্তের জন্য সে জীবন আশা ত্যাগ করে না। ভারতের লোকদের মধ্যে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, "যখন কোন মানব শত্রু বিনাশ করে সেই নিহত শত্রুর বল তাহার বাহু মধ্যে প্রবেশ করে।" ঐ কাল্পনিক প্রবাদের মধ্যেও আমরা একটি সত্য দেখিতে পাই। জীবন সংগ্রামে প্রতিবার পরাজয় আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়; কিন্তু প্রতিবার জয়লাভে আমাদিগের বল বৃদ্ধি হয়।

প্রলোভনে যে আত্মা প্রলুব্ধ, কর্ত্তব্য, পরীক্ষা ও দুঃখভার বহনে যে আত্মা পরাজিত তাহার ন্যায় অপদার্থ ও দুঃখময় জীবন কি আর আছে? কিন্তু পরাজয় করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে সকল সময়েই আছে। স্থির ভাবে বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া থাকিলে আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সহজে সম্পাদন করিতে পারি। প্রলোভনের সহিত যুদ্ধকালে নিজেকে পবিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারিলে অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারিব। আমাদিগের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের এরূপ আত্ম সম্বন্ধ সংস্থাপন করিব যে সকল অবস্থায় আমরাই প্রভু হইব, অধীন হইব না।

তখন বিঘ্ন বাধা গুলিও আমাদিগের

সহায় হইবে যদ্বারা ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় লাভ করিব। মানবজীবন পরাজিত ভগ্ন প্রাণকেই কেবল পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখে। পিঞ্জর মধ্যে বসিয়া যে পক্ষী সর্ব্বক্ষণ গান করে সে বন্দী নহে। ভগবান তাঁহার সন্তানদিগকে এমন অবস্থার কখনও ফেলেন না যে তাহারা সর্ব্বক্ষণ বিজয়ী হইয়া সুন্দর ভাবে জীবন পরিচালনা করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন আমরা সকল সময় সেই প্রেমময় ঈশ্বর যিনি আমাদিগকে এত স্নেহ করেন তাঁর প্রভাবে সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিব।

দুঃখকেও আমরা পরাজয় করিতে পারি। তাহা যদি না পারিত আমরা ভগবানের উপযুক্ত সন্তান নহি। আমরা যদি দুঃখে মুহ্যমান হইয়া তাহাতেই একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ি কোনরূপ শান্তি পাবার জন্যও চেষ্টা না করি তো তাহা আমাদেরই অন্যায়; যদি আমরা দুঃখ পরীক্ষার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হই এবং তাহা বহনে অসমর্থ হই তবে তাহা আমাদিগকে আরও দুঃখ দিবে। কিন্তু পরীক্ষা জয় করিতে পারি ও দুঃখের মধ্যেও শান্তি পাই যদি আমরা দুঃখ আসিলে বলের সহিত তাহা ধারণ ও সহ্য করিতে সমর্থ হই। পরীক্ষার ভার বহন করিতে পারিলে তাহা যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে শান্তি আনয়ন করিয়া দেয়। দুঃখকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

" Look thou beyond the evening sky,
she said,
' Beyond the changing splendours of
the day ;
Accept the pain, the weariness, the
dread—
Accept and bid me stay.'

I turned and clasped her close with
sudden strength ;
And slowly, sweetly, I became aware
Within my arms God's angel stood
at length,
White-robed and calm and fair.

' And now I look beyond the even-
ing star,
Beyond the changing splendour of
the day ;
Knowing the pain He sends more
precious far,
More beautiful than they ! "

সেই জন্য পুনরায় বলিতেছি "জয়ী" হইতে শিক্ষা করাই জীবনের সৌন্দর্য্যের একটি গূঢ় তত্ত্ব। ইহা সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব স্থানে আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া রক্ষা করে। যে অবস্থাই আসুক না কেন আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। কোন বস্তুই আমাদিগকে আঘাত করিতে পারিবে না বরঞ্চ সকলেই আমাদিগের সহায়তা করিবে।

জীবনের সাধারণ বিপক্ষ ঘটনাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটি সোপান নির্ম্মাণ করে, সেই সোপানের এক একটি পদ আরোহণ পূর্ব্বক আমরা স্বর্গধামের নিকটবর্ত্তী হই। ভক্তগণ তাঁদের জীবনে চিরজয়ী হইয়া গিয়াছেন আমরা যদি তাঁহাদের প্রদর্শিত পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারি আমরাও জয়ী হইব।

কার্য্যালয় ও বিশ্রামালয়।

সংসারের চারিদিকেই কোলাহল, জনরব—চারিদিকেই কার্য্যের ব্যস্ততা। কার্য্যের এ বিপুল সমষ্টি মাঝে—সকলেরই কিছু কিছু অংশ আছে। কেহ গৃহকার্য্যে, কেহ স্বদেশ পরিচর্য্যায়, কেহ বাণিজ্যে কেহ বা ধর্ম্ম প্রচারে, কেহ কেবল স্বার্থ সাধনে, কেহ বা পরার্থপরতায় ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য লইয়া অসংখ্য নর নারী মত্ত। হাটে মাঠে, পথে ঘাটে সকলেই এই এক মহামন্ত্র জপ করিতেছে। কিন্তু সকলের কার্য্যপ্রণালী এক নহে; উদ্দেশ্য এক হইলেও পন্থা নানাবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে কার্য্যস্রোত দেখিলে মনে হয়, ইহার বুঝি আর অন্ত নাই, বিরাম নাই। অবিশ্রান্ত সকলে পরিশ্রম করিতেছে! তাহাদের কি শ্রান্তি নাই? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র দিন হইতে বর্ষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যস্রোতে সকলে ভাসিতেছে। এ স্রোতের গতি রোধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। ক্ষুদ্র মহৎ বা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল জীবন এই অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে। একদিন এই কার্য্যস্রোত থামিলেই মৃত্যু। কোথায় আহার—কোথায় সাজ সজ্জা, কোথায় সুখ—কোথায় আরাম? জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারই কি অসংখ্য লোকের সমবেত সাহায্যে ঘটে না? আমার আহারের জন্য কত লোকের খাটিতে হইতেছে, আমার বেশ ভূষার জন্যও কত লোক পরিশ্রম করিতেছে। জীবনের প্রত্যেক সুখের জন্য আমরা সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকটে ঋণী। আমরা যেমন এত উপকার পাইতেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এই ঋণ পরিশোধের জন্য যাহার যতটুকু কাজ দিবার আছে তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে দান করা। সময় অমূল্য, এ অমূল্য সময় বৃথা যাপন না করিয়া যদি কার্য্যে অতিবাহিত করি তবে নিজে উপকার পাই, অন্যেরও উপকার করিতে পারি। যে পরিশ্রম করে সে আলস্যকে ঘৃণা করে। কার্য্যই তাহার সুখ, কার্য্যেতেই সে আনন্দ লাভ করে।

বিশ্রামালয়, আনন্দালয়, সুখালয়। কৃষক সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর নিজের পর্ণকুটীরের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া যে কত সুখ পায় তাহা আমরা কি বুঝিব? বালক ছুটির সময় যখন গৃহে আসিয়া মাতার হাতে আহার করে তখন তাহার আর আনন্দ ধরে না। পরিশ্রম না করিলে বিশ্রাম লাভের অধিকার জন্মে না। কার্য্য না করিলে কেহ বিশ্রামের মর্য্যাদাও বুঝিতে পারে না। পরিশ্রমী ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া যখন তাহার কঠোর সাধনের পুরস্কার স্বরূপ দিনান্তে আহার করে, শয্যায় শয়ন করিয়া আরাম লাভ করে, তখন আনন্দে সে সকল ক্লান্তি ভুলিয়া যায়। পরদিনে আবার নব উৎসাহে

স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। বিশ্রাম পরিশ্রমের পুরস্কার। না খাটিয়া বিশ্রাম লাভের আশা করা উচিত নহে। আমরা প্রত্যেকেই কোন কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। সে কার্য্য সাধন না করিলে আমরা পরিণামে স্বধামে বিশ্রাম-পুরস্কার লাভ করিতে পারিব না। এ জীবনের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ধরাধাম হইতে ছুটি পাইয়া—সেই জগজ্জননীর কাছে চলিয়া যাইব, আনন্দময়ী মা নিজহাতে প্রেমের অন্ন মুখে তুলিয়া দিবেন। তাঁহারি শান্তিপ্রদ চরণে মাথা রাখিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিব।

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

9th February.

Help me dear Saviour to make Thee the only object of my affection, the ever-shining and beloved necklace of my heart.

৯ই ফেব্রুয়ারী।

দয়া কর জগদীশ, দয়া কর মোরে,
তুমি মোর একমাত্র সার।
হৃদয়ের মাঝে মোর মনের মন্দিরে
তিল মাত্র স্থান নাই আর।
তোমারে স্থাপিয়া চিত্তে, নিখিল দেবতা
দিবানিশি পূজিব চরণ,
কণ্ঠের মালিকা দলে, তুমি যে মুকুতা
তোমারে করিব আভরণ।
সেই কণ্ঠহার, শুধু জ্যোতি রাশি ভরা
হৃদয়ে করিবে ঝলমল,
ওই জ্যোতি সুধা পিয়ে আমি আত্মহারা
তোমাতেই রহিব বিভল।

10th February.

Association which makes dissociation an impossibility is the height of yoga communion.

১০ই ফেব্রুয়ারী।

জানিনাক যোগধর্ম্ম, কি মর্ম্ম তাহার,
আমি শুধু দিবানিশি ডাকি।
জানি না পূজিতে বিভূ, কামনা আমার
তোমাতেই মিলাইয়া থাকি।
সুখে হোক, দুঃখে হোক নিখিল দেবতা
কভু যেন টলে না চরণ।
আকুল মর্ম্মের কাছে, যে আকুল ব্যথা
সেখানেই তোমার আসন।
আমি জানি দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু নাম
দুঃখীদের জুড়াবার স্থান,
তুমি তাহাদের শুধু আনন্দ আরাম
তোমাতেই মগ্ন থাক প্রাণ।

11th February.

From unsteadiness set me free O my God chameleon-like I have changed my colors often and often.

১১ই ফেব্রুয়ারী।

প্রতি পদে কেন কাঁপে চরণ যুগল,
এ চঞ্চল হিয়া নাথ হোক অচঞ্চল।
প্রত্যেক প্রহরে যেন বহুরূপী সম,
হৃদয়ের ভাব রাশি নাহি হয় মম।

হোক স্থির দৃঢ় মন সক্ষম সবল,
হৃদয়ে ভক্তির আলো থাকুক উজ্জ্বল।
শেষ মুহূর্ত্তেও যেন জীবনের তীরে,
প্রতি কাজে দৃষ্টি রাখি চলে যাই ধীরে।
তোমাতে মিলিয়া যাক জীবনের সুর,
তোমাতেই পূর্ণ থাক হৃদি অন্তঃপুর।

12th February.

God consciousness becomes so overpowering at last that man lives perpetually in the presence of his Father and finds it absolutaly impossible to tear himself away from it.

১২ই ফেব্রুয়ারী।

পুণ্যময় প্রেমময় সত্ত্বা যে তোমার,
ছাইয়া দিয়াছে এই জীবনের কূল।
কে বুঝে অসীম লীলা, মহিমা অপার,
কে বুঝে উহাতে কত রহস্য বিপুল।
তোমারি মহিমা দিয়ে গড়েছ যতনে,
তোমার স্নেহের যত অজ্ঞান সন্তান।
যদিও কুহক জাল ছেয়েছে নয়নে
যদিও ভুলিতে শুধু আচ্ছন্ন পরাণ।
তবু তুমি তার মাঝে সর্ব্বদা জাগিয়া
রবির কিরণ যেন কুয়াসার মাঝে,
দীপ্ত শশধর আভা হিমাণী ভেদিয়া
তেমনি তোমার জ্যোতি এ হৃদয় রাজে।
দয়াময় জগদীশ তুমি প্রেমময়,
আমিত ভুলিতে পারি ভুলে না হৃদয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

Switzerlandএ যে মোরাট নামক হ্রদ আছে উহা প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার করিয়া বর্ণ পরিবর্ত্তন করে এবং লোহিত বর্ণ ধারণ করে।

New Guineaতে এক জাতীয় বিষাক্ত পক্ষী আছে উহাদের "Bird of Death" বলে। উহার দংশনে শরীর মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ও অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়।

১৮১০ খৃঃ Port Louisএ যে একটি সুবৃহৎ কচ্ছপ আবিষ্কৃত হয় তাহা এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে। ইহার বয়স প্রায় দুই শত বৎসর কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অনায়াসে উহা পৃষ্ঠদেশে দুইটি লোকের ভার বহন করিতে পারে।

ডার্বিসায়ারে কোন এক পরিবারে একখানি রুটি আছে তাহা ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে King Johnএর রাজত্বকালে উক্ত পরিবারকে একখণ্ড জমী সহ প্রদত্ত হইয়াছিল; সেই সময় হইতে উক্ত পরিবার বংশাবলী সযত্নে উহা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

South Sea দ্বীপপুঞ্জবাসীগণ এক প্রকার বৃক্ষের শাখা দ্বারা মৎস্য ধরে। তাহারা ঐ শাখা খণ্ড জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখে আর অল্প সময়ের মধ্যে মৎস্য সকল এক প্রকার অচেতন ও বিঘোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হয় ও সহজে হস্ত দ্বারা ধরিয়া লওয়া যায়।

সংবাদ।

আমাদের সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী আয়র্লণ্ড দ্বীপ দর্শনে গিয়াছেন। সেখানে একদিন আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড ডাফরিনের বিধবা লেডি ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

আমাদের সম্রাটের কনিষ্ঠা কন্যা মড্ অর্থাৎ ডেনমার্কের প্রিন্সেস্ চার্লসের

এত দিন পরে একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে ও সেই জন্য শিশুর পিতা মাতা অত্যন্ত আনন্দিত, এবং সম্রাট সম্রাজ্ঞী অতি সুখী। এই শিশু পুত্র তাঁহাদের প্রথম দৌহিত্র।

এরূপ জনরব, জাপানের সহিত রুসিয়ার যুদ্ধ হইবে। এ শতাব্দীতে এত রক্তপাত মানব জীবনের শোনিত তৃষ্ণা কেন হইল? কবে এ সকল বন্ধ হইবে, সকলের হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ আসিবে! এবার যেন যুদ্ধ পিপাসা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে আসিয়াছে, কত বৎসর হইতে এই যুদ্ধ চলিতেছে।

সম্প্রতি ফরাসী দেশের প্রেসিডেণ্ট লুবাট সাহেব বিলাত গমন করিয়াছে। আমাদ্রের সম্রাট এবং যুবরাজ তাঁহাকে যথোচিত আদর সম্মান দিয়াছেন। লণ্ডনে সেই উপলক্ষে, কত আমোদ, প্রমোদ, নৃত্য, গীত হইল। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট বাহাদুর লাট ল্যান্সডাউন সাহেবের গৃহে সন্ধ্যাভোজন হইয়াছে।

বিলাতে সম্প্রতি এক ভয়ঙ্কর হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। এক অবিবাহিতা ধনী সম্পত্তিশালিনী বৃদ্ধা ছিল, তাহার ডুগল নামে এক এজেণ্ট ছিল, আজ চারি বৎসর হইল সেই সম্পত্তি অধিকারিণী মিস্ হলণ্ড বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল, এবং এজেণ্ট ডুগল পূর্ব্ববৎ সমুদয় জমীদারী প্রভৃতির কাজ দেখিত ও করিত। মিস্ হলণ্ড তাহার এজেণ্টকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত, সমস্ত কাজ কর্ম্ম তাহারই হাতে থাকিত। চারি বৎসর ডুগল সেই মিস্ হলণ্ডের নামে টাকা লইত, ব্যয় করিত। হঠাৎ সাধারণের সন্দেহ হইল এবং মিস্ হলণ্ডের কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। জিজ্ঞাসা করিলে ডুগল দেশ, বিদেশের নাম করিয়া বলিত সেইখানে ধনী কুমারী আছে। চারি বৎসর পরে টাকার জন্য গোল হওয়াতে পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ করিল এবং জানিতে পারিল মিস্ হলণ্ড বিদেশে কোথাও নাই। তাহাকে বোধ হয় কেহ হত্যা করিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত ঘর দ্বার পরীক্ষা হইল এবং বাগানে একটি নালা ছিল সেই নালার তীরে খনন করিতে করিতে সেই বহু অর্থশালিনী হতভাগিনী কুমারীর দেহাবশিষ্ট পাওয়া গেল। শেষে বিচারালয়ে ডুগলকে লইয়া গেল। চারি বৎসর পুর্ব্বে এজেণ্ট এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড করিয়া নির্ভয়ে এত দিন মিস্ হলণ্ডের ধন, সম্পদ সম্ভোগ করিয়াছিল। বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। আজ কয় সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। পাপের শাস্তি পাইবেই পাইবে। এমন ভয়ানক পাপ করিয়া লুকাইবে, কি সাধ্য!

স্বর্ণরেণু।

ইচ্ছা করিয়া আপনার মানহানি করে কে? যে দাসীর সঙ্গে কলহ করে।

বিধবার পক্ষে কি উচিত? ব্রহ্মচর্য্য ও পরসেবা। কুমারীর পক্ষে কি উচিত? দেবসেবা ও আত্মশুদ্ধি।

ভাল কার্য্যে ভয় করিও না। ভয়ে পাপ কার্য্যে সায় দিয়া অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বাহ্যিক অবস্থাতে সুখ দুঃখ নাই। সুখ দুঃখ মনে। কেহ বৈকুণ্ঠে নরক দেখে, কেহ নরকে বৈকুণ্ঠ দেখে।

---

২৬ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩১০। [৫ম সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. SEPTEMBER, 1903. No. 5.

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।	বিষয়।		পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	৯৭	দুইটি বোঝা	...	১১০
অতিথি সেবা	...	৯৭	ঈশ্বরোদ্দেশে	...	১১২
স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারী-চরিত্র	...	৯৮	কি সুন্দর	...	১১৩
অতীত	...	৯৯	পদ্য	...	১১৪
মানিক লালের উপন্যাস লেখা ও সম্পাদকের মত		১০০	মহাত্মা শাক্যসিংহ	...	১১৫
শূন্য আসন	...	১০৩	আশা	...	১১৬
গল্প	...	১০৭	পাক বিধি	...	১১৮
			সংবাদ	...	১১৯
			স্বর্ণরেণু	...	১২০

কলিকাতা,

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga: Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays: Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

	মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯ ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০ ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১ ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২ ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪ জীবনবেদ ...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৶
২৭ ঐ ২য় ভাগ ...	।৶
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১৷
২৯ সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১৷
৩০ ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১ ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২ ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩ নবসংহিতা ...	৷৶
৩৪ মাঘোৎসব ...	৷৶
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	৷৶
৩৬ ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৶
৩৭ ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৶
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	৷৶
৩৯ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৶
৪০ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৶
৪১ ঐ ৪র্থ ভাগ ...	৷৶
৪২ ঐ ৫ম ভাগ ...	৷৶
৪৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	৷৶
৪৪ ঐ ৭ম ভাগ ...	৷৶
৪৫ ঐ ৮ম ভাগ ...	।৵০
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৵০
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	৷৶
৪৮ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৶
৪৯ প্রেম কুসুম ...	৷৶
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵৷
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৵০
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵০
৫৩ সুখী পরিবার ...	৵০
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৲০
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৲০
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৲০
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৲০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.

few slightly soiled books can be had, for a few days only, at Half Price. For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা ভাদ্র ১৩১০, সেপ্টেম্বর ১৯০৩ [৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ডালিয়া ফুল সর্ব্বপ্রথম ১৭৮৯ মেক্সিকো হইতে ইয়ুরোপে আনীত হয়।

Somalilandএ স্বামীগণ বিবাহের পর পনের দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীকে শাসনাধীনে রাখিবার জন্য চাবুক হস্তে বেড়ান!

আপেল বৃক্ষের একখানি পত্রে প্রায় এক লক্ষটি ছিদ্র দেখিতে যায়। তদ্বারা উহারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে।

জার্ম্মানিতে এক প্রকার পোষ্ট কার্ড প্রস্তুত হইতেছে তাহা হস্ত দ্বারা উঠাইলে বা নামাইলে তাহা হইতে পাখীর শিশের ন্যায় শব্দ বাহির হয়।

Encyclopædia Britanica নামক নূতন সুবৃহৎ অভিধান এক প্রকাণ্ড ব্যাপার ইহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু চীন দেশীয় Cyclopædia দেখিলে বাস্তবিক অবাক হইতে হয়। ইহা পাঁচ সহস্রখানি পুস্তকে বিভক্ত!

আরব জাতিদিগের বিশ্বাস সারস পক্ষীর মধ্যে মানবের হৃদয় বর্ত্তমান। সে জন্য যদি কোন গৃহের ছাদে সারস পক্ষী বাসা করে তাহারা বলে সে বৎসরের জন্য সে গৃহস্থ নিরাপদ হইল, তাহাদের কোন অমঙ্গল হইবে না।

ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আগ্নেয় গিরি Sandwich Islandএর manna Loa। ইহার Crater বা মুখের পরিধি প্রায় ২০ মাইল এবং যে ধাতু বিনির্গত হয় তাহা ৫০ মাইল ব্যাপী ও কোন কোন স্থানে প্রায় চার মাইল প্রশস্ত।

অতিথি সেবা।

মনু গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিথি সেবা একটি। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথি সেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর সম্পূর্ণ ভার। গৃহিণী যদি সুন্দররূপে অতিথি সেবা করিতে পারিলেন, সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থ

মহিলারা প্রাণপণে অতিথি সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্ব্বাসা বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারী-চরিত্র।

স্ত্রীলোক স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসৎকার, দেবপূজা ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার বিধি ছিল না, স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা, দয়ালু, গুরুজনে ভক্তিমতী, পুত্রাদিতে স্নেহশালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধান ও পূজণীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বর পরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোনরূপ সাহসকর্ম্ম স্ত্রীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামী পুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্য্যায়ের শব্দ।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দানুবর্ত্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভালবাসিতেন। ঋষিপত্নীরাও সর্ব্বদা আপন শরীর, গৃহদ্বার ও তৈজষপত্র পরিষ্কার রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচিগৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সাম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা মাতা, স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামীর ও স্ত্রীর ঐক্যমত অতীব প্রয়োজনীয়। যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন তাহা হইলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহা এ দেশীয় কাহারও অবিদিত নাই। এজন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা, গৃহকার্য্যে তৎপরা, পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য বশীভূত হইলেন তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সৎস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "সদ্ব্যবহার দ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে, যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে?" "কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিতকর্ম্মে তৎপরা হইবেন, দাসীর ন্যায় আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হইবেন।" কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য, সেটি তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহবিরতাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাস ভূমি।

অতীত।

অতীতের কথা কত আজি মনে আসে
উদাস আকুল এই বাদল বাতাসে।
বরষার অশ্রুজলে,
ফুটে উঠে দলে দলে,
বেল যুঁই মুগ্ধ হিয়া সে সুরভি শ্বাসে।

খর রবিতাপে দগ্ধ ধরণীর হিয়া
স্নিগ্ধ বরষার ধারে উঠে বিকশিয়া।
যেন অমৃতের ধারা
মৃত সঞ্জীবনী পারা
নব প্রাণ মৃত দেহে দিলরে আনিয়া।

সহসা আজিকে মোর এই শুষ্ক প্রাণে
কে জাগায়ে দিল পুনঃ বিস্মৃত স্বপনে।
যেন রে হৃদয় কুঞ্জে
ফুটিতেছে পুঞ্জে পুঞ্জে
সুরভি কুসুম রাশি মদির পবনে।

অতীতের শত কথা জাগিছে হিয়ায়
বরষার বারিধারে এ উদাসী বায়।
চাহি কুসুমের পানে
কার কথা পড়ে মনে,
সে যে কোন দূর দেশে রয়েছে কোথায়!

চির পুরাতন তবু নিত্যই নবীন,
এই চির প্রেম কভু হবে না বিলীন।
সুরভি সমীর বুকে
তেমনি জাগিয়া সুখে
অনন্ত অমৃতধারা ঢালে নিশি দিন।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

মানিক লালের উপন্যাস লেখা ও সম্পাদকের মত।

মানিক লাল বহুদিন অবধি সাহিত্য চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিল। যখন থার্ড ক্লাসে পড়ে তখনই পর্ব্বত, নদী, কোকিল, গোলাপ, আকাশ ইত্যাদি বিষয় কবিতা লিখিয়া সহপাঠি বালকদের আনন্দিত ও মুগ্ধ করিত। যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে প্রমোসন পাইল তখন মানিক হঠাৎ পদ্য ছাড়িয়া গদ্য ধরিল। ভাবপূর্ণ চিন্তাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ লিখিল এবং সহপাঠি ও বন্ধুদের মানসিক উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে দয়া, প্রফুল্লতা, বঙ্গদেশের দুরবস্থা, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইত। মানিকের ভগ্নীপতি সতীশ বাবু একজন সুলেখক। তিনি দুই চারি খানা উপন্যাস লিখিয়াছেন, সর্ব্বদা বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন, সাহিত্য সমাজে তাঁহার বেশ নাম ও সম্মান।

মানিকেরও ক্রমে তাঁহার মত হইবার ইচ্ছা হইল। গোপনে ছোট ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করিল। শেষে একটি ছোট উপন্যাস লিখিতে বসিল। একদিন একটি মোটা খাতা লইয়া সতীশ বাবুর নিকট গিয়া তাহার মনের কথা বলিল। তাহার ইচ্ছা যে এই উপন্যাসটি মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। "উপন্যাস প্রকাশিকার" সম্পাদকের সহিত সতীশের বিশেষ বন্ধুত্ব, মানিক লাল জিদ্ ধরিয়া বসিল যে উক্ত সম্পাদকের নিকট মানিকের কপিটা দেওয়া হয়। সতীশ বাবু বৃহদাকার খাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মানিক, তুমি ছেলে মানুষ, তোমার গল্প বোধ হয় গৃহিত হইবে না। তুমি এখন লিখিতে অভ্যাস কর, ভবিষ্যতে তোমার লেখা বাহির হইতে পারে।" কিন্তু মানিক ছাড়িল না। বলিল, "আচ্ছা নাই বা গৃহিত হইল, আপনি একবার তাঁহাকে পড়িয়া দেখিতে বলিবেন।"

সতীশ অবশেষে কপিখানা লইল। তিন মাস কাটিয়া গেল তবুও মানিকের "মৃগলোচনার গুপ্ত কথা" বাহির হইল না। প্রতি মাসে মানিক আশাপূর্ণ হৃদয়ে কম্পিত হস্তে পত্রিকা খুলিয়া দেখে কিন্তু প্রতিবার নিরাশ হয়। শেষে মানিকের আর ধৈর্য্য রহিল না, স্থির করিল, "উপন্যাস প্রকাশিকার" সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। একদিন মানিক লাল উক্ত পত্রিকার অফিষে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সতীশ বাবুর নাম করিয়া নিজের পরিচয় দিল। সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, "ওঃ বুঝেছি। মাস দুই হলো সতীশ একটা কপি দিয়া গিয়াছিল। তুমি কি "হরিণ চক্ষুর গুপ্ত কথা" লিখিয়াছ?"

"হ্যাঁ। হরিণ চক্ষু নয় মশায়, "মৃগলোচনার গুপ্ত কথা" গল্পটির নাম।" মানিক "মৃগলোচনা" খুব লম্বা টান্ দিয়া স্বদর্পে উচ্চারণ করিল।

"ও, তা, ঐ একই কথা। আমি তোমার গল্প পড়িয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিব না।" সম্পাদক টেবিলের একটি দেরাজ খুলিয়া মানিকের সেই বহু যত্নে লিখিত মোটা খাতাখানা বাহির করিয়া হাতে লইয়া বলিলেন, "আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে যাহাদের লেখা গৃহিত হয় না তাহা ফেরত দেওয়া হয় না। কিন্তু তোমার এ গল্পটি নূতন ধরনের অসাধারণ ঘটনায় পরিপূর্ণ, তাই তোমাকে দেখাইবার জন্য ও তোমার নিজের দেখিবার জন্য রাখিয়াছি। যদি তোমার গল্প বাহির করি তাহা হইলে আমার কাগজের খুব নাম হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু অত নামে আমার প্রয়োজন নাই।" সম্পাদক মহাশয় কপিখানা খুলিয়া উল্টাইয়া বলিলেন, "এই মনে কর, তুমি প্রথম পরিচ্ছেদে মৃগলোচনার রূপ বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছ যে, "রাজকুমারীর রূপ পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, যাহাতে পড়ে তাহা ঝল্‌সিয়া জ্বলিয়া যায়" তাহার দুই লাইন পরেই লেখা আছে যে তাহার রূপ "জ্যোস্নালোকের ন্যায় সুমধুর স্নিগ্ধ যাহাতে পড়ে তাহা সুশীতল করে।" যদি তাহার রূপ স্নিগ্ধ শীতল তাহা হইলে আবার সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কেমন করিয়া হইবে? তবে যদি বলিতে চাও যে তাহার অর্দ্ধেক শরীর ঠাণ্ডা ও অর্দ্ধেক গরম, অর্দ্ধেক চন্দ্রের মত, অর্দ্ধেক সূর্য্যের মত, তাহা হইলে লোকে——"

"মশায়, উহা একটা সামান্য ভুল হইয়া গিয়াছে, সহজেই শুধরাইয়া লইব।"

"তার পর আবার এইখানে দেখ। প্রথমে যখন নায়ক যুবরাজ কুমার আজানুলম্বিত বাহু তোমার উপন্যাসে দেখা দেয়, তখন সে যবন সেনা সেলিম খাঁর সহিত ঘোর যুদ্ধে নিযুক্ত এবং যবন সেনা যুবরাজের একটি আজানুলম্বিত বাহু একেবারে তরবারি দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার পরেই বলিতেছ যে যুবরাজ আজানুলম্বিত বাহু সেলিম খাঁকে পরাজয় করিয়া নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া রাজকুমারী মৃগলোচনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পরের পৃষ্ঠাই লেখা আছে "যুবরাজ দুই বাহু দ্বারা মূর্চ্ছিতা রাজকুমারীকে উঠাইয়া বসাইলেন।" এখন ভাবিয়া দেখ যে তাহার আর এক বাহু কোথায় পাইবে? কোন রকমে বেচারাকে এক বাহু দ্বারাই কাজ চালাইতে হইবে। যদি বলিতে চাও, যে বাহুর কাটা স্থান হইতে গাছের ডালের মত আর একটা আজানুলম্বিত বাহু গজাইয়া বাহির হইয়াছিল তা হলে লোকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিবে না।" সম্পাদক মহাশয় রুমাল দিয়া মুখ মুছিলেন।

মানিক লাল একটু গলা পরিস্কার করিয়া কাশিয়া কহিল, "ওঃ বাহুটার কথা শেষে মনে ছিল না। তা——"

"আচ্ছা যাক। তার পর এখানে দেখ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তুমি বলিতেছ যে "মৃগলোচনার সজল মৃগলোচন হইতে বিগলিত ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল ও উজ্জ্বল নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া যবন সেনাকে যেন ভস্মিভূত করিয়া ফেলিল।" এখন রাজকুমারীর চোখ হইতে যদি এত জল বাহির হইতেছিল তবে আবার ঠিক সে সময় আগুন কি করিয়া বাহির হইবে, নিশ্চয় নিভিয়া যাইবে,—কিম্বা আগুন বেশী বাহির হইলে জলটা নিশ্চয় শুকাইয়া যাইবে বা বাষ্প হইয়া যাইবে। তবে কেহ মনে করিতে পারে যে একটা নয়ন জলপূর্ণ, অন্যটি অগ্নিপূর্ণ কিন্তু ইহা আবার বিজ্ঞান ও সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ। যে রমণীর অর্দ্ধেক দেহ সূর্য্যের মত, অর্দ্ধেক চন্দ্রের মত, এক চক্ষু জলভরা আর একটা আগুনভরা, সে রমণীর উপযুক্ত স্থান কোন এগ্‌জিবিসনে (Exhibition), উপন্যাসে বা পত্রিকায় নহে।" সম্পাদক মহাশয় নিশ্বাস লইবার নিমিত্ত একটু থামিলেন।

মানিক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটু একটু ঠিক করিয়া লইতে হইবে।"

"আচ্ছা এ ত গেল। এখন দেখ, একাদশ পরিচ্ছেদে তুমি সকলকে শোক সংবাদ দাও যে হরিণাক্ষী—না—মৃগলোচনার জননী, রাণী বিজয়ার মৃত্যু হইয়াছে, আর এত দুঃখ প্রকাশ কর, মৃগলোচনাকে এত কাঁদাও কাটাও, যে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে যায় যে উক্ত রাণী নিশ্চয় যমালয় গমন করিয়াছেন। কিন্তু ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে তুমি অম্লান বদনে বলিতেছ, "রাণী বিজয়া আনন্দিত চিত্তে প্রিয়তমা কন্যার বিবাহের আয়োজনে উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন।" আর দেখিতেছি ইহার পর হইতে শেষ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিজয়া রাণী কাঙ্গারুর (Kangaroo) মত এখান থেকে ওখানে উপন্যাসময় লাফাইয়া বেড়াইতেছেন। দেখ মানিক লাল লোকে এ রকম গল্প হজম করিতে পারিবে না—মাথাও গরম হইবে, মেজাজও গরম হইবে।"

"ওঃ তাই ত, রাণীকে তখন মেরে ফেলাটা ঠিক হয় নাই।"

"তা মেরে ফেলেছিলে তাতে কাহারও দুঃখ নাই, কিন্তু আবার বাঁচালে কেন? এখন আর এক কথা দেখ। তুমি এই পরিচ্ছেদে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড কর। বিবাহের রাত্রে যবন সেনা সেলিম খাঁ আসিয়া নবদম্পতি মৃগলোচনা ও অজানুলম্বিত বাহুকে গোপনে হত্যা করে ও নিজে আত্মহত্যা করে। কিন্তু আশ্চর্য্য! তাহার পরেই রাজকুমারী ও যুবরাজ নদীতীরে জ্যোছনা রাত্রে বেড়াতে যায়, কত প্রেমালাপ, প্রণয় কথা, ঢলাঢলি গলাগলি হয়। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য কথা, কয়েক পাতা পরে লেখা আছে যবন সেনা সেলিম খাঁ আর কেহ নহে মৃগলোচনার নিরুদ্দেশ পিতা রাজা গোবিন্দ সিংহ ছদ্মবেশে! কিন্তু এখানেও তোমার গল্প লিখিবার শক্তির কসুর

হয় নাই বা বন্ধ হয় নাই। তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে সর্ব্বশেষে সকলকে জানাইতেছ যে মৃগলোচনা মোটেই মেয়ে মানুষ নয় ছদ্মবেশী যুবা পুরুষ এবং আজানুলম্বিত বাহুর নিরুদ্দেশ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিংহবাহু! আর তৎক্ষণাৎ আবার মৃগলোচনার সহিত দ্বিতীয় বার আজানুলম্বিত বাহুর মহাসমারোহে বিবাহ দিয়া ফেলিয়া তোমার উপন্যাসটি শেষ কর। উঃ!"

মানিক আস্তে আস্তে কহিল, "হ্যাঁ এখানটা একটু যেন গোলমাল আছে মনে হচ্ছে—যদি——"

"একটু গোলমাল! উঃ, না, না, তোমার এ গল্প কোন মতে গ্রহণ করিতে পারিব না। উঃ" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া সম্পাদক মহাশয় ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চোখ বুজিলেন।

এবার মানিকলাল বিনা বাক্যে খাতা হাতে লইয়া প্রস্থান করিল। এখনও মানিক উপন্যাস লেখে কি না জানি না।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

শূন্য আসন।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ বাবুর গৃহে আজ বহুদিন পরে হাস্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। শ্যামাচরণ বাবুর সংসারে কেহই ছিল না। তিনি আজীবন বিদ্যাশিক্ষা দান করিয়া ছাত্র প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। আজ দশ বৎসর তাহাও বন্ধ আছে। কিন্তু শ্যামাচরণ বাবুর সর্ব্বদা প্রফুল্ল উৎসাহোদ্দীপ্ত মুখ দেখিলে কেহই বলিত না যে সংসারে তাঁহার কেহ নাই বা এরূপ একা থাকাতে তাঁহার কোন বিশেষ কষ্ট আছে। তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে। শুভ্র কেশ, সুগম্ভীর অথচ প্রফুল্ল ভাব, সমুন্নত দেহ, সৌম্যমূর্ত্তি; সর্ব্বত্রই শ্যামাচরণ বাবুকে ভক্তি মান্য দিত। দশ বৎসর যদিও তিনি আর কার্য্য করেন না, কিন্তু কি একটা আশা যেন এতদিন তাঁহাকে উৎসাহিত রাখিয়াছিল। যে গৃহ এই সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল, নীরব নিস্তব্ধ ছিল আজ সে গৃহ আলোকমালায় প্রদীপ্ত, হাস্যকলরবে পরিপূর্ণ। ইহার অর্থ কি? আজ শ্যামাচরণ বাবুর গৃহ সুন্দররূপে পত্র ও পুষ্পরাশিতে সুসজ্জিত। চল ভাই পাঠিকা একবার আমরা গৃহমধ্যে গিয়া দেখি কি ব্যাপার হইতেছে।

একখানি কেদারার উপর শ্যামাচরণ বাবু বসিয়া আছেন, আর তাঁহার চারি পার্শ্বে তাঁহার সহিত ৫।৬টি যুবা পুরুষ বসিয়া কত হাসি গল্প করিতেছেন। শ্যামাচরণ বাবুর চক্ষু দিয়া আনন্দধারা বহিতেছে, তিনি সস্নেহে সকলের দিকে একবার করিয়া তাকাইতেছেন, কি ভাবে মনের আনন্দ জানাইবেন তাহা যেন বুঝিতে পারিতেছেন না। আর যুবক বৃন্দও তাঁহাকে পাইয়া কি বলিবেন, কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। ইঁহারা কে জানিবার জন্য, পাঠিকা, বড় কি উৎসুক হইয়াছ? তবে বলি শুন, এই ছয়জন যুবা শ্যামাচরণ বাবুর পুরাতন ছাত্র। শ্যামাচরণ বাবু অতি যত্ন

আদরে ইঁহাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই কয়জন তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। যখন ইঁহাদের পাঠ শেষ হইল, নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্যসাধনে সংসারক্ষেত্রে আপন আপন দায়িত্ব ভার লইয়া প্রবেশ করিলেন তখন বিদায় লইবার কালে এই কয়জন যুবা শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে মিলিত হন, এবং প্রতিজ্ঞা করেন প্রত্যেকে উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় দশ বৎসর পরে তাঁহাদের স্নেহময় "গুরু মহাশয়"এর নিকটে একত্রিত হইবেন। শ্যামাচরণ বাবুকে ছাত্রেরা কখনও কখনও স্নেহভরে "গুরু মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শিক্ষক ছাত্রের যেরূপ সম্পর্ক সাধারণতঃ আমরা শুনিতে পাই, ইঁহাদের মধ্যে সে সম্পর্ক ছিল না। শ্যামাচরণ বাবু শিক্ষক, বন্ধু, সুহৃদ সকলই ছিলেন। ছাত্রদিগের সঙ্গে তাঁহার একটি সুমধুর নিগূঢ় বন্ধন ছিল। তাই আজ শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার অতি আদরের সন্তানগুলিকে নিকটে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল। মা যেমন বহু দিন পরে প্রাণাধিক পুত্রকে নিকটে পাইলে কিছুতেই চক্ষের অন্তরাল করিতে চান না, পুত্রের মুখ দেখিয়া দেখিয়াও আশ মেটে না, শ্যামাচরণ বাবুও আজ যেন হারাধনগুলিকে নিকটে পাইয়া কি করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। এইরূপে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আহারের সময় উপস্থিত হইল। তখন সকলে একে একে গিয়া আহার স্থানে বসিলেন। আহারস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পাঁচ জন ছাত্র কেবল উপস্থিত! ছয়টি আসন প্রস্তুত ছিল কিন্তু একটি স্থান শূন্য রহিল। যুবকদিগের নাম এই সময় বলিয়া লই। অমরেন্দ্র রায়, করুণাকুমার সিংহ, বিনোদ সেন, দীনেশ চক্রবর্ত্তী, নিবারণ চন্দ্র বসু, এই পাঁচ জন সমুপস্থিত, ইঁহারা সকলেই জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। সকলেই এক একটি সম্মানের উপাধি ও পদ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দচিত্তে পুরাতন পণ্ডিত মহাশয়কে এই আনন্দের সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। আর শ্যামাচরণ বাবুরও আনন্দের সীমা নাই। এমন ছাত্র দেখিলে কাহার না গৌরবে হৃদয় স্ফীত হয়? প্রতিজনে আপন আপন জীবন-কাহিনী বলিতে ব্যস্ত। বৃদ্ধ শিক্ষককে দেখিয়া ত যুবকদিগের উৎসাহের শেষ নাই আবার এতকাল পরে পরস্পরকে দেখিয়াও কত আনন্দ কত সুখ! আজ দশ বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহ হইতে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনে বাহির হইয়াছিলেন, আজ দশ বৎসর পরে সেই গৃহে আবার নিজ নিজ কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সকলে মিলিত হইয়াছেন ইহা কি কম আনন্দ!

কিন্তু সকলে আপন আপন স্থানে বসিয়া একটি স্থান শূন্য দেখিয়া এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "কৈ বিজয় আসে নাই?" কিন্তু ইহার উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, সকলেই একবার শূন্য আসনের দিকে তাকাইলেন। পরে সকলেই নীরব হইলেন। তখন শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "হয় ত কোন কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছে—আসিতে পারে নাই। বিজয় কখনও আমায় নিরাশ করিবে না।" তখন অমরেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, আমি সে দিন রাস্তায় বেড়াইবার সময় দেখিলাম ঠিক একজন বিজয়ের মত। কিন্তু তাহার চেহারা এরূপ শীর্ণ, বেশ এরূপ মলিন যে আমার বিশ্বাস হইল না সে আমাদের সেই সৌখীন বিজয়। তাহাকে যে কত দিন দেখি নাই! বড় আশা ছিল এখানে আজ দেখিতে পাব।" তখন বিনোদ বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই অমর, তোমার সঙ্গে বিজয়ের এত ভাব ছিল, সকলে তোমাদের ঠাট্টা করিত! তুমি কি এত দিন তাহার কোন খবর পাও নাই?" অমরেন্দ্র তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "প্রথম দুই বৎসর বিজয় বরাবর নিয়ম মত চিঠি লিখিত কিন্তু তার পর যে তাহার কি হইল কিছুই জানি না। বিজয় আমাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও উৎসাহী ছিল, তাহার জীবন কখনই অকৃতকার্য্য বা বিফল হইবে না।"

শ্যামাচরণ বাবুও বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার বিজয় সকলের গৌরবস্বরূপ হইবে, সকলের মুখ উজ্জ্বল করিবে তাহাই ত আশা করিয়া আছি। সে সকলেরই প্রিয় ছিল। তাহার সেই হাসিভরা মুখখানি বড় দেখিবার আশা করিতেছিলাম।"

সকলের আহার শেষ হইল। শূন্য আসন পড়িয়া রহিল। বিজয় আসিলেন না। শ্যামাচরণ বাবুর প্রাণের একটি স্থান শূন্য রহিল, যুবাদলের আনন্দ অপূর্ণ রহিল, আর অমরেন্দ্রের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়িল। সকলে আহারান্তে উঠিয়া বসিবার ঘরে যাইবেন এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া শ্যামাচরণ বাবুকে বলিল, "একটী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন" শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন "উপরে আসিতে বল ও নাম জিজ্ঞাসা কর।" তাহাতে ভৃত্য বলিল, "নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি বলিলেন, বিজয়কুমার, কিন্তু উপরে আসিতে চাহেন না।" বিজয়কুমার নাম শুনিবা মাত্র সকলের মুখ উৎফুল্ল হইল। সকলেই তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর আমি বিজয়কে লইয়া আসি," কিছুক্ষণ পরে বিজয়কে লইয়া শ্যামাচরণ বাবু গৃহমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। অন্য যুবারা একটু আমোদ করিবার অভিপ্রায়ে কেহ পর্দ্দার আড়ালে কেহ দরজার পার্শ্বে গিয়া লুকাইলেন। শ্যামাচরণ বাবু আসিয়া ঘর শূন্য দেখিয়া ছাত্রদের অভিসন্ধি বুঝিলেন। এরূপ আমোদ প্রমোদ তিনিও বড় ভালবাসিতেন। ইঙ্গিতায় তাহাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া বিজয়ের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন।

এই কি সেই বিজয়কুমার, যাহার প্রশংসায় এতক্ষণ সকলে ব্যস্ত ছিলেন?

মুখ পাংশুবর্ণ, চুলগুলিও রুক্ষ, বেশ নিতান্ত মলিন, কতদিন যেন অনাহারে গিয়াছে! বিজয়কুমার অধোবদনে নীরবে রহিলেন, দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু বহিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বাবুরও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। তিনি সস্নেহে বিজয়কুমারের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "বিজয় তোমার কি অসুখ হইয়াছিল?" তখন বিজয় ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি বসুন আমার জীবনের কাহিনী বলি। আমি যখন দশ বৎসর পূর্ব্বে এখান হইতে বিদায় লইয়া যাই, আমার অনেক আশা অনেক উদ্যম ছিল। দুই বৎসর কলেজে পাঠ করিয়া B. A. পাশ দিই। M. A. পড়িবারও ইচ্ছা ছিল; এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। বিধবা জননী ও দুইটি ভগ্নীর ভার আমার উপর পড়িল। সেইখানে পড়া বন্ধ করিয়া একটি সওদাগরী আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে সামান্য কেরানীর কার্য্য করিতে লাগিলাম। অতি কষ্টে দিনপাত হইত। ইহার পর জননীর পীড়া হইল, নিজে একবেলা আহার করিয়া, কাপড় ইত্যাদিতে অতি সামান্য খরচ করিয়া কোনরূপে ঔষধ পথ্য যোগাইয়া থাকি। তাই আজ আমার এই বেশ, আমার উৎসাহ আশার এই পরিণাম। আমার সকল সহপাঠি কৃতকার্য্য হইয়া এখানে উপস্থিত হইবেন আর আমি ব্যর্থ জীবন লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইব। তাই পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই। তাঁহারাও আমাকে দেখিলে বোধ হয় মুখ ফিরাইবেন। আমাকে বন্ধু বলিতে লজ্জা বোধ করিবেন। সে দিন অমর আমায় রাস্তায় দেখিয়াও দেখিলেন না। অমর আমার এত বন্ধু ছিলেন?" বলিতে বলিতে বিজয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তখন শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "দেখ বিজয়, কে বলিল তোমার জীবন ব্যর্থ? বাহিরে নাম না করিয়াও নীরবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তুমি তাহাই করিতেছ। তোমার বন্ধুরা তোমায় ভোলেন নাই। তাঁদের দেখিলে কি তোমার আহ্লাদ হবে?" এ কথাগুলি শুনিয়া বিজয়ের সে শুষ্ক মুখে আনন্দ আশা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু আবার যেন সে আশা নিভিয়া গেল। বিষন্ন অন্তরে বলিলেন, "এখন ত সকলে চলিয়া গিয়াছেন আমার সকল আশাই বিফল। একবার যদি সেই পূর্ব্বের মত আমার সহপাঠিরা আমায় তেমনি করিয়া হাত ধরিয়া নাম করিয়া ডাকেন, একবার বর্ত্তমান ভুলিয়া পূর্ব্বের স্নেহভাবে কথা কহেন, আমার সকল কষ্ট দূরে যায়।" যুবাগণ আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। সকলে চারিদিক হইতে আসিয়া বিজয়কে ঘেরিয়া ফেলিলেন। এককালে সকলেই কথা কহিতে লাগিলেন। যে আনন্দটুকু অপূর্ণ ছিল তাহা পরিপূর্ণ হইল। হৃদয়ের যে স্থান শূন্য ছিল তাহা পূর্ণ হইল। বিজয়কে পাইয়া সকলে পরম অনন্দে কোলাহল করিতে লাগিলেন। তাঁর জীর্ণ বেশ, মলিন কান্তি কেহ লক্ষ্য করিলেন

না। সেই বিজয়, তাঁদের আদরের স্নেহের বিজয় আর কেহ নয়। বিজয়ের স্বার্থত্যাগের নিকটে তাঁদের প্রতিপত্তি গৌরব যেন হীন মনে হইতে লাগিল। বিজয় নীরবে অকাতরে প্রাণের সকল আশা ত্যাগ করিয়া যে কর্ত্তব্যসাধনে জীবন দান করিয়াছেন তাহার নিকটে ইহাদিগের সামান্য অর্থ, সম্মাননা নিতান্ত সামান্য বলিয়া মনে হইল। শ্যামাচরণ বাবুর শূন্য আসন আর অপূর্ণ রহিল না। বিজয়ের স্থান বিজয় লইলেন। সেই দিন হইতে বিজয়ের ভাগ্যলক্ষ্মীও ফিরিলেন; ক্রমে বিজয় সহপাঠিদের মধ্যে একজন বিশেষ ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হইলেন। কিন্তু প্রথম কর্ত্তব্যটি তিনি ধরিয়াছিলেন তাহাই সকলই পাইলেন।

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজকুমারের বিবাহ দিবার জন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরের অধিক হইল মনোরমা নির্ব্বাসিতা হইয়াছে। রাজকুমার যে আর মনোরমাকে ভালবাসে না তাহার আত্মীয়গণের এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। যখন রাজকুমারের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল তখন সকলে তাহাকে আনাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। রাজকুমারের সন্তানটিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইত কিন্তু শিশু সন্তানকে মাতার নিকট হইতে লইয়া আসিলে হয়ত বাঁচিবে না এই ভয়ে আনাইতে পারিল না। একটু বড় হইলে আনাইবে এরূপ মনস্থ করিল। যখন শিশুটি তিন বৎসরের তখন গোপনে একদিন নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। যে দিন মনোরমা পুত্রের জন্য পাগলিনী হইয়া বেড়াইতেছিল সে দিন রাজকুমার শিশুকে কোলে করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে লইয়া চলিয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ যে দিন শিশুটিকে এক জায়গায় তাহার ভৃত্য বসাইয়া কিয়দ্দূরে কাহার সহিত গল্প করিতেছিল, শিশু আপন মনে খেলা করিতেছিল সহসা একটি গাড়ী হইতে নামিয়া রাজকুমার তাহাকে উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া শিশুর কোন সন্ধান পাইল না। মনোরমা এ সংবাদ পাইয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, তাহার জীবনের এক মাত্র সুখ আনন্দ সব সেই শিশুটি, তাহাকে হারাইয়া সমুদায় অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মৃত্যুর জন্য সে প্রার্থনা করিতে লাগিল। শিশু আনন্দে তাহার পিতার কোলে বসিয়া নূতন নূতন খেলনা লইয়া খেলিতে লাগিল, মার কথা ভুলিয়া গেল! মনোরমার পিতা সংবাদ পাইয়া মনোরমার নিকটে গেলেন দেখিলেন যে সে পুত্রশোকে একেবারে পাগলিনী। মনোরমাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, কেবল পুত্রের জন্য

বিলাপ করিতে লাগিল। রাজকুমার যে গোপনে সন্তানটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ইহা মনোরমার পিতা জানিতেন না। তিনি মনোরমাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, সন্তানটির জন্য তিনি যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিবেন। এদিকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন রাজকুমারের বিবাহের সব ঠিক, এক সপ্তাহ মধ্যে বিবাহ হইবে, দিন স্থির হইয়াছে। যদিও মনোরমার উপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি তাহার মায়া ছাড়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল, মনোরমাও পুত্রকে হারাইয়া যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছে আবার কি শাস্তি সে সহ্য করিতে পারিবে? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে তিনি রাজকুমারের নিকট গমন করিলেন। রাজকুমারের বিবাহের কথা যে সত্য তাহা জানিতে পারিলেন। রাজকুমারের পিতার অত্যন্ত অসুখ তাহার জন্য রাজকুমারের শীঘ্র বিবাহ দিতে চাহিয়াছেন। মনোরমার পিতা বারণ করিতে পারিলেননা কারণ তিনি জানিতেন মনোরমা দোষী তাহার পক্ষ লইয়া কোন কথাই বলিতে সাহস করিলেননা। পরে জানিতে পারিলেন মনোরমার পুত্রকে রাজকুমারই লইয়া আসিয়াছে। এ সংবাদ মনোরমাকে দিবার জন্য তিনি স্বয়ং পুনর্ব্বার তাহার নিকটে যাইবেন স্থির করিলেন। মনোরমা রাজকুমারের বিবাহ শুনিয়া মনে কষ্ট পাইবে কিন্তু হারাধন পুত্রের সংবাদ পাইয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে। রাজকুমারের বিবাহের পূর্ব্বদিন তিনি মনোরমার নিকটে গমন করিলেন।

এদিকে মনোরমার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল, মৃত্যু যেন অল্পে অল্পে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। এই সময়ে একটী দরিদ্র ব্যক্তি, পাঠিকাগণের বোধ করি মনে আছে পূর্ব্বে একবার ইহার কথা বলিয়াছি, প্রায়ই ভিক্ষা চাহিতে মনোরমার নিকটে আসিত এবং দাসীর নিকট হইতে তাহার সংবাদ লইত। যে দিন মনোরমার পিতা পৌঁছিলেন, সে দিন মনোরমার দাসীকে একটি দরিদ্র বালক আসিয়া বলিল, "দেখ ঐ কুঁড়েতে এক জন গরীব আছে তার বড় অসুখ করেছে, তোমাকে শীগ্‌গির করে যেতে বল্লে।" দাসী কিছুই বুঝিল না, বালকের কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গে একটি কুঁড়েতে গেল, সেখানে দেখিল সেই দরিদ্র ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। দাসীকে দেখিবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "অমূল্য বাবু আসিয়াছেন?" মনোরমার পিতার নাম অমূল্য বাবু। দাসী উত্তর করিল, "আজ আসিবার কথা।" সে বলিল, "তাঁহাকে আসিবা মাত্র আমার নিকটে পাঠাইয়া দিও এ বিষয় তোমার মাকে কিছুই বলিও না।" দাসী কিছু না বুঝিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। অমূল্য বাবু যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দাসী তাঁহাকে দরিদ্রের সংবাদ

দিল। অমূল্য বাবু মনোরমার সঙ্গে দেখা না করিয়াই তাহার নিকটে গেলেন। এদিকে মনোরমা পিতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পিতা অসিতেছেন না দেখিয়া তাহার মনে বড় ভয় হইল। অমূল্য বাবু অনেক রাত্রিতে বাটী ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে আজ আনন্দ, মমোরমাকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ ধরিল না তিনি সস্নেহে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মনো, আজ তোর গুণ টের পেলাম, ভগবান তোকে আশীর্ব্বাদ করুন। নির্দ্দোষীকে ভগবান পুরস্কার দেন, আজই তোকে স্বদেশে লইয়া যাইব, শীঘ্র প্রস্তুত হ।" মনোরমা আনন্দে ও সভয়ে বলিল, "বাবা তুমি কি করে টের পেয়েছ এ কাজ কে করিয়াছে তাকে কি শাস্তি দিবে?" অমূল্য বাবু উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ আমি টের পেয়েছি।"

"সে কে?"

"এখন সে মানুষের শাসনের অতীত স্থানে গমন করিয়াছে।"

মনোরমা প্রকৃত দোষী কে জানিতে পারিল না কিন্তু এই জানিল জ্যোতিন্দ্র ও সুরমার একজনও দোষী নহে। যাইবার পূর্ব্বে মনোরমা বলিল, "আহা সে গরীব লোকটি অনেক দিন আসে নাই, দাসী তুই তাকে কিছু দিয়ে আয়।" দাসী বলিল, "মা সে মারা গিয়েছে, কয়দিন ধরে তার খুব অসুখ করেছিল।" ইহা শুনিয়া তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। অমূল্য বাবু মনোরমাকে লইয়া যে দিন স্বদেশে ফিরিলেন সেই দিবসই রাজকুমারের বিবাহ। পথে দেরী হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বিবাহের সময়ই প্রায় সেখানে পৌঁছিলেন। অমূল্য বাবুর অত্যন্ত ভয় হইল যদি ঠিক সময়ে না যাইতে পারেন তবে রাজকুমারের বিবাহ হইয়া যাইবে আর তাঁর দুঃখিনী কন্যা চিরদুঃখিনী হইবে। তিনি কন্যাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াই রাজকুমারের বাটীতে গমন করিলেন। মনোরমার যদিও স্বদেশে আসিয়া আনন্দ হইতেছিল কিন্তু পুত্রের অভাব তাহার বড় মনে হইতেছিল। হায় আজ যদি তার পুত্র থাকিত সে পূর্ণসুখী হইত এই ভাবিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অমূল্য বাবু তাহাকে পুত্রের কথা বলেন নাই। একেবারেই পুত্রকে দেখাইবেন এই স্থির করিয়াছিলেন। অমূল্য বাবু যখন রাজকুমারের গৃহে গেলেন তখন দেখিলেন রাজকুমার বিবাহ করিতে যাইবার জন্য সাজ সজ্জা করিতেছে। রাজকুমার পিতৃ আনুরোধেই বিবাহ করিতেছে। তাহার মনে সুখ নাই; অমূল্য বাবু রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তখন রাজকুমার ব্যস্ত ছিল, বিবাহ সজ্জা শেষ হইলে যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল অমূল্য বাবু তাহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, "বাবা শীঘ্র একবারটি এস আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে," এই বলিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া

একটি নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন। অমূল্য বাবুর ব্যবহারে গৃহস্থ সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এ দিকে অমূল্য বাবু সমুদায় কথা রাজকুমারকে বলিলেন। রাজকুমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া সে স্থানে বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে বরযাত্রীগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমার মুস্কিলে পড়িল। এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া সে বলিল, এখন লুকাইয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত, এই বলিয়া তাঁর পিতাকে একখানি চিঠি লিখিল তাহাতে এই লিখিল, "আজ আমি কোন ঘটনা শুনিয়াছি যাহা শুনিয়া বিবাহ করিব না স্থির করিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, পরে সব শুনিতে পাইবেন।" ইহা লিখিয়া একটা চাদর সমস্ত শরীরে ঢাকিয়া অমূল্য বাবুর সহিত পাশ দরজা দিয়া তাঁহার বাটীতে পলাইয়া গেল। রাজকুমারের পিতা তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাজাইয়া বিবাহ করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

কয়েক বৎসর হইয়া গিয়াছে। মনোরমা এখন আবার সেইরূপে পতিপুত্রসহ মনের আনন্দে গৃহ সংসার করিতে লাগিল, তাহার অন্য সকল গুণের সহিত গাম্ভীর্য্য মিশিয়া আরও তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। রাজকুমার ও অমূল্য বাবু দুইজনেই মনোরমাকে সামন্য নারী ভাবিতেননা, যে নারী পরের জন্য নিজের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলী দিতে পারে সে কি সামান্যা নারী হইতে পারে? আমরা এইবার সুরমার খবর লইতে যাই। সে এখন পরম সুখে কালযাপন করিতেছে যদিও স্বামীর কথায় সে মনোরমাকে চিঠি পত্র লিখিতে পারিত না, কিন্তু তাহার বাল্যসঙ্গিনীকে সে চিরদিন সমান ভাবে ভালবাসিত। যখন শুনিল মনোরমা রাজকুমারের গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে তখন স্বামীর কাছে অনুরোধ করিয়া সে মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করে। মনোরমার সুমিষ্ট ব্যবহারে সুরমা একেবারে সকল কথা ভুলিয়া গেল। আবার তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় ভাব হইল।

মনোরমার কথা যদি সকলে জানিতে পারিত তবে তাহাকে আজ সকলে উচ্চ আসনে বসাইয়া পূজা করিত কিন্তু রাজকুমার ও অমূল্য বাবু ছাড়া কেহই জানিল না। শুধু মনোরমার দাসী মধ্যে মধ্যে ভাবিত, কেনই বা সে দরিদ্র লোকটি অমূল্য বাবুকে ডাকিয়াছিল, কেনই বা তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মনোরমাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিলেন, সে যেন সব বুঝিয়াও বুঝিতে পারিত না।

সমাপ্তঃ।

দুইটি বোঝা।

(একটি স্বপ্ন)

একদা লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত, অপমানিত হইয়া আমি বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। আত্মীয় প্রিয়জনের, লোকের, জনসমাজের অপ্রিয় ব্যবহার, কটুকথা, নিন্দাবাক্য, লাঞ্ছনা সমুদায় হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। ইহার ভারে হৃদয় বেদনাপূর্ণ হইল, বক্ষ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অবসন্ন দেহ, নিরুৎসাহ হৃদয় লইয়া সংসারপথে চলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হায় পারিলাম না, কম্পিত চরণে, নত মস্তকে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা স্নেহপূর্ণ করুণাময় মধুময় কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "বৎস, জগতের বিচারপতি, শান্তিদাতার নিকট যাও।" দেখিলাম সম্মুখে প্রশস্ত পথ ধীরে ধীরে দয়াময় ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কাতরস্বরে কহিলাম, "প্রভু, এ ভার বহন করিতে পারিতেছি না, বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমাকে মুক্ত কর আমি পুনরায় মস্তক উন্নত করিয়া দৃঢ় পদে সংসার পথে চলিয়া যাই।"

প্রশ্ন হইল, "এ বোঝার মধ্যে কি?"

তখন বহুদিনের সংগৃহীত, সযত্নরক্ষিত, যাহা কিছু হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা একে একে জানাইলাম। তখন গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, "বৎস, তোমার বক্ষের বোঝা আমাকে দাও, হৃদয়ে শান্তি ধারণ কর," আমার সমুদায় হৃদয়ভার, বক্ষের বোঝা প্রভুর চরণতলে রাখিয়া, আমি আনন্দিত হৃদয় প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ফিরিলাম ও লঘুপদে পুনরায় সংসারে চলিলাম। যখন সেই প্রশস্ত পথপ্রান্তে আসিলাম তখন পুনরায় সেই করুণাময় কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "বৎস, শান্তিদাতার সিংহাসনতল হইতে ফিরিতেছ তথাপি পৃষ্ঠে বোঝা কেন, দেহ ভারাক্রান্ত কেন?"

আমি কহিলাম, "আমার বক্ষের ভার প্রভুর চরণতলে রাখিয়া আসিয়াছি, হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল, "তবে পৃষ্ঠে বোঝা কেন?" আমি তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলাম যথার্থ পৃষ্ঠে এক বৃহদাকার বোঝা, বক্ষের বোঝা অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ! আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। এ বৃহৎ বোঝা ত পূর্ব্বে দেখি নাই, ইহার ভার ত এতদিন অনুভব করি নাই; আর বক্ষের সেই ক্ষুদ্র বোঝার ভারে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়াছিলাম, বহন করিতে পারি নাই। তখন পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, "বৎস, এই যে বোঝা এক্ষণে দেখিলে, ইহা নূতন নহে—বহুদিনের। এই বৃহৎ বোঝার ভিতরে তোমার কৃত অপ্রিয় ব্যবহার, তোমার মুখ নিঃসৃত কটু কথা পরনিন্দা সমুদায় সংগৃহীত রহিয়াছে—দেখ কি স্তূপাকার হইয়াছে। তথাপি তুমি ইহা অনুভব কর নাই। তুমি অপরের দোষ সমুদায় নিজ বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছিলে, হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলে, গলে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলে, নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছিলে, তাই পৃষ্ঠের বোঝা অনুভব কর নাই, জানিতেও পার নাই। কিন্তু বৎস, ইহা অপরের বক্ষে ভারাক্রান্ত হইয়াছে,

অপরের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে, অপরের নয়নে অশ্রু আনিয়াছে, প্রাণে আঘাত দিয়াছে।" আমি নীরবে শুনিলাম। আমার অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সেই বোঝার মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম। সহসা উহার ভার অনুভব করিলাম। এ ভার যে অসহনীয়, এ বোঝা যে ভয়ঙ্কর! আমি আত্মগ্লানিতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, অনুতাপে, দুঃখে অভিভূত হইয়া পুনরায় ভগবানের সিংহাসনতলে ফিরিলাম ও কাতরকণ্ঠে কহিলাম, "প্রভু, এ বোঝাও তোমার চরণতলে রাখিতে দাও।"

তখন গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল, "না বৎস, এ বোঝার ভার একে একে তুমি নিজ হস্তে নামাও, সহজেই মুক্ত হইবে। সংসারে ফিরিয়া যাও। কিন্তু আজ হইতে অপরের সকল অপ্রিয় বাক্য ও সকল কার্য্য চরণতলে ফেলিয়া দাও, দৃষ্টির অগোচর কর। কিন্তু নিজের যাহা কিছু মন্দ অপ্রিয় তাহা হৃদয়ে গলে ধারণ কর, সর্ব্বদা স্মরণ কর, তাহা হইলে হৃদয় দেহ ভারাক্রান্ত হইবে না, বোঝা বৃদ্ধি হইবে না।"

শ্রীস্নেহলতা সেন।

ঈশ্বরোদ্দেশে।

তন্ন তন্ন করি, করি অন্বেষণ,
পাই না যে প্রভু তব দরশন।
চারিদিকে কত খুঁজিয়া বেড়াই,
তব দরশন তবু কোথা নাহি পাই।
একি বিড়ম্বনা কহ মোরে প্রভু,
শ্রীচরণ দেখা পাব না কি কভু।
ক্ষুদ্র জীব আমি তোমারি সৃজিত,
এ দীন জীবন তোমারি গঠিত।
দয়াময়! তবে কি হেতু ছলনা,
মহাপাপী আমি তাই কি হে ঘৃণা?
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি দয়াময়,
ভাগ্যহীনা বলি মোরে কি নিদয়?
করিলে প্রার্থনা পুরাও সবার,
মিটিবে কি আশা বাসনা আমার?
হৃদয়মন্দিরে প্রেমপুষ্প দিয়া,
ভকতিচন্দনে সমর্পিয়া হিয়া,
রাখি সঙ্গোপনে যুগল চরণ,
কল্পনায় দেব! পূজি অনুক্ষণ।
ক্ষুদ্র জীব মনে উচ্চ আশা করি,
মনে করি হরিপদ বুকে ধরি;
সে উচ্চ ক্ষমতা কোথায় আমার
ধরিতে পারিব চরণ তোমার।
মায়ার বন্ধনে পরস্পরে বাঁধি,
এ সংসারে মোরা হাসি আর কাঁদি।
মায়ায় ভুলিয়ে আসি আর যাই,
ভুলেও তোমারে দেখিতে না পাই।
অসার সংসারে কেহ কার নয়,
বুঝিয়েও হরি বুঝি নাক হায়!
সংসার আশ্রমে পথিকের প্রায়,
দুদিন আসিয়া ভুলেছি তোমায়।

প্রভো!

ভুলিয়ে তোমায় রয়েছি আমরা।
তাই করিতেছ তব সঙ্গ ছাড়া।
তব সম্মিলন সুখলাভ তরে
অশ্রুজল সদা নয়নে যে ঝরে;
দয়াময়! দীনে হইয়া সদয়,
অধীনী বলিয়া দেহ পদাশ্রয়।
সংসারবন্ধনে বেঁধনাক আর,
ডুবায়ো না আর দিয়ে পাপ ভার।
এ ভব সংসারে বল কিসে তরি,
আশা পূর্ণ কর দিয়ে পদতরী।
দীন পুষ্পাঞ্জলি কর গো গ্রহণ,
অন্তিমে হে হরি দিও শ্রীচরণ।
জীব জন্মমৃত্যুঅনুগামী সবে,
এ যন্ত্রণা হরি কত দিনে যাবে।
এ সংসারে আর আসিতে না হয়,
এই ভিক্ষা করি পদে দয়াময়।
তোমার উদ্দেশে মন দেশ দেশান্তরে
ভ্রমিতেছে নাথ কোথা কোথা করে।
দেখা দাও হরি রব তব সাথে,
চরণকিঙ্করী লও হে পশ্চাতে।

কি সুন্দর?

মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান যেমন অন্যান্য বৃত্তি সকল দিয়াছেন তেমনি সৌন্দর্য্যস্পৃহা একটী প্রবৃত্তি। সুন্দর বস্তু দেখিলেই মানবহৃদয় স্বভাবতঃ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এমন মনুষ্য কে আছে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় না। ভগবান আমাদের এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কতই আয়োজন করিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে নিত্য নব নব শোভা তিনি প্রস্ফুটিত করিতেছেন। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকারের নূতন নূতন দৃশ্যে এই ভবরঙ্গ নাট্যশালার পটপরিবর্ত্তন হইতেছে সকলই নয়নমন-পরিতৃপ্তিকারী। পর্ব্বতের নীরব গম্ভীর দৃশ্যে, নির্ঝরিণীর মৃদু নিনাদে, তটিনীর কলগানে, মহাসাগরের অসীম সফেন উর্ম্মিমালাপরিশোভিত নীল নীরে, বনবিহঙ্গের মধুর কাকলিতে, অনন্ত গগনপটে তারকারাশির সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে, আবার পূর্ণ শশধরের বিমল জ্যোৎস্নায় ইত্যাদি কত শত নিসর্গ শোভা আমাদিগকে সতত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ করিতেছে। একটা সৌন্দর্য্যে হয়ত মোহিত না হইয়া অন্য আর এক প্রকারের শোভাতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এত যে শোভা আমাদের নয়ন গোচর হয় কোনটী আমাদিগকে যথার্থ সুখী করে? মনুষ্যহস্তের কত প্রকারের বিচিত্র চিত্র সকল আমরা দর্শন করি, কত প্রকার সাজসজ্জা আমরা নিরীক্ষণ করি, কত বিচিত্র বর্ণের জ্যোতি আমাদের নয়ন ঝলসিত করে কিন্তু মনের আকর্ষণ না থাকিলে কোনটীতেই কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখী করিতে অথবা পূর্ণ আরাম বিধান করিতে পারে? তবে ইহাই আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই মন যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহাই আকর্ষণের এবং সুখের বস্তু। তবে দেখা যাউক কিসে আমাদের মনকে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ করে? যাহাকে ভালবাসি তাহাকে যেমন মধুর হইতে মধুরতর দর্শন করি তেমন তো আর কিছুতেই দেখিতে পাই না। স্নেহের ধন যাহাকে পাই তাহাকে দেখিতে দেখিতে কোন্ অজানিত সুখে মন প্রাণ ডুবিয়া যায় যে মনে হয় ত্রিভুবনে বুঝি এমন সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই! বাস্তবিক মনে হয় ভগ-

বানের এই চিত্রের কাছে আর কোন্ চিত্রের তুলনা হয়? কোন্ সৌন্দর্য্যে এই অসীম সুষমারাশির তুল্য গুণ দেখিতে পাইব? জানি সকলই সেই এক অদ্বিতীয় প্রজাপতি বিশ্বপাতা বিধাতার চিত্ররচনা, কিন্তু স্নেহের আধার যে তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া কি দেখিতে পাই? দেখিয়া ভাবি শারদীয়া যামিনীর বিমল চন্দ্র বড় সুন্দর; বড়ই তরল মাধুরীতে সুশোভিত; তথাপি স্নেহের চক্ষে তুলনা করিতে যাইলে কোটী শরচ্চন্দ্রের একত্র সমাবেশও পরাস্ত হয়। তুলনা করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। যাহাকে ভালবাস তাহার মুখে সেই শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ভগবানের অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া তাঁহার বিশ্বরূপে মুগ্ধতা ও তন্ময়ত্ব লাভ যদি কেহ আস্বাদন করিয়া থাক তবেই অনুভব হইতে পারে নতুবা সম্যক বুঝিতে পারা সুকঠিন। তাই সন্তানের সঙ্গে জননী কোন বস্তুর তুলনা মনোনীত করিতে পারেন না। স্নেহাস্পদের ন্যায় সুখের এবং সুন্দর বস্তু আর কি আছে? কিছুই না। যথার্থ স্নেহ চক্ষে যদি আমরা কাহাকেও দেখিতে পাই তবে আর কি ভুলিতে পারি? তাহার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়, প্রতি হাস্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি স্নেহাস্পদের সমস্ত জীবনের সঙ্গে যেন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া থাকে মনে হয় বুঝি স্বর্গের যত গুলি পারিজাত ফুটিয়াছিল ভগবান্ সে গুলি সব একত্র করিয়া এই শোভা প্রকাশে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ধন্য অপূর্ব্ব শিল্পী ভগবান তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি মনুষ্যের সুখের নিমিত্ত মনে কত ভাব, প্রেম, পুণ্য ইত্যাদি সৌন্দর্য্য এবং বাহিরে জগতের চারিদিক পূর্ণ করিয়া নয়ন রঞ্জন কত সৌন্দর্য্যই না সাজাইয়া রাখিয়াছেন! কবে বিধাতার প্রকাশিত সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে তাঁহার নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আমরা সুন্দর হইয়া যাইব! কবে নব নব ভাবকুসুমে জগৎ-সংসার-উদ্যান প্রস্ফুটিত হইয়া নব নব জ্ঞান প্রেম যোগ ভক্তির আদান প্রদানে দিন দিন আরও সুন্দর আকার ধারণ করিবে! এই বিশ্বসৌন্দর্য্যে, এই প্রেমাস্পদ স্নেহাস্পদ প্রিয়জনের আননে এবং জীবনে ও চরিত্র-জ্যোতিতে যদি সেই স্বর্গীয় চিত্রকরের হস্ত দেখিতে পারি ও তাঁহার পবিত্র প্রেম জগতে প্রবাহিত করিতে পারি, তবে তদপেক্ষা সুন্দর আর কি আছে?

পদ্য।

(কোন হিন্দুমহিলা রচিত)

শুন শুন হরি নিবেদন করি
ঘুচাও মনের ধাঁধাঁ,
বুঝিতে না পেরে পড়ি ঘোরে ফেরে
দেখি যে সকল আঁধা।
এই যত সৃষ্ট করিতেছ দৃষ্ট
অথচ নয়ন নাই,
বিহীন শ্রবণ করিছ শ্রবণ
ভাবিয়া কিছু না পাই।
নাহি তব নাক ভাবিয়ে অবাক
কেমনে বুঝিব বল
ফুলের সুবাস করিলে প্রকাশ
না জানিয়ে এ কৌশল?
নাহিক রসনা তবু খাদ্য নানা
করিলে সুমিষ্ট দিয়ে,
তাতে যত লোক হইয়ে পুলক
তৃপ্ত করিতেছে হিয়ে।
ভাবিতে হইবে থাকি এই ভবে
নাহিক তোমার মন
এত ভাব লয়ে ভাবুক হইয়ে
আছেন সেই ত জন।

আঁকিলে ধ্রুবের ছবি পঞ্চম বরষে,
সে সময় তাঁর মুখ প্রেমরসে ভাসে।
দৈত্যকূলে জন্মাইলে প্রহ্লাদ মহাত্মা,
প্রেমভক্তি মিশাইয়ে দিলে তাঁর আত্মা।
ভক্তি বিনে ডুবে যায় দেখে বঙ্গদেশ
আঁকিলে গৌরাঙ্গ ছবি কি সুন্দর বেশ।
নবদ্বীপে সেই ছবি যখন রাখিলে,
ধন্য হইল কলিযুগ হরি হরি বোলে।
ঈশা মুশা বুদ্ধকেও তুমি আঁকিয়াছ,
কারু নিকট প্রেম, ভক্তি, ক্ষমা রাখিয়াছ।
কি আর বলিব তোমায় শুন ওহে কবি,
লিখিয়াছ কত রকম তুমি এই ছবি
আমারে কিঞ্চিৎ দয়া করিয়ে প্রকাশ,
লাগাইয়া দেহ অঙ্গে ভক্তির বাতাস।

মহাত্মা শাক্যসিংহ।

মহাবীর শাক্যসিংহের জীবনে কতদূর বীরত্ব প্রকাশ হইয়াছিল তাহা অনেক

পাঠিকাই অবগত আছেন। কত যুগ যুগান্তর হইল এই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আসিয়া যুগে যুগে দেশ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। মহাবীর শাক্যসিংহ যখন দেশত্যাগী হইলেন, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের একমাত্র পুত্র সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গেলেন, তখন কিরূপ নিদারুণ যাতনায় বৃদ্ধ পিতা কাতর হইয়াছিলেন! পতিপ্রাণা সতী গোপা স্বামীর বিচ্ছেদে সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধু মহাত্মা ঈশ্বর প্রেরিত—পৃথিবীর দুঃখ পাপ দূর করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন, তাঁহারা কি সামান্য সংসারাসক্তি-মোহেতে আচ্ছন্ন হন? শাক্যসিংহের জীবনে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

যখন রাজা শুদ্ধোদন শুনিলেন তাঁর প্রাণাধিক পুত্র গৃহত্যাগী সংসারত্যাগী হইবেন, তিনি কত উপায়ে পুত্রকে গৃহে রাখিবার নিমিত্ত উপায় করিলেন, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর উন্নত করিয়া দিলেন এবং দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। গীত বাদ্য নৃত্য কোলাহলে, যত প্রকার আমোদ প্রমোদে কুমারের মন আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যে বিহঙ্গ মুক্ত আকাশে উড়িয়াছে, সে কি আর গৃহে বদ্ধ থাকিতে চায়? তার প্রাণকে যে হরি আহ্বান করিতেছেন, আর কি সে তুচ্ছ অসার মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারে? কথিত আছে প্রাতঃকালে শাক্যসিংহ নারীর কণ্ঠে গীতধ্বনিতে শ্রবণ

করিলেন, "জরা-মৃত্যু ব্যাধি পূর্ণ এই পৃথিবী, সকলেই ইহার বশীভূত, জীব সকলকে উদ্ধার কর ইত্যাদি"; এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শাক্যের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; ভাবিলেন যথার্থই ত আমি বৃথা মায়ায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, পৃথিবীর ভার দূর করিতে যাই। আর তখন কোথায় স্ত্রী? কোথায় প্রাণসম পুত্র? কোথায় বৃদ্ধ পিতা? সকলকে ত্যাগ করিয়া যে আহ্বান ধ্বনি শুনিয়াছেন সেই দিকে দৌড়িলেন। আর কে তাঁহাকে বদ্ধ রাখিবে? এত বড় রাজ্য, আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী চতুর্দ্দিকে পূর্ণ; এ সকলকে সামান্য তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অবাধে চলিয়া গেলেন।

বোধিবৃক্ষতলে সাত বৎসর কাল কঠিন সাধনের পর সিদ্ধ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর আর একটি নাম সিদ্ধার্থ। তাঁর সেই গম্ভীর প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি—মুণ্ডিত মস্তক; গৈরিক পরিধান করিয়া হস্তে কমণ্ডলু লইয়া যে রাজ্যের রাজা তিনি, সেই রাজ্যেই ভিক্ষা করিতে আসিলেন। যখন শাক্যের পিতা বড় কাতর হইয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন তুমি দেশত্যাগী হইও না, তখন শাক্যবীর বলিলেন, আমাকে যদি জরা মৃত্যু ব্যাধির হস্তে পড়িতে না হয় তবে আমি গৃহে থাকি। পিতা তদুত্তরে বলিলেন সে কি মানুষের হাতে? তাহা কিরূপে বলিব? শাক্য বলিলেন, আমি দেশত্যাগী হইব। পিতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত এ অসম্ভব প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁর জীবনে চারিটি দৃশ্য মহাবৈরাগ্যের কারণ হইয়াছিল; প্রথমে বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী এই চারিটি দৃশ্য দেখিয়াই তিনি গৃহত্যাগী হইলেন। যখন সিদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁর এক মাত্র পুত্র, স্ত্রী এবং বৈমাত্র ভ্রাতা সকলকেই নিজ শিষ্য করিয়া লইলেন। ধর্ম্মের জন্য যে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ আবার ধর্ম্মেতেই সকলকে প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধ স্বর্গীয় সম্বন্ধ নিত্যকালের সম্বন্ধ। মহাবৈরাগ্য নির্ব্বাণসাধন। উচ্চ পবিত্র জীবন—শাক্যের জীবন সকলেরই পূজ্য।

আশা।

আশা বিনা মানব জীবন ধারণ করিতে পারে না, একথা আমরা নিয়তই শুনিয়া থাকি। কিন্তু ইহার মধ্যে কতটা যথার্থতা যে নিহিত আছে তাহা প্রাণমধ্যে গিয়া যদি জীব অন্বেষণ করে ত সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। বাস্তবিক এ সংসারে যাহার আশা করিবার কিছুই নাই তাহারও অন্তরের এক কোনে একটি আশা-প্রদীপ অতি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে দেখিতে পাই। সংসারের পরীক্ষার নিষ্ঠুর আঘাতে যে জীবনের সকল আশা একে একে ধ্বংস হইয়াছে, প্রাণের অসংখ্য বাসনা একে একে নির্ম্মূলিত হইয়াছে, হৃদয়তন্ত্রী ছিন্নপ্রায় হইয়াছে তাহারও হৃদয় মাঝে

খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে অতি ক্ষীণ, অতি সূক্ষ্ম একটি আশা-তন্ত্রী নিঃশব্দে বাজিতেছে!

কিন্তু মানব জীবনে যখন প্রথম আশা বিসর্জ্জন দিবার সময় উপস্থিত হয়, সে সময়টি কি বড়ই নির্যাতন বড়ই যন্ত্রণার সময় নহে? যখন তাহা বিসর্জ্জন দেয় তখন ত সব শেষ হইয়া যায়, আর সে অস্থিরতা, সংগ্রাম জীবনকে আলোড়িত করে না। কিন্তু প্রাণের অতি যতনের আশা, অতৃপ্ত সমুদ্রসমান আশা যখন অবস্থার করাল গ্রাসে বিসর্জ্জন দিতে হয় তখনই জীবনের মহাপ্রলয়, অগ্নিমন্ত্রের মহাপরীক্ষা।

সেই জীবনই ধন্য, সেই পরীক্ষাকালে যে জীবন বিচলিত না হইয়া নীরবে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়াও সেই চির-আদরে রক্ষিত আশা রত্নটিকে বিসর্জ্জন দিতে পারে।

কাহার মধ্যে সে বল, সে শক্তি আছে? কত সময় সেই বলের অভাবে জীব এই পরীক্ষাকালে অস্থির অধীর হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া জ্ঞানশূন্য হয়। কত জীব অকালে আপন জীবন বিনষ্ট করে।

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আশা লইয়া সংসারে বিচরণ করি, শত শত দুঃখ কষ্ট মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আশা প্রদীপ বক্ষে লুকাইয়া আনন্দে সে সকল কষ্ট সহিয়া যাই। অম্লান বদনে সকল নির্যাতন সহ্য করিয়া যাই। এক একবার যখন প্রাণ বড় অস্থির হয় একাকী কোন নিভৃত স্থানে গিয়া হৃদয়কবাট খুলিয়া সেই প্রদীপটি বাহির করি, সেই ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষীণালোকে যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সকল অন্ধকার দূরে যায়; সকল কষ্টের লাঘব হয়। আবার তাহা গোপনে সযতনে অন্তর মধ্যে লুকাইয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসি। সেই মুহূর্ত্তটুকু মধ্যে জীবনে কত বল, কত উৎসাহ আসে কে তাহা বুঝিতে পারে? আমার সে ক্ষুদ্র আশাটুকু কাহারও পথে কোন বাধা দেয় না, কাহারও কোন ক্ষতি করে না, আমার আশাটুকু আমারই আছে, তাহা অপরে বুঝিবে না, অপরে আদরও করিবে না, কিন্তু আমার কাছে সে বড় আদরের, বড় সুখের। কিন্তু হায়! এই সামান্য সুখটুকুও সংসারের সহ্য হইল না। সংসারের এমনই দাবী দাওয়া! কেমন করিয়া জানিল জানি না কিন্তু আমার সে আশাটুকু আর আমার রাখিবার অধিকার রহিল না। যাহা এত দিন আমার জীবনকে এমন করিয়া জড়াইয়াছিল সে লতাটি আজ ছিন্ন করিয়া ঘটনার অকূল সাগরে বিসর্জ্জন দিতে হইল। ইহাতে সমস্ত জীবনটা ক্ষণকালের জন্য আন্দোলিত হইল, হৃদয়টা একবার আলোড়িত হইল, প্রাণটা একবার কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তার পর? সব স্থির, প্রশান্ত গম্ভীর! কিন্তু এ শান্তি বিস্মৃতির শান্তি নহে, এ আরাম সে আনন্দের আরাম নহে যাহাকে সংসার "আনন্দ" বলে। এ শান্তি দুঃখ হইতে উৎপন্ন, এ আরাম গভীর রোগ যন্ত্রণার

পর যে আরাম সেই আরাম। তাই মনে হয় দুঃখের মধ্যেও শান্তি আছে, যন্ত্রণার মধ্যেও আরাম আছে। বিদ্যালয়ে পরীক্ষার পর পারিতোষিক, সংসার-বিদ্যালয়েও পরীক্ষার পর শান্তি। কিন্তু বাস্তবিক এতক্ষণ এত যুক্তি মীমাংসা করিয়াও কি সত্য সত্য বলিতে পারি হৃদয় হইতে সকল আশা মুছিয়া ধুইয়া গিয়াছে? এতক্ষণ যে বিষয় লইয়া ভাবিলাম, বুঝাইতে, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, দেখিতেছি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম না। সকল আশা গেল বলিতে পারি না! সকল আশা বিসর্জ্জন দিলেও আবার কোথা হইতে নূতন আশা উৎপন্ন হয়! কেবল ভাবে একটু প্রভেদ আছে। নাম "আশা" বটে কিন্তু প্রথম আশা সংসারে, পরের আশা স্বর্গধামের দিকে। এক আশা জীবে আর এক আশা জীবনদাতার চরণে! সংসার এই দুইটির মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহাই বুঝাইবার জন্য আমাদের এত পরীক্ষা করে। যে আশা স্বর্গের দিকে সে আশায় নিরাশা নাই কিন্তু যে আশা সংসারের দিকে সে আশায় শত নিরাশা, সহস্র আঘাত। এত প্রহারেও মন এখনও এ শিক্ষাটুকু শিখিলে না?

পাক বিধি।

হাঁসের ডিমের সহিত, এরারুট, লবণ, হলুদ, লঙ্কা ও পিঁয়াজ পিশিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে বড়া ভাজিলে ভাল বড়া হইবে। চারিটা ডিমে এক তোলা এরারুট দিলেই চলে।

পোস্তের দানা ভাল করিয়া পিশিয়া কচি কলা পাতাতে রাখিয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়া ভাতে সিদ্ধ করিতে হয়; তৎপর নামাইয়া সর্ষপ তৈল, কাঁচা লঙ্কা; লবণ মাখিয়া গরম ভাতে খাইতে বড়ই সুস্বাদ।

পৃষ্ঠানুরূপ ডিমের সহিত মসলা মিশ্রিত করিয়া গ্ল্যাসে একটু তৈল মাখিয়া এই ডিম গ্ল্যাসে ভরিয়া অল্প আগুনের তাপে রাখিতে হয় কিছুক্ষণ বাদ গ্ল্যাসের ভিতর ডিম জমাট হইলে ঢালিয়া গোল গোল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ঘৃতে ভাজিলে সুন্দর ভাজা হইবে।

হাঁসের ডিমের সহিত লঙ্কা পিঁয়াজ হলুদ ধনে বাটিয়া লবণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে, পাতলা বাটিতে করিয়া একটা কড়াতে জল দিয়া এই ডিমের বাটি কড়ার জলে ভাল করিয়া বসাইতে হইবে। ২।৩ ঘণ্টা খুব জ্বাল দিলে ডিম বাটিতে জমাট বাঁধিবে; পরে নামাইয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ভাজা করিয়া আলু ও কাঁচা কলার সহিত ডালনা প্রস্তুত করিতে হয় কিম্বা ভাজাও করা যায়। ডিম বাটিতে দেওয়ার পূর্ব্বে বাটিতে একটু তৈল মাখিয়া লইতে হয়।

গল্‌দা চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়াইয়া

উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে, তৎপর খুব ছোট করিয়া কাটিয়া লঙ্কা, সরিষা, হলুদ বাটা, লবণ ও তৈল মাছে মাখিয়া যে ডাব নারিকেলে অল্প নারিকেল হইয়াছে সেই নারিকেলের খোসা সুন্দর করিয়া ফেলিয়া প্রথমে নারিকেলটার মুখের দিকটাতে অল্প একটু ছিদ্র করিয়া এই মাছ ভরিতে হইবে; তৎপর ছিদ্রটা ময়দা দিয়া বন্ধ করিতে হয়। মাটি গুলিয়া এই নারিকেলটায় বেশ পুরু করিয়া লেপিতে হইবে, তৎপর কয়লার আগুনে পোড়াইতে দিবে অর্দ্ধ ঘণ্টা বাদ উঠাইয়া ভাঙ্গিয়া লইলে অতি সুন্দর নারিকেল-চিংড়ি হইবে। বলা বাহুল্য মাছ নারিকেলে ভরিবার সময় নারিকেলের জল ফেলিয়া দিতে হয়। নারিকেল ও মাছ গলিয়া উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইবে। কাঠের আগুনেও পোড়া হয় কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নির তাপ দিতে নাই।

সংবাদ।

জনরব, আমাদের মাননীয়া বর্ত্তমান বড়লাট-মহিষী শীতাগমে পিতৃদর্শনে আমেরিকা যাত্রা করিবেন।

জাম-নগরের রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে হিন্দুদিগের পূজা পার্ব্বণ দিবসে কোন প্রকার প্রাণিবধ হইতে পারিবে না এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

লাহোরের শিখ সর্দ্দার দয়াল সিংহের উইলের মামলায় বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আইনের চক্ষে শিখও হিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহে। শিখ-হিন্দু বা খাঁটি হিন্দু যদি ব্রাহ্ম হন, তাহা হইলেও হিন্দু থাকেন; কেন না শিখ ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মও আইনের চক্ষে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে।

আদরিণী জননীর আর একটী আদরের কন্যা অমরধামে জননী-অঙ্গে মিশিলেন। স্বদেশগৌরব শ্রদ্ধেয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বড় আদরের দুহিতাটী গত ২৮শে ভাদ্র সোমবার হৃদ্‌রোগে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু যে আত্মা-বিহঙ্গ চিদাকাশে উড়িবার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে কি সুবর্ণ শৃঙ্খলে ভবপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা কখনও সম্ভব?

সারভিয়া রাজ্যের অধিকাংশ সৈন্যই নূতন রাজা কারা জর্জ্জ বিচকে জানাইয়াছে, যে রাজা আলেকজাণ্ডার ও রাণী দ্রাগার হত্যাকাণ্ডে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না করিলে তাহারা (সৈন্যেরা) নিজেরাই সে বিষয়ে যত্নবান হইবে। শুনা যায়, হত্যাকারীদিগের হৃদয়ে ইহাতে আতঙ্কের সঞ্চার উপস্থিত হইয়াছে। সেনাপতিদিগের মধ্যে নাকি অধিকাংশই এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন।

একেশ্বরবাদিদলভুক্তা ইংলণ্ডবাসিনী

মিস্ কব্ আমাদিগের স্বর্গগত পরম পূজনীয় আচার্য্য দেবের একজন বিশেষ সুহৃৎ। আচার্য্য দেবের প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আচার্য্যদেবের জীবিতকালে অনেক সময়ই পরস্পর পরস্পরের নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মই তাঁহাদিগের সখ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্প্রতি মিস্ কব্ আচার্য্য দেবের স্বহস্ত লিখিত কতকগুলি লিপি বোম্বাই প্রদেশস্থ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" (East and West) নামক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল পত্রে কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধীয় আমূল বৃত্তান্তের ব্যাখা অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ কুচবিহার বিবাহের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে উৎসুক হন, তাহা হইলে উক্ত পত্রিকা পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। কলিকাতা থ্যাকার স্পিন্ক কোম্পানীর দোকানে উক্ত পত্রিকা পাওয়া যায়।

স্বর্ণরেণু।

যে পরিশ্রম করে না সে রোগকে ডাকিয়া আনে, তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয়। আলস্য আর আত্মহত্যা একই।

ছোট ছেলেরা যখন যাহা চাহিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দেওয়া ভাল নয়। অনেক মাতা সন্তানের সকল আব্দার শুনিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে তাহাদের অনিষ্ট বই আর কিছু হয় না।

হয় কোন কার্য্য করিবে না, আর যদি আরম্ভ কর তবে তাহা শেষ করিবে। যে প্রায় শেষ করিতে না পারে সে অতি অশ্রদ্ধাভাজন।

সেই অনন্তকাল যাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত এবং প্রাণ স্তব্ধ হয় ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহা আনন্দের ব্যাপার। এই জন্য যে দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং সেই অনন্তকালসাগরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

বিনীত নিবেদন।

১৩১০ সালের বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় মূল্য দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন নাই। কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

২৬ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১০। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. OCTOBER, 1903. No. 6.

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নারী জাতির বিশেষ ভাব ...	১২১	দুই ভগিনীর কথোপকথন ...	১৩৯
সেবা ...	১২৪	প্রাপ্ত ...	১৪০
পত্য ...	১২৫	পাক বিধি ...	১৪১
সাচ্চা গিনি ও ঝুটা গিনি ...	১২৬	Selections ...	১৪২
ক্ষুদ্র পাতিয়ার জীবন ...	১৩৩	বিবিধ প্রসঙ্গ ...	১৪৪
প্রকৃতি ও জীবন ...	১৩৫	স্বর্ণরেণু ...	১৪৪
আমিত্ব বিনাশ ...	১৩৬		

কলিকাতা,
৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;
আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga: Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays: Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
Ditto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

		মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ ...	১৲
১৯ ঐ	২য় ভাগ ...	১৲
২০ ঐ	৩য় ভাগ ...	১৲
২১ ঐ	৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২ ঐ	৫ম ভাগ ...	১৲
২৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪ জীবনবেদ	...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	...	
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	১ম ভাগ ...	
২৭ ঐ	২য় ভাগ ...	
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে		
২৯ সেবকের নিবেদন	১ম ও ২য় খণ্ড	
৩০ ঐ	তৃতীয় খণ্ড ...	
৩১ ঐ	চতুর্থ খণ্ড ...	
৩২ ঐ	পঞ্চম খণ্ড ...	
৩৩ নবসংহিতা	...	
৩৪ মাঘোৎসব	...	
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল)	১ম ভাগ ...	
৩৬ ঐ ঐ	২য় ভাগ ...	
৩৭ ঐ ঐ	৩য় ভাগ ...	
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর)	১ম ভাগ	
৩৯ ঐ	২য় ভাগ ...	
৪০ ঐ	৩য় ভাগ ...	
৪১ ঐ	৪র্থ ভাগ ...	
৪২ ঐ	৫ম ভাগ ...	
৪৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ ...	
৪৪ ঐ	৭ম ভাগ ...	
৪৫ ঐ	৮ম ভাগ ...	
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ	...	
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১ম ভাগ	
৪৮ ঐ	২য় ভাগ ...	
৪৯ প্রেম কুসুম	...	
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	...	
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী	...	
৫৩ সুখী পরিবার	...	
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা	১ম ভাগ ...	
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	...	
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	...	
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	...	

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.

A few slightly soiled books can be had, for a few days only, at Half Price. For ther particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা আশ্বিন ১৩১০, অক্টোবর ১৯০৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিনীত নিবেদন।

১৩১০ সালের বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় মূল্য দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন নাই। কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

নারীজাতির বিশেষ ভাব।

বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে জগদ্গুরু পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে যে, যাঁহারা সংসারের মলিন সুখে মত্ত ছিলেন, সেই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে এখন ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার হইতে হইবে। নরনারী একত্র হইয়া পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে, স্বর্গীয় সুখ কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় দিতে হইবে। স্বর্গ কি তাহা দেখিবার জন্য পর্ব্বতে যাইতে হইবে না, অথবা পুস্তকের মধ্যে কিংবা কোন লোকের কাছেও শিখিতে হইবে না; কিন্তু ঘরের ভিতরে ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া বসিয়া পিতার প্রেম সাধন করিলেই আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। ঈশ্বরের এই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমরা কয়জন একটি পরিবার সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা ছাড়িলে আমাদের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। এই পরিবার মধ্যেই আমাদের মুক্তি। ভগ্নিগণ, বিশেষরূপে তোমরা যাহাতে এই কথা বুঝিতে পার, সেই জন্য দয়াময় ঈশ্বর আজ এই ব্রাহ্মিকা সমাজে তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন। এই নিমন্ত্রণের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। যিনি তোমাদিগকে এত ভাল বাসিয়া এই বিশেষ বিধান প্রেরণ করিলেন, তাঁহার প্রতি যেন ভক্তি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তাঁহার কার্য্যে নিরুৎসাহ এবং অলস হইয়া থাকিও না। স্বামী, ভ্রাতা এবং বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যাহাতে অচিরে প্রেমপরিবার হয়, তাহার জন্য তোমরা বিশেষরূপে যত্নবতী হও।

তোমাদের প্রতি প্রথম উপদেশ এই যে পুরুষেরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তোমরা তাহার অনুকরণ করিও না। পুরুষদিগের সকল কার্য্যে যোগ দিলে কদাচ তোমাদের নারী প্রকৃতির উন্নতি হইবে না, বরং অনেক সময়ে তোমাদের জীবনের দুর্গতি এবং অশান্তি হইবে। পুরুষদিগের জন্য ঈশ্বর আপনার উদ্যানে যে ফুল সৃজন করিয়াছেন, তাহা তোমাদের জন্য নহে, আবার তোমাদের জন্য তাঁহার স্বর্গে যে ফুল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহাও পুরুষদের জন্য নহে, অতএব তোমাদের জন্য যে ফুল তাহা তোমরা বাছিয়া লইবে। সকল বিষয়ে পুরুষদের অনুকরণ করিলে, তোমাদের জীবন বিকৃত হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা ইহা নহে যে পুরুষদের মধ্যে যত প্রকার ভাব আছে সকলই তোমরা গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর পুরুষদিগকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন তাহা কেবল পুরুষদিগেরই জন্য তোমাদের জন্য নহে। অতএব কি পিতা, কি আচার্য্য, কি স্বামী, কি ভ্রাতা, পৃথিবীতে যাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কর, কেহই তোমাদের নারীপ্রকৃতির আদর্শ হইতে পারেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে কোন পুরুষ তাঁহার এবং তোমাদের মধ্যবর্ত্তী হন। তিনি স্বয়ং তোমাদের গুরু। সে গুরুকে গুরু বলিয়া তোমরা আদর করিবে, সেই পিতাকে পিতা বলিয়া তোমরা ভক্তি করিবে। পরিত্রাণের পথ তিনি যে প্রণালী দেখাইয়া দিবেন সেইরূপে চলিবে। একই উদ্যানে বিচরণ করিতে হইবে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে বসিতে হইবে। একই ঈশ্বরের দিকে যাইতে হইবে; কিন্তু তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা যাহাতে অধিক পরিমাণে হৃদয়ের কোমলতা এবং ভক্তি সাধন করিতে পার এই জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশেষ অধিকার দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকি, তোমরা তাঁহাকে মাতা বলিয়া ডাক। আমরা তাঁহার কাছে পুত্র হইয়া পুত্রের উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া কৃতার্থ হই তোমরা তাঁহার কন্যা, সুতরাং তিনি তোমাদের নিকটে তাঁহার কন্যার উপযুক্ত প্রেমভক্তির উপহার প্রত্যাশা করেন। অতএব স্বামী কিংবা কোন ভ্রাতার অনুরোধে পড়িয়া, কেহই পুরুষের কার্য্য করিও না, যাহা তোমাদের কার্য্য, তোমাদের স্বর্গের মাতা ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন, কেবল সেই সমুদয় কার্য্য করিলেই তোমাদের পরিত্রাণ। পুরুষদের মুখাপেক্ষা করিয়া আছ বলিয়া তোমরা নিজের নিজের কার্য্য দেখিতে পাইতেছ না। ঈশ্বর প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন্ তোমরা চক্ষু খুলিবে, চক্ষু খুলিলেই দেখিতে পাইবে, তিনি তোমাদের প্রতিজনের জন্য এক একটি বিশেষ ব্রত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কেহই বলিতে পারেন না, ঈশ্বরের গৃহে আমার কার্য্য নাই। গরিব, ঘৃণিত, দুঃখী, তাপী, প্রতিজনেরই কার্য্য আছে। প্রত্যেকের উপরে এক একটি কার্য্যভার রহিয়াছে।

ভগ্নীগণ! তোমাদের বয়স হইয়াছে, আর বালিকার মত ব্যবহার করিও না। গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের কার্য্য তোমরা কর, তোমরা পরিত্রাণ পাইবে, আমরাও দেখিয়া সুখী হইব। তোমরা কি মনে কর যে অলঙ্কার পরিবার জন্য, অথবা স্বামীর চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য তোমরা পৃথিবীতে আসিয়াছ? না, তোমরা আসিয়াছ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, তোমাদের জন্য নহে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর জন্য। তোমাদের শরীর মন হইতে যাহা কিছু সেবা ও ভক্তির উপহার দিবে তাহা পৃথিবী গ্রহণ করিয়া উন্নত হইবে। তোমরা কয়টি লোক যে কেবল তোমাদের জন্য বাঁচিয়া আছ তাহা নহে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে শুভ বুদ্ধি, জ্ঞান ও বল দিতেছেন তাহা এই জন্য যে তোমরা তাঁহার অনুগত দাসী হইয়া সমস্ত জগৎকে তাহা বিতরণ করিবে। তোমাদের শরীর মন পরিপুষ্ট কেন হইতেছে? এই জন্য যে তোমরা সেই বল, সেই ক্ষমতা, সেই উৎসাহ জগতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিবে। যাহারা অন্যের জন্য ভাবে না সে সকল স্বার্থপর ব্যক্তিদের জন্য এ বিধান নহে। যাহারা আপনার জন্য বাঁচিয়া আছে এবং কেবল আপনার জন্য ভাবে, তাহারা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত নহে। ভগ্নীগণ, যে জীবন তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য পাইয়াছ সে জীবন তোমরা ঘরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, তোমাদের এমত অধিকার নাই। যাহাতে জগতের সমুদয় নরনারীর অধিকার, তাহা কিরূপে তোমরা আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিবে? স্বার্থ দূর করিয়া জগতের সেবা কর। এইবারে ঈশ্বর যাহাকে যে টুকু কার্য্য দিবেন, ভক্তির সহিত তাহা করিবে। নিজের চিন্তা আজ হইতে ছাড়, পরের জন্য এই জীবন ইহা বিশ্বাস কর। তোমাদের প্রত্যেকের জীবন এই আশ্রমের জন্য, সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য, পৃথিবীর সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং সমুদয় ভগ্নীমণ্ডলীর জন্য, প্রাণের সহিত এই সত্য গ্রহণ কর। ঈশ্বরের এই ব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি যখন যাহা বলিবেন তাহা করিবে। নির্জ্জীবতাকে ভয়ানক পাপ এবং নিরাশাকে সাংঘাতিক গরল জানিয়া এ পরিবার হইতে দূর করিয়া দাও। তোমরা প্রতিজন ঈশ্বর হইতে এক একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনের আদর্শ সাধন করিবে, এই জন্য ব্রাহ্মিকাসমাজের পুনরুদ্দীপন হইল। আশার সহিত ইহাতে যোগ দাও। এই ব্রাহ্মিকাসমাজ দেশের মঙ্গলের জন্য যেন একটি অসাধারণ দুর্জ্জয় বল হয় ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য ইহা দ্বারা যাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা উপযুক্ত বল ও জ্ঞান লাভ করেন তিনি এইরূপ শুভ বিধান করুন। তাহা হইলে তোমরা সংসারের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং অমৃত ফলভোগ করিয়া সকলের জীবন কৃতার্থ হইবে। * * *

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

সেবা।

প্রকৃত সেবা কাহাকে বলে? সেবা কয় প্রকার? সেবার নিমিত্ত সেবিকার কি প্রকার ব্রতাবলম্বন প্রয়োজন তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। কারণ মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই এই পবিত্র ব্রত প্রতিপালনের উপযুক্ততা লাভের অধিকারী হইতে পারেন না। যে হেতু যাহারা স্বার্থপরতা রোগে নিপীড়িত তাহারা পীড়িত হইয়া পীড়িতের সেবা কি প্রকারে করিবে। নিঃস্বার্থ প্রেম সহকারে যাহা করা যায় তাহাকেই প্রকৃত সেবা বলি। সকল মনুষ্যেরই সেবা একটি জীবনগত উচ্চতম ব্রত, ইহা বাহ্য ব্যাপার নহে, আন্তরিক লুক্কায়িত প্রেমের বিকাশ মাত্র জানা যায়। যাঁহারা পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, প্রভৃতির শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ মাত্র বিধান করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, জগতের আর কোন দুঃখ কষ্ট যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না, তাঁহাদের সেবা অতি নিকৃষ্ট। পরমেশ্বরের সৃষ্টিব্যাপারের দিকে দৃষ্টিপাত কর সেবাধর্ম্মের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। গগন মণ্ডলে নিশানাথ সুনির্ম্মল প্রভা বিকীরণ করিয়া তাপিতের তাপ হরণ করিতেছেন। দিবাকরও শীত-বিকম্পিত প্রাণীর সেবা-সম্পাদনার্থে কিরণজাল বিস্তারিত করিয়া রহিয়াছেন। এই সেবা-ব্রতাবলম্বী সমীরণ নিয়ত সঞ্চালিত হইতেছে। শৈল নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীও অবিরত ধারে দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়া তৃষাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। দারিদ্র্য-নিপীড়িতের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যত্নবতী গাভী সকল নিপীড়ন নিঃশব্দে সহ্য করিতেছে। নিঃস্বার্থ প্রেমের দায়িত্বভারে ভারাক্রান্ত হইয়া সরোবরে কুমুদ কেমন হাসিয়া ফুটিয়া নিরুৎফুল্ল চিত্তকে প্রোৎফুল্লিত করিয়া সেবার প্রতিভা বিকাশিত করিতেছে। কত শত শত শ্রান্ত, ক্লান্ত, রুগ্ন, শুষ্ক প্রাণিপুঞ্জও মনমোহিনী বিশ্বাধিষ্ঠাত্রীর মধুময় শান্তিক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইহাই প্রকৃত সেবা, আড়ম্বর নাই,—পাত্র নির্ব্বাচন নাই, সেবক আত্মবিক্রয় করিয়া নীরবে বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট প্রেমপথে চলিয়াছে। সেবায় যাহার ইতর বিশেষ রহিল, তাহার আর সেবা কি? সেবায় যিনি ক্লান্ত হইলেন তাঁহারই বা সেবা কি? সমীরণ চিরদিনই প্রাণবায়ু যোগাইয়াছেন ও যোগাইবেন, দিবাকর চিরদিনই জীবজগতে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন ও করিবেন, ইহাঁদের সেবায় বিরাম নাই, বিতৃষ্ণা নাই; ইহাই সেবা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ। কত মহিমাময় পুরুষ, কত মহীয়সী মহিলা স্বস্ব জীবনে এই আদর্শ প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। সেবা বিশেষত নারীজীবনের গৌরব, কারণ মাতৃত্বই নারীজন্মের সার্থকতা। প্রাতঃস্মরণীয়া লীলাবতী, দৈবাহুতী, সীতা, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি রমণীরত্নগণ পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদিতে অনাসক্ত থাকিয়া নিঃস্বার্থ সেবানুরাগে রঞ্জিতা হইয়া, মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া আপনাপন পবিত্র জীবন ছবি, অধুনাতন সভ্য নারীসমাজের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছেন। নিঃস্বার্থ প্রেমে সেবাই তাঁহাদিগের একমাত্র ব্রত ছিল। কিন্তু আমাদিগের সে প্রকার সেবানুরাগ কই? ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সেবানুরাগে রঞ্জিত স্বার্থশূন্য প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেবাব্রতে জীবনোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজবংশীয়া ভগ্নী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, স্যারা মার্টিন এবং কুমারী ক্যাথারাইন্ প্রভৃতি রমণীগণের আত্মনিপীড়িত দুশ্চরিত্র পাপী কারাবাসীদিগের সেবার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া স্বার্থপরতার প্রাচীর ভাঙ্গিতে এখনও কি বদ্ধপরিকর হইতে পারিবে না? মুক্তিপথের সাধন অসংখ্য, কিন্তু সেবার ন্যায় বুঝি প্রাণানন্দকর সাধন আর নাই। ক্ষুধিত যখন অন্নলাভে পরিতৃপ্ত হয়, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ পথিক যখন বারিপানে তৃষ্ণা দূর করে, শীতের তাড়নে অস্থির মুমূর্ষু রোগী যখন শুশ্রূষাকারীর স্নেহপূর্ণ মুখের দেবভাব অবলোকন করিয়া মোহিত হয়,—তখন কে বলিবে সেবকও সেবাকর্ম্মের মধ্যে আনন্দময়ীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না? সেবার ন্যায় বুঝি সহজ ধর্ম্ম আর নাই। পাপকলুষপূর্ণ মানবজীবন স্বীয় অসারতায় লজ্জিত হইয়া যে স্বভাবতঃই বিনীতভাবে সেবাধর্ম্মের শীতল ছায়ায় জুড়াইতে চাহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ভক্তিমার্গ যেমন নাম সাধন, কর্ম্মমার্গ তেমনি সেবা। উভয়েরই পরিণাম ব্রহ্মলাভ; চাই কেবল আন্তরিকতা।

শ্রীমতী তরঙ্গিনী ঘোষ (হরিপাল)

পদ্য।

(হিন্দুমহিলা রচিত)

কোথা আছ প্রেমসিন্ধু পতিতপাবন
তোমাকে হৃদয় কেন হয় বিস্মরণ?
তোমা ভিন্ন অন্য দিকে মন নাহি যায়
সতত তোমারে ভাবি তোমার কৃপায়।
তোমা ভিন্ন অন্য সুখ নাহি এ সংসারে
এই কথা সদা দেব বুঝাও অন্তরে।
এখন রহিল খোলা অর্থের দ্বার
তবে আর কিরূপেতে হইব উদ্ধার?
এখন প্রবলরূপে রহিয়াছে মায়া
তবে প্রভু কিরূপেতে করি শুদ্ধ কায়া?
কায়া দেহ অচল হইল ভাবি এই মনে
নাহি ভোলে জগতের দেখে প্রলোভনে;
আশা কুহকিনী আছে মায়ার সহায়
সেইত কত প্রকারে আমায় নাচায়।
কুমতি কুমন্ত্রী হয়ে দিতেছে মন্ত্রণা
তাহাতেই ঘটিয়াছে এতেক যন্ত্রণা;
কখন দেখায় স্থান অতীব সুন্দর
কত সুখ কত শান্তি কত সিদ্ধ নর।
তখন ভাবি এইখানে কাটাইব কাল
এখানে আসিতে নাহি পারিবেক কাল;
এই সার ভেবে শুদ্ধ করি মন প্রাণ
একবার দেখা দাও কোথা ভগবান।
হেন কালে কুরুচির দল কোথা হ'তে
আসিয়া লইয়া যায় অন্ধকার পথে;
বেত্রাঘাত করে আর কেশ ধ'রে টানে
কতেক সহিব আর এ দুর্ব্বল প্রাণে?

এসময় কোথা প্রভু ওহে সারাৎসার
একবার আসি দশা দেখহ আমার।
আহা মরি প্রাণ যায় বিদরয় বুক
কেন নাথ অধিনীরে হইলে বিমুখ?
একমাত্র অবলার সহায় সম্বল
কেবল তোমার প্রভু চরণকমল॥
শুনহ মিনতি মম ওহে নিত্যানন্দ
ভক্তিবিহীন মনে অতি নিরানন্দ।
হৃদয় সহিত তব ভালবাসা চাই
এমন উপায় নাথ বল কোথা পাই?
কোন নামে কোন ধ্যানে তোমায় ডাকিব?
কেমনে ডাকিলে তব ভালবাসা পাব?
ভালবাসা দিব আর ভালবাসা পাব
ভালবাসায় গিয়া সদা সদানন্দে রব
পৃথিবীর ভালবাসা করিয়ে হেলন
কেমনে পাইব তব স্নেহ সম্ভাষণ?
নাহি জানি কি সম্বন্ধ তোমার সহিতে
ডাকিবার ভ্রমে বুঝি না পাই দেখিতে!
নিশ্চয় হইবে তুমি আপনার জন
নতুবা তোমার দিকে টানে কেন মন?
এজগতে ভাই বন্ধু প্রতিবাসী আছে
আদর নাহিক ডেকে যায় তব কাছে।
বিপদ সময় হোলে তুমি আপনার
"কোথা আছ দয়াময় ডাকি বারবার॥"
কোথা হ'তে আসিয়া হে প্রাণের ভিতরে
"ভয় নাই" ব'লে অমনি বুঝাও অন্তরে;
বিপদে পড়িয়ে যদি পাপী তোমায় ডাকে
"অধমতারণ" নামে মুক্ত কর তাকে।
আমিও পাতকী বটে ওহে ভক্তাধীন
না চাই উদ্ধার কিন্তু সম "অজামিন";
মৃত্যুকালে ডাকিয়ে সে হইল উদ্ধার
সেরূপ বাসনা প্রভু নহেত আমার।
আমার [illegible] এই হয় নিরন্তর
মুক্ত হইব আমি যেমন [illegible];
পাপে মুক্ত হ'য়ে থাকি এই ভূমণ্ডলে
শুদ্ধ আত্মা হয়ে সদা "রাম" নাম বলে।
সেরূপ আমার সাধ হয় মনে মনে
শুদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে রব তোমার চরণে;
এই দেহে থেকে প্রাণ হবে মধুকর
তোমার চরণ মধু পিবে নিরন্তর॥

সাচ্চা গিনি ও ঝুটা গিনি।

দার্জ্জিলিং পাহাড় হইতে ফিরিবার এক মাস পরেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। বড় দিনের ছুটিতে পত্নীকে লইয়া শ্বশুর-গৃহে গেলাম। বিবাহের পর এই প্রথম নূতন জামাই বাড়ীতে আসাতে অত্যন্ত ধুমধাম পড়িয়া গেল। আমার শ্যালিকা, বীণার খুড়তত ভগ্নী, নূতন ভগ্নীপতিকে জলযোগ করাইয়া বলিলেন, "প্রমথ বাবু, আপনার ঘড়ির চেনে এ সব কি ঝুল্‌ছে? দেখি, একটি হীরে বসান পেন্সিল, একটি সোনার কম্পাস্, আর একটা—এটা কি একটা নূতন পয়সা?"

প্রমথ বাবু বলিলেন, "তা বেশত। কিছু দোষ আছে কি?"

"তা কি বল্‌ছি! কিন্তু কেন রেখেছ তাহা বল্‌তে কি দোষ আছে?"

"উহা একটা charm।"

"কি রকম চার্ম?"

"বিয়ের দিন রাত্রে তোমার দিদি আমার চেনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।"

"না, মিথ্যা কথা।"

"না সত্যি স্বামী বশ করবার মন্ত্র প'ড়ে তোমার দিদি জেদ করে পরিয়ে দিলেন।"

আমার শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা আর কিছু বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহার উপহাসের জ্বালার ভয়ে বলিতে সাহসও হইল না, কিন্তু যদি কেহ শুনিতে চাহে তাই বলিতেছি।

আমি বিলাত না গিয়াই ষোল আনা সাহেব ছিলাম, কাজেই মাঝে মাঝে বিলাতি দোকানে যাইতে হইত—সেলের (sale) সময়ত কথাই নাই। গ্রীষ্মের উপযুক্ত কয়েকটা কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, তাহা কিনিবার নিমিত্ত Whiteaway'র দোকানের জন্য বাহির হইলাম। এই দোকানে (chronic state of sale) সেল্ চলিত, রোগটা কখনও বেশী কখনও কম। আজ দেখিলাম আর এক সেলের বিজ্ঞাপন দোকানের দেওয়ালে রহিয়াছে। এখান হইতে দুচারখান জিনিষ কিনিয়া অন্য দুএক দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় Harrison Hathaway'র দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম (half price) অর্দ্ধেক মূল্যের সেল হচ্ছে। ইংরাজ সাহেব মেম, বাঙ্গালি সাহেব মেম, পার্সি, বাঙ্গালি বাবু, মাড়ওয়াড়ি, দর্জি মহাশয়, চান্দনির দোকানদার ইত্যাদিতে ঘরগুলি পরিপূর্ণ, নড়িবার জায়গা নাই। দর্জি, মাড়ওয়াড়ি ও দোকানদারগুলি কাপড়ের থান যে টেবিলের উপর রাশীকৃত ছিল, তাহা আক্রমণ করিয়াছেন। মেমগণ লেস ফিতা ইত্যাদির নিকট মৌচাকের চতুর্দ্দিকে মৌমাছির ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন, বাঙ্গালি বাবুগণ সস্তা দরে বিলাতি বুট ও জুতা আনন্দিত মনে উৎসাহের সহিত কিনিতেছেন, সাহেবগণ এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত সস্তা একটি রেসমের ছাতা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহা কিনিয়া, দোকানের সাহেবের হাতে একটা গিনি দিয়া, ফেরত টাকার জন্য কাউণ্টারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম।

সে বৎসর সরকার গরিব ভারতবাসীদিগের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা (গিনি) বিতরণ করিয়াছিলেন। একজন দ্বারবান বা পাখা-কুলি চারি মাসের মাহিনা হইতে অতি কষ্টে ষোলটি টাকা সঞ্চয় করিয়া সুদূর গ্রামে তাহার জননী বা পত্নীকে মনি-অর্ডার পাঠাইলে, সেখানে তাহার হাতে ডাকওয়ালা একটি গিনি ও একটি টাকা দিয়া আসিত। সে দুঃখিনী জন্মে একবার সোনা স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিত, কিন্তু তাহা পুনরায় ভাঙ্গাইতে গিয়া প্রাণান্ত হইত ও পাঁচটি বা ছয়টি পয়সা ব্যয় করিতে হইত।

আমি ভাবিলাম বেশ হয়েছে এখানেই গিনিটা ভাঙ্গান হইবে। চারিদিকে কি হইতেছে তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় সাহেব আসিয়া কহিল, "মশায় এ গিনিটা কি রকম?"

(Sir this guinea looks queer) আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহা হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম যথার্থ queer, কারণ ইহা গিনি নহে, একটি মাজা ঘসা ঝক্‌ঝকে নূতন পয়সা! আমার পার্সে গিনি রাখিয়াছিলাম, পয়সাটা কি করিয়া আসিল! তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম যে আমার পূজনীয়া বোঠানেদের মধ্যে কাহারও কাণ্ড। আমি পয়সাটা রাখিয়া, একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলাম। সাহেবটি আমার মুখ-প্রতি তীক্ষ্ণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চেঞ্জ (change) আনিতে গেল। এমন সময় আমার পার্শ্বে কাউণ্টারের সম্মুখে আর একজন আমারই মত বাঙ্গালি সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বা অধিক হইবে, তাঁহার পশ্চাতে এক চৌদ্দ পনের বৎসরের বালিকা সলজ্জ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রতি আমার মন ও চক্ষু আকৃষ্ট হইল। নাটক নভেলে নায়িকার ন্যায় ইহার যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, নিখুঁত মুখমণ্ডল তাহা বলিতে পারি না, তবে এমন অনির্ব্বচনীয় কমনীয় কোমল লাবণ্যময়ী মুখশ্রী আর কখনও দেখি নাই। আধুনিক বিলাতপ্রত্যাগত সমাজের ন্যায় বেশ ভূষা, মস্তক অনাবৃত, ঘন মুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠ ছাইয়াছে, একটি সরু জরীর ফিতা মস্তকে বাঁধা রহিয়াছে। বালিকা এত লোকের মধ্যে যেন জড় সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একজন বেহারা বাবুর বিবিধ আকারের চারি পাঁচটা পার্সেল লইয়া আসিল, তখন তিনি একটি ৫০৲ টাকার নোট একজন সাহেবের হাতে দিলেন। সে হিসাব করিয়া একটি গিনি এবং কয়েকটা টাকা ও পয়সা ফিরাইয়া বাবুর সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। ঠিক এই সময় দোকানের একজন মেম ঠক্ ঠক্ ক'রে বাবুর ও আমার মাঝখানে আসিয়া কেরানী বাবুকে কি একটা তাড়াতাড়ি বলিয়া একখানা কাগজ ফেলিয়া ফিরিলেন। মনে হইল যেন একটি ছোট রকম ঝড় বহিয়া গেল। এমন সময় অন্য সাহেব আমার হাতে আমার ফেরত টাকা ও রেজকী দিয়া গেল; আমি অন্যমনস্কভাবে পার্সে ভরিলাম কিন্তু উহা বন্ধ করিতে আর সময় পেলাম না। ঠিক সেই সময় মেমের নূতন ফ্যাসনের পাঞ্জাবি কুর্ত্তার ন্যায় আস্তিনের এক ঝাপটা লাগিয়া টেবিলের উপরে বাবুর টাকা পয়সা ও গিনি সমুদায় ঝনাৎ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মেমটি মধুর স্বরে বলিলেন, "Oh I beg your pardon" এবং সে স্থান হইতে সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া গেলেন। বাবু এদিকে ঝুঁকিয়া কুড়াইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঝুকিলাম; আমার খোলা পার্সের সমুদায় এবার ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল। তখন আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কত ছিল?"

"একটা গিনি ও সাড়ে চারিটা টাকা।"

আমি সব একত্র করিয়া তাহার পর তাহার হাতে একটি গিনি ও চারি টাকা আট আনা দিয়া নিজের পার্সে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা ভরিলাম। এদিকে দোকান বন্ধ হইবার সময় হইয়াছে, দুই তিন জন দোকানের সাহেব মেম তাহাদের অধৈর্য্য স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছিল। আমি আর একবার বালিকার সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমার ছাতা হাতে লইয়া প্রস্থান করিব এমন সময় বাবুটি উচ্চৈস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "I say, how's this? What did you give me? This is not a guinea!"

আমি একটু থমকিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম সত্য গিনি নহে, আমার সেই লক্ষ্মীছাড়া পয়সাটা; বোধ হয় উঠাইবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ও তাড়াতাড়িতে এই ভুলটা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে সাহেবকে ভুলক্রমে উহা দিয়াছিলাম সে বিদ্রূপ ও সন্দেহযুক্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "Why, that's the very coin you gave me just now for a guinea!" (এইটাইত আপনি আমাকে গিনি বলিয়া দিয়াছিলেন।) ইতিমধ্যে চারি পাঁচ জন দোকানের লোক আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলের মুখে সন্দেহের ভাব। বাবু হাত বাড়াইয়া ঝুটা গিনিটা আমায় দিলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বিস্ময়পূর্ণ বিস্ফারিত নয়নে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িল, তাহার মুখ লাল হইল, আমি চারিদিকে পুনর্ব্বার চাহিলাম। মনে মনে বলিলাম "ধরণী দ্বিধা হও" কিন্তু ধরণী দ্বিধা হওয়াত সহজ ব্যাপার নহে, তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, "ডাইনেমাইট্ এক্সপ্লোসন হউক, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হউক, কলিকাতা জাহান্নমে যাক্, (Russian) "রাসিয়ান"রা এখনই আসুক!" আবার ভাবিলাম যে এক লাফ দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ি; কিন্তু হায় কিছুই হইল না! আমি সেখানেই নির্ব্বিঘ্নে বেষ্টিত হইয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম ও থতমত ভাবে কহিলাম, "উঠাইবার সময় গোলমাল হইয়াছিল বোধ হয়। এই নিন্ আপনার গিনি।"

"সুবিধা রকম ভুল!" এই কথা শুষ্ক ভাবে বলিয়া তিনি পার্সে ভরিলেন।

আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি পার্সে একটা গিনি রাখিয়াছিলাম, বোধ হয় বাড়ীতে কেহ ঠাট্টা করিয়া উহা বদলাইয়া দিয়াছিল, তাই আমি—"

"ওঃ তাই বুঝি আপনি ঠাট্টাটা আমার উপর চালালেন!" একটু বিদ্রূপের হাসি অধরে দেখা দিল। বালিকা তিরস্কারের স্বরে মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

একটি কথা কেবল, কিন্তু আমার কানে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। দেখিলাম আর কিছু বলা বৃথা। বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে একবার চাহিলাম, তাহার পর বোঠানকে কিরূপে জব্দ

করিব তাই ভাবিতে ভাবিতে কোন রকমে দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাড়ী গিয়া আমার দুই বোঠানকে সম্মুখে হাজির করিয়া খুব ঝগড়া করিলাম। ঝগড়াটা এক পক্ষীয় কারণ দুইজনেই হেসে হেসে কুটি কুটি হইলেন। যখন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন তখন একজন বলিলেন, "বাবা গেলুম!" আর একজন বলিলেন, "ঠাকুরপো কেমন জব্দ হয়েছেন আজ!" আমি খুব চটিয়া বলিলাম, "আচ্ছা দেখা যাবে, দুইজনেই পরে বুঝিবে।" এতক্ষণে আমার রাগটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল; আর সেই মধুর কণ্ঠস্বরের একটি কথা "বাবা!" কানে লাগিয়াছিল, সেই মুখ কেবল মনে আসিতেছিল; মেজজাটা শিগ্‌গিরই ঠাণ্ডা হইল। তখন বলিলাম, "আচ্ছা এখন তোমাদের আনন্দটা যদি একটু ক'মে থাকে তবে এখন বল ত কে করেছে, এই কাজটা?" কেহ কিছু স্বীকার করিল না। তখন বলিলাম. "যদি Sherlock Holmesএর মত Detective) ডিটেক্‌টিভ হতুম, তা হ'লে এখনি বলে দিতে পার্‌তাম।"

ছোট বোঠান চোখ দুটি বড় করিয়া বলিলেন, "সে আবার কি?"

"Sherlock Holmes ব'লে একজন ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ ছিল; তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল। সে খুনের বা ডাকাতির স্থানে যাইয়া একটা কাগজের টুকরা বা একটা পয়সা উঠাইয়া বলিয়া দিত, "যে যাহার এই কাগজ বা পয়সা তাহার এক চোখ কানা, লাল চুল, ৪০ বৎসর বয়স, বেঁটে, রাগী, আর খুব দুধ খায়।" তার এমন শক্তি যে ঐ কাগজটা দেখিয়াই এই সব বাহির করিত।"

"যাও, আর গাঁজাখুরি গল্প বকে না।"

"সত্যি বোঠান, এ রকম একটা লোক ছিল। আচ্ছা Count of Monte Cristoর গল্পটা বলা শেষ হ'লে, এই বইয়ের গল্প বলিব। কিন্তু আজকের কথা ভুলছি না, এর শোধ নেবো।" আর বাস্তবিকই লইয়াছিলাম। এই খানে বলিয়া রাখি যে আমি মাঝে মাঝে বোঠানদের ছুটীর সময় কোন ইংরাজি বইয়ের গল্প বলিতাম।

তার পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা পড়িতে হঠাৎ আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। একটি প্যারাতে লেখা আছে, "The dangers of shopping in English shops—তাহার মর্ম্ম এই যে আজ কাল বিলাতি দোকানের সেলে নানাপ্রকার লোক যায়। জুয়াচোর ভদ্রলোক, সাহেব সেজে যায়। গত কল্য সন্ধ্যা বেলা একজন লোক একটি পয়সা গিনি বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছিল ইত্যাদি।" প্যারাটার নিম্নে নাম ছিল "By one who knows" আমি নীরবে একা একা ইহা তিনবার পড়িয়া, উহা কাটিয়া বাহির করিয়া আমার বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। আর সেই লোকটি ও তাহার কন্যা কে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল।

তিন চারি মাস পরে আমি পূজার ছুটীতে দার্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বেড়াইতে

গেলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমি একটি বেঞ্চে বসিব ভাবিতেছি—দেখিলাম নিকটেই এক বেঞ্চ দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহার উপর দুইজন উপবিষ্ট, পুরুষ কি রমণী হঠাৎ ক্ষীণ আলোকে বোঝা গেল না। যখন একেবারে নিকটে গেলাম তখন থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম দোকানের সেই ব্যক্তি ও তাহার কন্যা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। ভদ্রলোকও আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনিলেন, আমার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি, তুমি আবার দেখা দিয়েছ?"

আমি অতি ভদ্রতার সহিত কহিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখানে বসিতে পারি?"

"অবশ্য, বসিবে না কেন, ইহা ত আমার বেঞ্চ নহে।" বলিয়া তিনি কন্যাকে ঠেলিয়া দুইজনে একেবারে এক কিনারায় গিয়া সরিয়া বসিলেন।

"আপনার যদি আপত্তি থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

"না, সরকারি বেঞ্চে কেহ বসিবে তাহাতে আর আপত্তি কি, তবে practical jokes (ঠাট্টা) পছন্দ করি না, আর কোন আপত্তি নাই।"

"আপনি দেখিতেছি, সে কথা এখনও ভুলেন নাই, কিন্তু—"

"না আমার স্মৃতি শক্তিটা খুব ভাল।"

"সে দিনকার ঘটনাটা যে একটা মস্ত ভুল, আমি কে, তাহা একবার শুনিলে বোধ হয় আর অবিশ্বাস করিবেন না।"

"মহাশয়, আমার এখন ওসব ইতিহাস শুনিবার সময় নাই। চল্ বীণা, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কন্যা একবার চকিতদৃষ্টিতে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া পিতার সহিত চলিল। সে চাহনিতে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—যেন বলিতেছে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিছু মনে করো না।" অবিলম্বে পিতা ও কন্যা অক্‌ল্যাণ্ড রোডে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে কালই ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্ম পরিচয় দিব ও কলঙ্ক দূর করিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমার পিতার বন্ধু ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের পরিচিত। উক্ত ডাক্তার আমার ন্যায় স্যানিটেরিয়ামে ঘর লইয়া ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে একটি পত্র letter of introduction লইলাম। আহারের পর জলাপাহাড়ে বীণার পিতার বাড়ী Cecil Cotএ গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীণা বাহিরে একখানি বই হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র মুখ লাল হইয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি টুপি তুলিলাম কিন্তু ততক্ষণে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একটু পরে তাহার পিতা বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "কি হে, আবার এখানে এসেছ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ, আশা করি আরও অনেক বার আসিব।"

"বটে ?"

"এ চিঠিটা অনুগ্রহ করিয়া পড়ুন।"

তিনি কৌতূহলী হইয়া হাতে লইয়া খুলিয়া পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে, চোখ তুলিয়া আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাত বাড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি প্রকাশ বাবুর পুত্র জানিতাম না। তোমাকে ভুল সন্দেহ করেছিলাম বলিয়া মাপ কর, তবে যে রকম কাণ্ডটা হয়েছিল, আমার বড় দোষ নাই, কি বল ?"

"একটু দোষ আছে, আমার কি জুয়াচোরের মত চেহারা ?"

"জুয়াচোরের কি কপালে "জুয়াচোর" লেখা থাকে, তা হ'লে আর লোকে ঠক্‌তো না। যাক্ সে সব কথা, তোমার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। বীণা, এদিকে এসত।"

বীণা সলজ্জ ভাবে হাসি মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বীণা, ইনি মিষ্টার চৌধুরী, প্রকাশ বাবুর পুত্র। আমাদের কমলার স্বামীর খুড়তত ভাই।"

বীণার সহিত পরিচয় হইল, দুএকটি কথা কহিলাম; তাহার পিতার সহিত নানা প্রকার গল্প করিয়া চলিয়া গেলাম। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সেখানে আমার আহারের নিমন্ত্রণ রহিল। সময়মত আসিলাম, সারা দিন থাকিয়া চা খাইয়া বৈকালে বিদায় লইলাম। শুনিলাম বীণা মাতৃহীনা, পিতার একমাত্র কন্যা। যাইবার সময় বীণা আমার হাতে একটা কি দিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। দেখিলাম সেই নূতন পয়সাটা। তখন মনে হইল যে উহা ভুলিয়া দোকানেই টেবিলের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। এত দিন বালিকা উহা তাহার নিকটে রাখিয়া দিয়াছিল, আমাকে কখনও অবিশ্বাস করে নাই। এসব ভাবিতে হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইল। ইহার পর কয়দিন যেন সুখস্বপ্নে কাটিল। প্রতিদিন সেখানে চা পান করিতাম আর বীণার সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতাম; সমস্ত জগৎ যেন আমার কাছে নূতন সৌন্দর্য্যে শোভিত হইল। একদিন বীণার পিতার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলাম, পিতাকেও এক পত্র লিখিলাম। দুজনের অনুমতি পাইয়া একদিন বৈকালে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বীণার নিকট গেলাম। বীণা বাহিরে রেলিঙ্গ ধরিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল তাহা দেখিতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যের লাল আভা তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত চূড়ায় পড়িয়া তাহাতে যেন ক্ষণকালের জন্য স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দিল, —ক্ষণকালের জন্য মানব স্বর্গশোভা দেখিয়া লইল, পরমুহূর্ত্তে সূর্য্যদেব পর্ব্বতের পশ্চাতে ডুবিয়া গেলেন। বীণার কোমল হাতখানি হাতে লইয়া কহিলাম, "বীণা, একদিন তোমার বাবার সোনার গিনি লইয়া একটি ঝুটা গিনি দিয়াছিলাম। আজ একটি রত্ন লইতে আসিয়াছি।" বীণা বুঝিল, মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল কিন্তু সে কথায় কাহারও কাছে হার মানে না। অধর

প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "রত্নের পরিবর্ত্তে কি দেবেন ?"

"এই ঝুটা রত্নটি।" আপনাকে দেখাইলাম। তার পর দুজনের অনেক কথা বার্ত্তা হইল; সে সব বাজে কথা আর বলিয়া কি হইবে! বিবাহের পরে নূতন পয়সাটাতে একটি ছেঁদা করিয়া ঘড়ির চেনে ঝুলাইয়া রাখিলাম। বীণা মাঝে মাঝে পরিস্কার করিয়া দেয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি, "উহা একটা চার্ম।" তাত সত্যি কথা!

শ্রীস্নেহলতা সেন।

ক্ষুদ্র পাতিয়ার জীবন।

পরিচারিকাখানি আমাদের স্বজাতি দ্বারা পরিচালিত জানিয়া আমার মত মূর্খের এই লেখাটুকু পাঠাইতে সাহস হইয়াছে; পুরুষপরিচালিত পত্রিকায় "সেকেলে" মেয়েদের লেখা পাঠাইয়া হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে এত কাল পাতিয়ার ক্ষুদ্র সত্য আখ্যায়িকাটী প্রকাশ করিতে পারি নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন পিতা শীতকালের প্রত্যুষে মর্ণিং ওয়াকে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমাদের জাগাইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধার পর পাঠে মনোনিবেশ করাইয়া গেলেন। আমরা পড়িতেছি—অল্পক্ষণ পরেই পিতা ফিরিয়া আসিলেন, পিতার সঙ্গে একটী চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া ক্ষুদ্রকায়া বালিকা। তাহার রুক্ষ কেশ, মলিন বসন, সজল নয়ন; ধীরে ধীরে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা পড়া ফেলিয়া তাহাকে সকলে ঘেরিয়া দাঁড়াইলাম ও পিতাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, "বাবা, ওকে কোথায় পাইলেন ?" বাবা বলিলেন "কুড়াইয়া পাইয়াছি।" আমার সমবয়স্কা ছিল না, আমার বড় আহ্লাদ হইল; আমার ভাই ভগিনীরাও তাহাকে দেখিয়া বড় সুখী হইল; আমরা সমস্ত কাজ ভুলিয়া তাহাকে লইয়াই অস্থির হইয়া উঠিলাম, কিন্তু দেখিলাম কলের পুতুলের মত সে যাহা বলি তাই করে বটে কিন্তু একটীও কথা কহে না। আমাদের খাইবার সময় হইলে তাহাকে খাইতে দেওয়া হইল; সে ভাত একটীও মুখে দিল না, দুধ ও বাতাসা গুলি খাইয়া জল খাইল। মা কত সাধিলেন, আমরা কত বলিলাম—কিছুতেই খাইল না, কথাও কহিল না। স্কুলের সময়ে আমরা স্কুলে চলিয়া গেলাম। বাড়ী আসিয়া আবার সেই বালিকার কাছে গেলাম, শুনিলাম সে কিছু খায় নাই কথাও কয় নাই তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেও বলে না; দেখিয়া মা তাহার নাম রাখিলেন কুড়ানী। এইরূপে ৩৪ দিন গেল। তাহার কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া পিতা উত্ত্যক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, আমি তোমার জন্য দায়ী হইতে পারিব না।" সে কাঁদিতে লাগিল। থানায় থানায় খবর দেওয়া হইল যে এইরূপ আকৃতি ও বয়সের একটী

মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, যাহার কন্যা বা বধূ তাহারা লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোনই ফল হইল না। কিছুদিন গেলে বাবা বলিলেন "তোমার অন্যত্র যাইতে হইবে;" আরদালীকে বলিলেন যে ইহাকে অমুক থানায় রাখিয়া আইস। সে কাঁদিয়া বাবার পায়ে পড়িল। আমাদের ইচ্ছা সে এখানে থাকে, আমরাও তাহাকে রাখিবার জন্য বাবাকে অনুনয় করিয়া বলিলাম ও তাহাকে কথা কহিবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিলাম; নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম "না বলিলে তোমাকে বন্ধ করিয়া রাখিব;" পাগল বলিয়া তখন সে ধীরে ধীরে বলিল "পাতিয়া।" সে সময় আমাদের বড় আনন্দ হইল; দৌড়িয়া বাবা ও মাকে বলিতে গেলাম যে কুড়ানী কথা কহিয়াছে, তার নাম পাতিয়া।

পাতিয়া যে মুসলমান বালিকা তাহার পরিধান বস্ত্রই তার প্রমান দিয়াছিল। পাতিয়ার মৌনী ভাবের জন্য আমাদের দাস দাসীরাও মুস্কিলে পড়িয়াছিল, সে কথা কহিয়াছে দেখিয়া তাহারাও যেন আরাম পাইল। মধ্যে তাহার প্রতি আমার বড়ই ঘৃণা জন্মিয়াছিল কারণ শুনিয়াছিলাম যে তাহাকে কোন জলা-ভূমিতে পাওয়া গিয়াছে, মাথায় আগুণ জ্বালাইয়া সে সেইখান দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিয়াছে। ছোট বেলা জানিতাম আলেয়া নামে জ্বলন্ত বস্তু জলাভূমিতে ছুটাছুটী করে আর আলেয়া ত এক প্রকার ভূত পেত্নী বিশেষ। আরও ঝি বামুণীর কাছে গল্প শুনিতাম ভূত পেত্নীরা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারে। যাহা হউক এত কারখানার পর পাতিয়া কথা কহিয়া নিজের সকল কলঙ্ক দূর করিল। একদিন রবিবারে সময় পাইয়া তাহার সমস্ত কথা শুনিলাম। পাতিয়ার পিতা একজন জমীদার, পশ্চিমে বাস করেন; তাঁহার ৭।৮টী পুত্র, পাতিয়া একটীমাত্র কন্যা। শৈশবে পাতিয়া মাতৃ-হীনা; দাস দাসী দ্বারা পালিত হইয়া সে বড় অসভ্য আব্দারে হইয়াছিল; ভ্রাতৃ-জায়ারা কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না, সর্ব্বদা সংসারে তাহাকে লইয়াই বিবাদ উপস্থিত হইত। কুবুদ্ধি তাহার নিত্য সহচরী থাকিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিত, আলস্যে তাহার শরীর পূর্ণ ছিল, কেহ কোন কথা বলিলে কিছুতে শুনিত না একটীও কাজ করিতে চাহিত না, বিলা-সিতা সম্পূর্ণ ছিল, এই সকল দেখিয়া ভ্রাতৃজায়াগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে দূর করিবার জন্য বিবাহের সম্বন্ধ করিল; পিতা নিরুপায় হইয়া মত দিলেন, বয়সে বৈরাগ্য হেতু তাঁহার সাংসারিক সমস্তই পুত্রগণের উপর ভার ছিল, বিশ্বাস করিয়া তাহাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতেন। কোন বধূ আপনার ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছি বলিয়া দূর সম্পর্কীয় কোন দরিদ্র ভ্রাতার সহিত পাতিয়ার বিবাহ দিয়া তাহাকে জন্মের মত জব্দ করিল। পাতিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া দেখিল সে অতি দরিদ্রের ঘরে

পড়িয়াছে; তাহার স্বামী বেলিয়াঘাটায় নূনের দারগা না কি ছিল। তাহাকে বিবাহের পর সেখানে লইয়া আসিল, বিধবা শ্বাশুড়ী সঙ্গে আসিলেন; শ্বাশুড়ী অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির জানিয়াই ভ্রাতৃজায়া এই সংঘটন করিয়াছেন পাতিয়া তাহা বুঝিয়া পিত্রালয়ের আর সম্পর্ক রাখিবে না সঙ্কল্প করিল। এক একবার বৃদ্ধ পিতাকে মনে পড়িলে সে কাতর হইত। দিন দিন শ্বাশুড়ী প্রদত্ত যন্ত্রণা যেমন বাড়িতে লাগিল তাহার মনে মনে ততই পলায়নের ইচ্ছা বলবতী হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি ও জীবন।

আজ উষার স্নিগ্ধ সুশীতল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির একটি বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। উষালোকের অল্প-ছায়া-ছায়া অস্ফুট লাবণ্য, আর শিশুর অপরিস্ফুট সুমধুর সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি একটি বিশেষ যোগ নাই? শিশুর জীবনও উষালোকের ন্যায় ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। সে জীবন-সমীরণ স্নিগ্ধ, সুকোমল, কিন্তু অপরি-স্ফুট। পুষ্প কলিকার ন্যায় কত বিচিত্র গুণরাশি তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। কে বলিতে পারে উষার কিরণরাশি দ্বিপ্রহর সূর্য্যালোকে কত বল বিক্রম প্রকাশিত করিবে? ক্রমে শিশু-জীবন বিকশিত হইতে লাগিল, তাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-রশ্মি যৌবনের প্রখর সূর্য্যকিরণে আরও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। যাহা অস্ফুট ছিল তাহা ফুটিয়া উঠিল; যে সকল ক্ষমতা দক্ষতার ক্ষুদ্র বীজ অলক্ষিত ভাবে শিশু-জীবনে লুক্কায়িত ছিল, যৌবন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে তাহা প্রকাশিত হইল। সংশয় অবিশ্বাসের আঁধার যে যে স্থান আবৃত করিয়াছিল তাহা এই অপূর্ব্ব আলোকের গুণে বিদূরিত হইল। তখন মানব-জীবন আপন স্বভাব, আপন বিক্রম প্রকাশিত করিয়া বিশ্বসম্মুখে দণ্ডায়মান হইল!

কিন্তু দিবসও কখনও এক ভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকে না। নিত্য পরিবর্ত্তন-চক্রে তার জীবনও নিয়ত ঘুরিতেছে। যৌবনের হাসি খুসি, বল বিক্রম, উদ্যম উৎসাহ, পরিশেষে বার্দ্ধ-ক্যের শান্তিময় সাগরে বিলীন হয়; দিবার আলোকও সন্ধ্যার সুকোমল ছায়ায় অন্তে মিশিয়া যায়। বার্দ্ধক্যে লোকে কেবল শান্তি অন্বেষণ করে; সমুদায় তেজ শক্তি তখন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

তখন আর যৌবন দ্বিপ্রহরের প্রখর তীব্র তেজ থাকে না; তাহার পরিবর্ত্তে চন্দ্রের সুকোমল জ্যোৎস্না! বার্দ্ধক্যের শান্তিপূর্ণ সুশীতল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া যৌবন তখন আরাম অনুভব করে।

আমিত্ব বিনাশ।

(প্রেম-কুসুম হইতে উদ্ধৃত)

ওহে দীন দয়াময়, পরম মঙ্গলালয়,
বিষয়ীর যেমন সংসার ;
তেমনি বিশ্বাসী জনে, পরিহরি রাজ্যধনে,
যোগরাজ্য করে অধিকার।
আমাদের সেই ধরা, প্রেম পুণ্য যোগে ভরা,
নাহি মিলে পৃথিবীর সনে ;
এক বই কর্ত্তা নাই, আমরাও বলি তাই,
এই মাত্র ঐক্য দুই জনে।
আমাদের সে জগত, নহে পৃথিবীর মত
জড়ময় অনিত্য অসার ;
হেথায় মানুষ কর্ত্তা, সেথা দেব তুমি ভর্ত্তা,
একমাত্র তুমি মূলাধার।
তোমারে বিদায় দিয়া, এক পার্শ্বে সরাইয়া,
কার্য্য করে জীব ইচ্ছামত ;
আপনি সে আনে টাকা, কাজে কর্ম্মে ভারি পাকা,
পর উপকার করে কত।
খাটাইয়া বুদ্ধি বৃত্তি, রেখে যায় নানা কীর্ত্তি,
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নিজ বলে ;
কতই ক্ষমতা তার, বহে সে আপন ভার,
চলে সদা বুদ্ধির কৌশলে।
যোগধামে দৈববল, যোগীর আশা সম্বল,
মানুষেরা নাহিক তথায় ;
আমি আমি করে যারা, সে দেশে থাকে না তারা,
নরপশু কভু না চেঁচায়।
তুমি তুমি ভগবান, বলিয়া সাধক-প্রাণ,
করে নিত্য তব জয় ধ্বনি ;
এখানে নাহি সে আমি, একমাত্র তুমি স্বামী,
ভক্তের সর্ব্বস্ব রত্নমণি।

না হলে আমিত্ব নাশ, কিছু নাই সুখ আশ,
হতে হবে একবারে গুপ্ত ;
উহারা তোমারে মারি, হইয়াছে অহঙ্কারী,
করিয়াছে তব নাম লুপ্ত।
আমিকে মারিয়া হরি, তব পদ সার করি,
তব রাজ্য করিব স্থাপন ;
বড় কাঁটা ছোট কাঁটা, ভিন্ন ভিন্ন ছিল দুটা,
দ্বিপ্রহরে হইল মিলন।
তোমার ইচ্ছার বল, অন্তরে অতি প্রবল,
ধড় ফড় করে তাহে প্রাণ ;
সেই বল বীর্য্য শক্তি, আনন্দ উত্তম ভক্তি,
ভগ্নদেহে করে তেজ দান।
নির্জ্জীবে জীবিত করি, কার্য্য কর তুমি হরি,
পাপ মাত্র আমি আমি বলা ;
যাই বলি শান্তি নাই, মনে সুখ নাহি পাই,
সাধুরা চাপিয়া ধরে গলা।
একটু আরাম চাই, একবার বলি যাই,
তাঁহারা ধমক দেন আসি ;
স্বইচ্ছায় আত্মনাশ, ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বনাশ,
এই কথা বলেন বিশ্বাসী।
ভরসা তুমি কেবল, তুমি শক্তি বুদ্ধি বল,
তুমি রক্ত তুমি হে নিশ্বাস ;
তুমি মোর যোগ ধর্ম্ম, আমি মিথ্যা, তুমি কর্ম্ম,
আমি কথা বলে না বিশ্বাস।
আমি শব্দ অভিধানে, নাহি হেথা কোন স্থানে,
তুমি মাতঃ জীবন সর্ব্বস্ব ;
তুমি সর্ব্বমূলাধার, প্রাণের প্রাণ আমার,
তুমি দেব গভীর রহস্য।
পাছে পাপে পুড়ে যায়, হইবে বিষম দায়,
ঘর পানে ছিল দুটি আঁখি ;
নয়নঅঞ্জন হরি, তোমারে দর্শন করি,
তব শ্রীচরণ বক্ষে রাখি।

নরহত্যা প্রাণহানি, মহা অপরাধ মানি,
পৃথিবীর লোকে নিন্দা করে ;
যোগরাজ্যে তাহা নয়, আমি বলা পাপ হয়,
আত্ম অভিমানে সাধু ডরে।
আমি কথা এ রসনা, বলিতে আর চায় না,
একবারে হয়েছে বিস্মৃত ;
অন্তরে বাহিরে রাজ্য, সকলি তোমার কার্য্য,
দেখে শুনে হই জীবন্মৃত।
তোমা বই নাহি জানি, নাহি চিনি নাহি মানি,
মজি নাই অন্য কোন ধনে ;
এ কথা বিশ্বাসবলে, যোগীরা যখন বলে,
বড় সুখ পায় তারা মনে।
যোগরাজ্যে এক জন, করিয়াছে আগমন,
হরি বিনা কিছু তার নাই ;
যার হয় আত্মগ্লানি, সেই যোগী ব্রহ্মজ্ঞানী,
আত্মনাশে বাসনা সদাই।
আমি তুমি, তুমি আমি, যে বলে সে অধোগামী,
তার অর্দ্ধ রাত্রি, অর্দ্ধ দিন ;
পশু ভাব দেব ভাবে, বিরাজে তার স্বভাবে,
কর প্রভু আমিত্ববিহীন।
দয়াসিন্ধু দীননাথ, কর এবে আশীর্ব্বাদ,
মিশে যাই তোমার ভিতরে ;
তুমি তুমি তুমি ধ্বনি, করুক দিন রজনী,
একতন্ত্রী আমার অন্তরে।
এই সুরে নিরন্তর, তোমারে ডাকি ঈশ্বর,
আত্মপূজা করিব না আর ;
বড় সাধ আছে মনে, হেরিব প্রেমনয়নে,
সর্ব্বত্র তোমার অধিকার।
করিব না আর তাহা, বুঝিয়াছি মিথ্যা যাহা,
বোস মাগো হৃদি সিংহাসনে ;
জয় জগদম্বে বলি, আপনারে দিয়ে বলি,
লুটাইব তোমার চরণে।

দুই ভগিনীর কথোপকথন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পৃথিবীতে কেন এখনও এত মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ ?

কনিষ্ঠা ভগিনী। কেন জান না ? এখন সকলেই বড় হ'তে চায়। সমস্ত রাজ্য একজনের হবে, সমস্ত পৃথিবী একজনের অধীনে থাক্‌বে—তাই এত যুদ্ধ, এত মারামারি।

জে-ভ। আমিও তাই বল্‌ছিলাম, যে এই শতাব্দীতে সকলে এক রাজার অধীন হ'য়ে কোথায় সুখে থাক্‌বে, তা না ক'রে কেন এত বিবাদ, বিসম্বাদ ?

ক-ভ। কি বল দিদি! এই এত শিক্ষা, সভ্যতার সময় লোকে কি সহজে অমনই স্বাধীনতা কেউ দিতে পারে ? নিজে নিজে স্বাধীন ভাবে সকলে রাজ্য কর্‌বে এই ইচ্ছে কি স্বাভাবিক নয় ?

জে-ভ। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। সকলে নিজের নিজের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে এক রাজার অধীন হ'য়ে কাজ কর্‌লে নিঃসন্দেহ সকলে সুখী হ'বে।

ক-ভ। না দিদি, আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

জে-ভ। আমি এই বল্‌ছিলাম—সকলে যদি মনে করে, "আমরা সকলেই সেই বিশ্বপিতার সন্তান," তা হ'লেই ভ্রাতৃপ্রেম আসে আর দ্বেষাদ্বেষি থাকে না।

ক-ভ। হয়ত মনে মনে একটু ভ্রাতৃপ্রেম আছে কিন্তু ধন, মান, সম্পদ সে ভ্রাতৃস্নেহের চেয়ে শত সহস্র গুণে বেশী।

জে-ভ। তবে সে স্নেহ, স্নেহই নয়।

ক-ভ। না দিদি, তা বল্‌তে পারি নি, কেননা পড়েছি ও শুনেছি যে রাজাদের ভেতর বেশ স্নেহ, ভালবাসা আছে।

জে-ভ। সে স্নেহ ভালবাসা অনিত্য, চিরদিন থাকে না। যতক্ষণ লোকে তোষামোদ করে, নিজের মনের মত সকল কাজ চলে ততক্ষণ লোকে সকলকে বেশ স্নেহ করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তার বড় হ'তে ইচ্ছে হয়, সকলের ওপর আধিপত্য কর্‌তে বাসনা হয়, সেই সময় থেকে অহংভাব প্রবল আর অন্য সব ভাব প্রায় লুপ্ত হয়। সে ভাবে, "আমি কিসে বড় হব।" এই যে ভাব, এতে ত স্নেহ, ভালবাসা থাকে না। যদি স্নেহ—যথার্থ স্নেহ থাক্‌ত তবে নিজেকে ছোট ক'রে অন্যকে বড় করাই স্বাভাবিক হ'ত। দেখ এই যে স্নেহ, এরই অভাবে আজ পৃথিবীতে এত হিংসা, দ্বেষ, কলহ বিবাদ।

ক-ভ। তবে কি কর্‌লে সেই স্নেহ আসে যে স্নেহ হ'লে কেউ কারও সঙ্গে যুদ্ধ করে না, মারামারি করে না।

জে-ভ। সকলে যদি "ভাই বোন" ব'লে সকলকে ভালবাসে তবেই যুদ্ধ মারামারি বন্ধ হয়। আমরা সকলে সেই এক মায়ের সন্তান এই কথা কেন সকলে ভাবে না ?

ক-ভ। আচ্ছা, তা হ'লে সকলের এক ধর্ম্মভুক্ত হওয়া উচিত।

জে-ভ। সেই কথাইত আমি প্রথম থেকে বল্‌তে চাচ্ছি; সকলের এক ধর্ম্ম হ'লে আর কি কোন কথা থাকে!

ক-ভ। সে বড় কঠিন। সকলে মনে করে তাদের নিজের নিজের ধর্ম্ম সব চেয়ে বড়।

জে-ভ। কিন্তু যে ধর্ম্মে সব ধর্ম্মের মিলন, সেই ধর্ম্মই সকলের আরাধ্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বসুখময় ধর্ম্ম।

ক-ভ। তবে মিলনের এখন অনেক দেরী। সে ধর্ম্ম আজও ত পৃথিবীতে আসে নি।

জে-ভ। সে কি! এই ঘোর কলি যুগেও সে ধর্ম্ম এসেছে। এই মহানগরী কল্‌কাতায় নববিধানের জন্ম। এই ধর্ম্মে সকলের মিলন। এই বিধানে যারা বিশ্বাস কর্‌বে তারা সকল-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী। নববিধানে বিশ্বাসী হ'লে ভ্রাতৃপ্রেম তাদের অঙ্গের ভূষণ হ'বে। আহা সে দিন কবে হবে, যে দিন আমরা সকলে ভাই, ভগিনীর স্নেহ পরস্পরকে দিয়ে এক স্বরে জগত-জননীর মহিমা কীর্ত্তন কর্‌ব!

ক-ভ। স্বর্গ যদি এত কাছে, নববিধান যদি দয়া ক'রে এসেছেন আমাদের কাছে, ভাল হওয়া যদি এত সহজ, তবে আর দেরী কেন?

জে-ভ। "কেন" তার জবাব কেমন ক'রে দেবো? এত সহজ স্বর্গে যাওয়া তবু সকলে কত শক্ত ভাবছে। কিন্তু এখন হোক আর হাজার বছর পরেই হোক এই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় নববিধানের জয় পতাকা পৃথিবীর সব দেশে উড়্‌বেই উড়্‌বে। তখন আর যুদ্ধ, মারামারি, ধন মান পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের জন্য হিংসা, দ্বেষ কিছুই থাক্‌বে না। কেবল ক্ষমা, কেবল স্নেহ, কেবল সুখ, কেবল আনন্দ। কারও কোন নিন্দা, অপমান হবে না, কারও কোন অভাব ক্ষতি থাক্‌বে না। কেবল চার্ দিকে দিন রাত সুখের ব্যাপার হাসির ধ্বনি উত্থিত হবে।

প্রাপ্ত।

প্রিয় পরিচারিকা,

অনেক দিন তোমার কোন খবর পাই নাই; কেমন আছ? আমি বিদেশে আসিয়াছি বোধ হয় তাহা জান না, কারণ অনেক দিন হইতে "পরিচারিকা" পাই নাই।

এখানে ভয়ানক গরম। আমি একটি বন্ধুর বাড়ীতে আছি। তুমি কি বিশ্বাস করিতে পার আমি সত্য সত্য টেবিলে বসিয়া খাই! আমার খাবার কথা শুনিয়া তুমি বোধ হয় খুব হাসিবে। প্রথম দিন অনেক বলা বলি ও স্বামীর অনুরোধে খানার ঘরে খাইতে গেলাম। স্বামীকে পাশে বসাইলাম। প্রথমেই জলের গ্লাসের জলে প্লেট ধুইয়া কার্পেটেই ফেলিলাম। মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত—যেমন চামচ কাটা ধরিব, কাঁটা হাত হইতে পড়িয়া গেল! শেষে, ভাই, সত্য বল্‌ছি, মাথার কাপড় খুলিয়া

গেল! আমার যে কি লজ্জা হইল বলিতে পারি না। স্বামীকে বলিবামাত্র হাত ধুইয়া আসিয়া আমার মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। আমিত এঁটো হাতে মাথায় হাত দিতে পারিতাম না। যাহা হউক কোন মতে সে দিন খাইয়া স্বামীকে তুষ্ট করিলাম! শেষে দিন কতক নিজের ঘরে খাইয়া একটু চামচ কাঁটার অভ্যাস করিয়া পরে আবার বন্ধুদের সঙ্গে খাই। তবে ভাত মাছের ঝোলেই এখনও তুষ্ট, পরে কি করিব জানি না।

আমার বন্ধুর দিদির মেয়েকে কি তোমার মনে আছে? সেই তোমাদের আনন্দবাজারে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। সেই নলিনীর একজন সিভিলিয়নের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হইয়াছে। তাহাদের, ভাই, আমাদের মত সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু কি বলিয়া এন্‌গেজমেণ্ট হয়, তাহার পর বিয়ে হয়। সেই জামাই আসিয়া অর্থাৎ সিভিলিয়ন আসিয়া আমার সঙ্গে সেক্যাণ্ড করিবে ভাবিয়াছিল, আমি—না ভয়ে—স্বামীকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাঁহার আড়ালে দাঁড়াইলাম; দূরে থাকিয়া নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিলাম। নলিনী সে সিভিলিয়ন অপেক্ষা প্রায় বার বৎসরের ছোট। নলিনী বেচারা কিছু জানে না, তাহাকে সব ইংরাজিতে ভালবাসার চিঠি লেখে, আর নলিনী কি লিখিবে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে। আমার ত ইংরাজির কত দৌড় জানই! তাহার ভিতরে একটু আধটু যাহা জানি, সে কেবল সম্বোধন! তা সেই গুল সব বলি। নলিনী অর্দ্ধেক বাঙ্গালা অর্দ্ধেক ইংরাজিতে লেখে। ভাবী জামাই কত ভালবাসার কথা লেখে আর নলিনীর উত্তর দেখিয়া হাসিয়া মরি। একখানা চিঠির ভাব একটু নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Darlin—Thanks for your letter. I always think of you and love you really. আমার একটা পাখী উড়ে গেছে। সে দিন বাবার বন্ধুর ঘোড়া রাস্তায় এত দুষ্টুমী করেছে! মেসোমশায় শীঘ্র বিলাত যাবেন। When are you coming to see me? I like seeing you every day. I really and truly love you. I do not love nobody except my kitten and my canary. you will not get jealous; will you, my dear?

I am yours lovingly

Nolini.

P. S.

Mashima says I love you too much.

পাক বিধি।

চিড়া অল্প একটু ভাজিয়া লইতে হইবে, মাছের মুড়োও একটু ভাজিতে হইবে, হলুদ-লঙ্কা-ধনে-জিরা-বাটা পরিমাণ মত লইয়া কয়েকটা আস্ত তেজপাতা সহ ঘৃতে ছাড়িয়া দিয়া একটু নাড়া চাড়া করিয়া এই চিড়া ও মাছের মুড়ো ছাড়িয়া

দিতে হইবে, পরে জল দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; সামান্য একটু ঝোল রাখিয়া গরম মসলা দিয়া একটু বাদে নামাইলে চিড়ের ঘণ্ট হইবে।

চিংড়ি মাছের খোসা ফেলিয়া ভাল করিয়া পিষিতে হইবে, আদা-হলুদ-লঙ্কা-পিঁয়াজ-বাটা এই মাছের সহিত মাখিয়া ছোট করিয়া বড়া তেলে ভাজিতে হয়। আলু অল্প করিয়া ভাজিয়া হলুদ লঙ্কা-পিঁয়াজ-আদা-ধনে-বাটা খুব কম কম পরিমাণ লইয়া ঘৃতে ছাড়িয়া দিয়া তেজ-পাতা দিয়া একটু ভাজা হইলেই এই মাছের বড়া ও আলু ছাড়িয়া দিতে হইবে; একটু নাড়া চাড়া করিয়া অল্প জল দিয়া পরিমাণ মত একটু ঝোল থাকিলে গরম মসলা বাটা দিয়া নামাইতে হয় ইহার নাম চিংড়ি মাছের কারী।

সরু আতপ চাউল ভিজাইতে হইবে, ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে হলুদ-লঙ্কা-ধনে-বাটা লবণ পরিমাণ মত ছাড়িয়া দিয়া একটু নাড়া দিয়াই এই ভিজান চাউল ছাড়িয়া দিতে হইবে, একটু ভাজা ভাজা হইলে জল দিতে হইবে; মাছের মুড়ো অথবা চিংড়ি মাছ একটু ভাজা করিয়া উহাতে দিয়া ঢাকা দিতে হয়, চাউল সিদ্ধ হইয়া ঝোল অল্প থাকিতেই নামাইয়া পুনঃ ঘৃত চড়াইয়া আদা ও পিঁয়াজ বাটা ছাড়িয়া দিয়া একটু ভাজিতে হইবে, ভাজা হইলে উহা ঢালিয়া দিয়া ঝোলটা শুকাইয়া যাইলে গরম মসলা দিয়া নামাইলে চাউলের ঘণ্ট প্রস্তুত হইবে। পলাণ্ডু-প্রিয় যাঁহারা নহেন তাঁহারা তাহা বাদ দিয়াও উক্তানুরূপ রান্না করিতে পারেন।

সর-সরোবর।—সর ভাজা অবশ্য সকলেই জানেন, কিন্তু অনেকে সর ভাজা কিছু শক্ত হয় বলিয়া ততটা পছন্দ করেন না; তাঁহাদের পক্ষে এই সর-সরোবর অতি উপাদেয়, সরস, কোমলতা প্রযুক্ত এবং আস্বাদ-সুখকর হইবে সন্দেহ নাই। ইহার প্রস্তুতি-রীতি অতি সরল। প্রথমতঃ সর ভাজার সরেরই ন্যায় বেশ পুরু করিয়া সর তুলিবে। তাহা বর্ফীর আকারে কিছু লম্বা করিয়া কাটিয়া রসগোল্লার রসের ন্যায় রস ফুটিতে থাকিলে তাহাতে ফেলিয়া দিবে এবং রসগোল্লার মত রস ফুটিয়া ঘন হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে কিছু গোলাপ জল দিয়া সকলকে খাওয়াইবে। দেখিবে এই সর-সরোবর খাইয়া তাঁহারা আবার করিয়া খাওয়াইতে বলেন কি না? পাঠিকা, ইহার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

Selections.

Faith is the greatest treasure of man in this world.

Joy is fleeting and mixed with pain; it swiftly disappears, like figures traced on water with a wand.

He who speaks words which bring him no grief and which will do no harm to his neighbour speaks well.

From desires comes grief, from desires comes fear; he who is free from desires knows neither grief nor fear.

He who covers up his evil deeds by good deeds brightens up the whole of this world like the moon free from clouds.

The wise man in this world holds fast to faith and wisdom; these are his greatest treasures; he casts aside all other riches.

If one longs for happiness let him cast off all desires; he who has cast off all desires will find the most perfect happiness.

As the waters of a brook, so flow on by day and night the hours of man's life; it draws nearer and nearer to its end.

As a river that is always running swiftly by and never returns are the days of man's life—They depart and come back no more.

As the end of life is death, and all creatures do die, so likewise do virtue and vice bear fruits which follow after the deeds.

As the smith does with the silver, so does the intelligent man, gradually and little by little, cleanse himself of all his impurities.

Even as the brilliant chariot of the king is destroyed, the body also draws nigh to old age; but the best of men, who teaches others this best of all good laws, shall not know old age.

He whose life is one of virtue is praised by the Gods; he in whom there is nothing to be blamed finds perfect joy in heaven.

The sage whose thoughts are always controlled can be harmed by nothing; he goes to an immortal dwelling-place where there is no sorrow.

One must only speak what is right, and must not speak evilly; from wicked words come evil, one ought consequently to use proper language.

To speak the truth is (like) *amrita*; truth cannot be surpassed. The truth is holding fast to what is good and to what is right, say the righteous.

As long as men are united, so long will they be the conquerors; but if they would be victorious by other means, they will find out that they will be conquered.

Look where you will, there is nothing dearer to men than himself; therefore, as it is the same thing that is dear to you and to others, hurt not others with what pains yourself.

He who delights not in life, finds no sorrow in death; he knows the reward of earnestness, and is without pain even in the midst of sorrow.

(*From the Buddhist canon Udanavarga.*)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ carpet বা সতরঞ্চি windsor castleএ আছে। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় ২৮ জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল ও চতুর্দ্দশ মাস লাগিয়াছিল।

Berlin এর পাগ্‌লা-গারদে, কথিত আছে, একজন উন্মাদিনী আছে; তাহার মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সঙ্গে কেশের রংএর পরিবর্ত্তন হয়। যখন শান্ত ও স্থির থাকে চুলগুলি ঈষৎ পীত বর্ণ দেখায়, কিন্তু যখন চঞ্চল ও অস্থির হয় ঘন পাট্‌কিলে রং দেখায়।

Boston এর Professor Percival Lowele নামক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত সম্প্রতি Mars গ্রহ মধ্যে একটি নূতন আলোক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাতে অনুমান করেন যে উক্ত গ্রহবাসীগণ বোধ হয় আমাদিগের নিকটে কোন প্রকার সঙ্কেত মানসে ঐরূপ আলোক দেখাইতেছেন!

St. Petersburgএ একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে, ইহাতে প্রায় ৩১ জন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ যুবা সভ্য হইয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য রমণী জাতিকে মান্য করিতে শিক্ষা।

কোন রমণীর প্রতি মিথ্যা বিদ্রূপ বা পরিহাস করিলে তাহাকে সমিতিচ্যুত করা হইবে। যাঁহারা সত্য সত্য বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সেই ভাবে হস্তপ্রার্থী হইবেন কিন্তু বৃথা আশা দিতে পারিবেন না।

জাপানে প্রায় দুই বৎসর হইল মহিলাদিগের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় আট শত ছাত্রী হইয়াছে। দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা বালিকা হইতে ত্রিংশ বর্ষের উর্দ্ধ রমণী পর্য্যন্ত ছাত্রী দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়—নির্ব্বিশেষে ছাত্রী গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায় ৪১ জন শিক্ষক বা lecturer আছেন তন্মধ্যে কেবল চারিজন বিজাতীয় রমণী শিক্ষয়িত্রী। ইংরাজী চীন ও জাপান দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অন্য একটি বিভাগ আছে তাহাতে গৃহকর্ম্ম, সেলাই ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বর্ণরেণু।

ঈশ্বরের যত মহাব্যাপার হইয়া গিয়াছে, সকলই এই অনন্তকালসমুদ্রের মধ্যে। আরও কত সহস্র, অযুত, লক্ষ ঘটনা এই অসীম সমুদ্রে বিলীন হইবে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে?

—:o:—

২৬ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১০। [৭ম সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. NOVEMBER, 1903. No. 7.

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ ...	১৪৫	আর কেন ...	১৫৮
কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা ...	১৪৬	ভ্রাতৃসমাদর ...	১৫৯
নারী সৃজনের উদ্দেশ্য ...	১৪৬	ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল ...	১৬০
হিমালয় ...	১৪৯	প্রকৃতি ...	১৬১
হিমালয় দর্শনে হৃদয়োচ্ছ্বাস	১৫০	গাছ পালার কথা ...	১৬৩
রাণী অহল্যাবাই ...	১৫১	প্রকৃতিবালা ...	১৬৫
প্রার্থনা ...	১৫৩	পাক বিধি ...	১৬৭
কয়েকটি মহৎ দৃষ্টান্ত ...	১৫৪	স্বর্ণরেণু ...	১৬৮
খড়িগড়ের রাণী ...	১৫৬		

কলিকাতা,

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga: Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays: Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee

		মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ ...	১৲
১৯ ঐ	২য় ভাগ ...	১৲
২০ ঐ	৩য় ভাগ ...	১৲
২১ ঐ	৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২ ঐ	৫ম ভাগ ...	১৲
২৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪ জীবনবেদ	...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	...	১
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ	...	।৵০
২৭ ঐ ২য় ভাগ	...	।৵০
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে		১৷৷০
২৯ সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড		১৷৷০
৩০ ঐ তৃতীয় খণ্ড	...	১
৩১ ঐ চতুর্থ খণ্ড	...	১
৩২ ঐ পঞ্চম খণ্ড	...	১
৩৩ নবসংহিতা	...	৷৵০
৩৪ মাঘোৎসব	...	৷৷০
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ	...	৷৷০
৩৬ ঐ ঐ ২য় ভাগ	...	৷৷০
৩৭ ঐ ঐ ৩য় ভাগ	...	৷৷০
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ		৷৷০
৩৯ ঐ ২য় ভাগ	...	৷৷০
৪০ ঐ ৩য় ভাগ	...	৷৷০
৪১ ঐ ৪র্থ ভাগ	...	৷৷০
৪২ ঐ ৫ম ভাগ	...	৷৷০
৪৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ	...	৷৷০
৪৪ ঐ ৭ম ভাগ	...	৷৷০
৪৫ ঐ ৮ম ভাগ	...	।৵৵
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ	...	।৵০
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ		।৷০
৪৮ ঐ ২য় ভাগ	...	।৷০
৪৯ প্রেম কুসুম	...	।৷০
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	...	৵০
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	৵০
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী	...	৵০
৫৩ সুখী পরিবার	...	৴০
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ	...	৷৴০
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	...	৷৴০
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	...	৷৴০
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	...	৷৴০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা কার্ত্তিক ১৩১০, নবেম্বর ১৯০৩ [৭ম সংখ্যা

বিনীত নিবেদন।

১৩১০ সালের বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় মূল্য দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন নাই। কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পারস্য দেশের "সা"র ১৭০০ জন স্ত্রী ছিল। তাহাদিগের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইত বলিয়া ১৬৩০ জনকে বিদায় দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ষাট জন মাত্র স্ত্রী আছে।

সম্প্রতি গয়াতে একটি শিশু সন্তানের জন্ম হইয়াছে; তাহার একটি লাঙ্গুল আছে। বানর ও মানব জাতির মধ্যে যে আর একটি জাতি জন্মিয়াছে তাহা ডারউইন Darwin প্রমাণ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে সকলে বলিতেছে ইহাই সেই জাতি ভুক্ত। উক্ত শিশুর ল্যাজটি প্রায় তিন কিম্বা সাড়ে তিন ইঞ্চী লম্বা!

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাকে এক সময়ে সোণা দ্বারা ওজন করা হইয়াছিল। পরে তাহা সকলকে বিতরণ করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানটিকে সেই দেশে "তুলাভরা" বলা হয় এবং ঐ প্রথাটি এখনও প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান রাজা যখন দেড় মণ ওজনে ছিলেন তখন উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার কথা হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আর কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে চাহিল এই আশায় যে তিনি তাঁহার পিতার মত ওজনে ভারী হন। মহারাজার পিতা ওজনে প্রায় ২ মণ ২৩ সের ছিলেন।

ভারতবর্ষে এত সভ্যতার মধ্যে আজিও বাল্যবিবাহ প্রচলিত। যাহাদের এক বৎসরও বয়ঃক্রম হয় নাই তাহাদিগেরও

বিবাহ দেওয়া হয়। Censusএ ঐরূপ ১৪৩ শিশু বালক ও ১৮৭ শিশু বালিকার বিবাহ হইয়াছে। এবং প্রায় পঞ্চম বর্ষীয় ২২৯৭ বালক ও ৩৫৩৪ বালিকার বিবাহ হইয়াছে। Census পাঠ করিয়া জানা গেল সেই সময়ে ২৭ জন শিশু বালিকা যাহাদিগের বয়স তখনও একবৎসরেরও কম এবং ৩০০ শত বালিকা যাহাদিগের বয়স পাঁচ বৎসরেরও কম বিধবা হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়া বরদার বর্ত্তমান মহারাজা এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যে কোন বালক অষ্টাদশ বৎসরের পূর্ব্বে ও কোন বালিকা চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না।

কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

একটি নবমবর্ষীয় বালকের বাম চক্ষু প্রায় জন্মকাল হইতে অন্ধ ছিল। এক দিন Bicycle হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মস্তকের ও মুখের বাম দিকে অত্যন্ত আঘাত লাগে। বহু দিবস সে ঐরূপ অবস্থায় কাটায়; যে দিবসে তাহার আহত স্থান হইতে বাঁধা কাপড় খোলা হইল, সেই দিবস হইতে সে তাহার অন্ধ চক্ষুতে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইল।

আর এক সময় কোন এক মূক ও বধির ব্যক্তি অন্য একটি লোকের সহিত মল্ল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল এবং তাহা কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে আঘাত কোন অনিষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে উপকার করে অর্থাৎ তাহাতেই তাহার দুইটি শক্তিই সে পুনঃ প্রাপ্ত হইল।

কোন সময় এক গাড়োয়ান প্রবল ঝড়ের সময় বাহিরে ছিল এবং একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া তাহার উপর পড়ে ও সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত গাড়োয়ানের একটি বধির কন্যা ছিল, সে এই আকস্মিক ঘটনার কথা শুনিবামাত্র তাহার শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসে!

কাহার কখন্ কোন্ ভাবে উপকার হয় বলা যায় না। তবে এরূপ চিকিৎসা প্রথা যে সকলের পক্ষে অনুসরণীয় তাহা নহে!!

নারী সৃজনের উদ্দেশ্য।

নারীজাতিসৃজনের যে উচ্চ লক্ষ্য তাহা জনসমাজে সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতেছে না। ঈশ্বর স্ত্রীজাতি সৃজন করিলেন এই জন্য যে, স্ত্রীর কোমল প্রকৃতিতে পুরুষের হৃদয় কোমল হইবে, এবং পুরুষেরা সেই কোমল ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবে; কিন্তু স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, না এদেশে, না অন্য দেশে কোথায়ও প্রকৃতরূপে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই।

স্ত্রীলোকেরা কোমল হইয়া পুরুষদিগকে কোমলতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা আপনারা কঠোর ও স্বার্থপর হইয়া পুরুষদিগকে আরও কঠোর ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য আমরা দেখিতেছি যখনই পুরুষদিগের অত্যন্ত ইচ্ছা হয় যে ঈশ্বরের সঙ্গে দুদণ্ড নিবিষ্টমনে থাকেন তখনই তাঁহারা স্ত্রী পরিবার ছাড়িয়া নির্জ্জনে যাইয়া একাকী সাধন ভজন করেন। কেন না স্ত্রী পরিবারের মধ্যে থাকিলে অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি তেমন ভক্তি এবং জগতের প্রতি তেমন প্রেমের উদয় হয় না। এখন পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা ইহাতে পুরুষেরাও এই কথা স্বীকার করিবেন, এবং স্ত্রীরাও এই কথা স্বীকার করিবেন। ইহা দেখিয়া কি বলিব যে ঈশ্বর তবে স্ত্রীজাতিকে পুরুষদিগকে কোমল করিবার জন্য সৃজন করেন নাই? যত দিন বিবাহ না হয় তত দিন অনেক যুবক উৎসাহের সহিত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু যাই বিবাহ হইল তখনই তাঁহারা সংসারের পাশে বদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন ঘোর বিষয়লালসা আসিয়া তাঁহাদের মনকে আক্রমণ করে, তখন কিসে কেবল নিজের স্ত্রী ও নিজের পুত্র কন্যার মঙ্গল হয়, দিবারাত্রি তাঁহারা কেবল তাহাই ভাবেন। এইরূপে তখন তাঁহাদের চিন্তা সংকীর্ণ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের আশা, প্রেম অনুরাগ সকলই সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় প্রাণ তখন একটি ক্ষুদ্র সংসারের ভিতরে বদ্ধ হয়। সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং সমুদয় ভগ্নীমণ্ডলী আর তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয়ে স্থান পায় না। তখন আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদের প্রেম লাভ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পর এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, এত বড় আত্মা যাহা সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে ভালবাসিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা সমস্ত আকাশে উড়িবার ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মত একটি ক্ষুদ্র পরিবারে বদ্ধ হয়। যে প্রেম সমস্ত পৃথিবীর প্রাপ্য তাহা পিতা, মাতা, স্ত্রী অথবা দুই পাঁচটি পুত্র কন্যা ভাগ করিয়া লয়। যে অনুরাগ সমস্ত পৃথিবীকে দিলেও তাহার চতুর্থাংশ নিঃশেষিত হয় না, সেই অনুরাগ চার পাঁচটি লোকের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অমরাত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীর মলিন পঙ্কে নিতান্ত কলঙ্কিত হয়। এই ক্ষুদ্রতাতেই পৃথিবীর অধোগতি হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় নিতান্ত জঘন্য স্বার্থপরতার আধার হইয়াছে। ইহার গূঢ় কারণ আছে। এই দেশে বহুকাল হইতে স্ত্রীলোকদের পক্ষে একমাত্র স্বামিসেবাই জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া আসিয়াছে। কেবল স্বামীর দাসত্বেই তাঁহাদের পরিত্রাণ, স্বামীর মন সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বর্গলাভ, সকল বিষয়ে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া না চলিলে

তাঁহাদের সর্ব্বনাশ; এ অবস্থায় জগতের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসা তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। চিরকালই তাঁহারা এইরূপ একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। পুরুষেরা বাহিরে থাকে, বাহিরের লোক জনের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া, বাহিরের উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া তাহাদের হৃদয় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের আপন আপন ক্ষুদ্র ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার অনুমতি নাই। সেই ক্ষুদ্র গৃহ ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে যে আর কোন স্থান আছে তাহা তাঁহারা জানেন না। সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র গৃহে যে কয়েক জন থাকেন, তাঁহাদের প্রতিই আসক্তি বাড়িতে থাকে। দয়া, দেশানুরাগ, পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ ক্রমে ক্রমে একেবারে হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার কোমল হস্তে স্ত্রীজাতির হৃদয়ে যে সকল মধুর এবং উচ্চ ভাবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত এবং অনুকূল অবস্থার অভাবে, স্ফূর্ত্তি না পাইয়া সে সকল শুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্য দেশের সকল লোকের সর্ব্বনাশ হইলেও আমাদের স্বার্থপর স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ ব্যাকুলতা দেখা যায় না। তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া উচ্চ স্থানের অধিকার পাইয়াছ, তোমাদিগকে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ এবং সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীর জন্য ভাবিতে হইবে, কেবল নিজ নিজ পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ব্রাহ্মিকা নামে কলঙ্ক হইবে। সাবধান! আপনাদের দোষে তোমরা এই উচ্চ অধিকার হারাইও না। আমি ভাল হইলাম এবং আমার স্বামী পুত্র ভাল হইল, এই ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। তোমরা কেবল আপনারা সমস্ত জগৎকে ভালবাসিবে, এবং শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করিবে তাহা নহে; কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মিকাকে দেখাইতে হইবে, তিনি ঈশ্বরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার স্বামী, পুত্র, কন্যা সকলকে কত দূর উদার প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন। স্ত্রী যদি পুরুষকে কঠোর স্বার্থপর করিয়া দেন, তবে তিনি স্ত্রী নহেন। উদার প্রেম, প্রশস্ত ভালবাসার দৃষ্টান্ত পুরুষ নহে; কিন্তু এই জন্য ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সেই স্ত্রীজাতি কি করিতেছে? আপনাদের হৃদয় ক্ষুদ্র করিয়া পুরুষদিগেরও যাহাতে অধোগতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে। এই জন্য দেখিতেছি, এখনও পৃথিবীতে পুরুষপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি পরস্পরের অনুকূল হয় নাই। এই অবস্থায় ব্রাহ্মিকাদের এই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া, পুরুষদিগকে, ভ্রাতাদিগকে, স্বামী পুত্রদিগকে উদার প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কোমল করেন। কোন স্ত্রী স্বার্থপর হইয়া পুরুষের মনের সেই উচ্চ প্রেম বিনাশ করিবেন না; কিন্তু যত বার পুরুষেরা স্বার্থ নাশ করিয়া জগতের প্রতি প্রেমিক হইতে চেষ্টা করিবেন, যত বার পুরুষদিগের অন্তরে সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইবে, তত বার মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা তাঁহাদের সহায়তা করিবেন। যাহাতে পুরুষেরা সমস্ত জগৎকে আপনার বলিয়া ভালবাসিতে পারেন, নারীদিগকে সেই প্রেমশিক্ষা দিতে হইবে। স্বার্থপরতা স্ত্রীসমাজের প্রধান শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। উন্নতিপথের এই বিষম কণ্টক দূর করিয়া, ভগ্নীগণ, তোমরা ভাই ভগ্নীদের কল্যাণের জন্য এক একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া, প্রশস্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাও। যদি প্রথমেই অধিক লোকের ভার গ্রহণ করিতে না পার তবে এক এক জন এক একটি ভগ্নীর কল্যাণের ভার গ্রহণ কর। যাহাতে তাঁহার আত্মার কল্যাণ হয়, সমুদয় বুদ্ধি বল এবং অনুরাগের সহিত তাহা সাধন কর। তোমাদিগকে উচ্চ কার্য্যের ভারসকল গ্রহণ করিতে হইবে। কিসে এই আশ্রমের মঙ্গল হয়, কিসে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ এবং দেশের পরিত্রাণ হয় এ সকল বিষয়, তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে। প্রত্যেকে যেমন আপনার তেমনই অন্যের উপকারের জন্য একটি একটি সময় স্থির করিয়া রাখিবে। এইরূপ ব্রত পালন করিলে প্রতিদিন অল্পে অল্পে বহু দিনের সঞ্চিত স্বার্থপরতা এবং ক্ষুদ্রতা চলিয়া যাইবে। যাহাতে তোমাদের দৃষ্টান্তে তোমাদের স্বামী এবং সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্রশস্ত এবং প্রেমিক হয়, এই জন্য তোমরা বিশেষ সাধন কর।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

হিমালয়।

ধরি উচ্চ কলেবর,
ওই হিম গিরিবর,
শোভিতেছে দূরে;
কি মনোমোহিনী শোভা
অতি চারু মনোলোভা
আঁখি মুগ্ধ করে।
কে তোমারে থরে থরে
সাজালে যতন করে
বল গিরিবর!
তোমার পাষাণ অঙ্গে
নির্ঝর দিয়াছে রঙ্গে
কোন্ শিল্পকর?
অতীব সুরম্য স্থান,
দেখিলে জুড়ায় প্রাণ,
বিমোহিত মন।
মনে হয় নাই হেথা,
শোক, তাপ, হৃদি ব্যথা,
পাপ প্রলোভন।
শুনেছি পুরাণে কয়
যতেক মহর্ষিচয়
করি আগমন,
মায়ার সংসার ত্যজি
ঈশ-প্রেম রসে মজি
করিত অর্চ্চণ।
তব পদতলে বসি
সন্ন্যাসী, তাপসী, ঋষি
ঈশ গুণ গায়,
হেথা নিরজন স্থানে
ঈশ-চিন্তা জাগে প্রাণে
পাপ দূরে যায়।

সুদূর শেখর মরি!
ধবল বরণ ধরি
তুষার মণ্ডিত,
নিশীথ চাঁদিমাকরে
রজতের ধারা ঝরে,
সুশ্বেত রঞ্জিত।
প্রভাত রবির ভাতি
তাহে যেন স্বর্ণ জ্যোতিঃ
আঁখি বিমোহিত।
মনে হয় হিমালয়
তব এই সমুদয়
হীরক খচিত।
প্রকৃতির শোভা অতি
দেখিলেই হয় প্রীতি,
পাদপ মাধুরি।
আঁখি, মন, মুগ্ধ হয়
হেরিলে এ হিমালয়
যে দিকে নেহারি।
কাঞ্চন জঙ্ঘার স্থানে
তুষারের সন্নিধানে
যেতে কেবা পারে,
দারুণ তুষার ভেদি
একমাত্র সত্যবাদী
এ অবনীপরে
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির
হরিপদে মতি স্থির
তাই হিম রাশি,
উপেক্ষিয়া ধর্ম্মরাজ
গিয়াছেন স্বর্গমাঝ
এ জগতে আসি।
তব শিল্পী দয়াময়,
তাঁহার মহিমাচয়
গাও গিরিবর।
যখন যে দিকে চাই
কেবলি দেখিতে পাই
শিল্প মনোহর।
হিমালয় বল মোরে
যতনে আপন করে
কে সাজাল তোমা?
কোথা সেই রচয়িতা
সর্ব্বগুণময় পিতা
বলে দাও আমা।
কোথা গেলে দেখা পাব
কিরূপে সেথায় যাব,
বল গিরিবর!
প্রণমি উদ্দেশে তাঁরে
বসতি যে জন করে
তব শিরোপর।

হিমালয় দর্শনে হৃদয়োচ্ছ্বাস।

অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী তোমারি সৃজন,
না জানি অনাদি সীমা তুমি সে কেমন!
স্তরে স্তরে শৈল শ্রেণী নাহি দেখি শেষ,
অরূপ স্বরূপে মিশে ভুলি দুঃখ লেশ।
আহা! কি মধুর শোভা করেছ স্থাপন,
হেরিলে সার্থক হয় নরের নয়ন।
কত উপত্যকা শ্রেণী বন উপবন,
কত নদ কত নদী হয়েছে সৃজন।
কত যে ঝরণা রাশি বয়ে বারি ধারা,
কল, কল, কল রবে নামিতেছে তারা।
সুবিশাল ক্ষেত্র, আহা! কত যে সৌন্দর্য্য,
সীমা যায় না যে দেখা এ বড় আশ্চর্য্য।
পরিপূর্ণ ধান্যাদিতে সব শস্য-ভূমি,
সব কি মোদের তরে ওহে বিশ্ব-স্বামী?

খেলিছে দুলিছে সব আপনার মনে,
পড়িছে উঠিছে নিজ নিজ সখা সনে।
পাখী সব তরু পরে গাহিতেছে গান,
মিলায়ে সুধার সুর ধরিতেছে তান।
নিরখি তোমার দয়া মুগ্ধ হয় মন,
ভুলে থাকি তোমা ধনে মোহেতে মগন।
এইরূপে দিবানিশি নিরখি তোমারে
যাইব অনন্তলোকে লোক লোকান্তরে।
আশীর্ব্বাদ কর সবে দীন দয়াময়
সবাকার মতি যেন ও শ্রীপদে রয়।

রাণী অহল্যাবাই।

সত্যযুগে কত কত সতী সাধ্বী রমণীগণ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন তাহা সকল পাঠিকারই বিদিত আছে। কিন্তু কলিযুগেও সতী সাধ্বী বীরপত্নী অনেকের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে আজিও ভারত গৌরবান্বিত। আমরা সে সকল জীবন কেন ভুলিয়া যাই? পাঠিকা ভাই, একটি সুন্দর-চরিত্র বীরনারী—অহল্যাবাইয়ের জীবন বোধ করি আপনাদের অনেকেরই বিদিত আছে। আজ তাঁহারই গুণ আলোচনা করিতে আমরা আসিয়াছি। এই সকল পবিত্র জীবন অনুসরণ করিতে কেন আমরা যত্নবতী হই না? ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব বীররমণী "রাণী অহল্যাবাই" কিরূপ ভাবে জীবন কাটাইয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইন্দোর রাজ্যের সুভেদার মহ্লার রাও—তাঁহার পুত্র বধু অহল্যা বাই। অহল্যা বাই শ্বশুর ঠাকুরের অত্যন্ত আদরের ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা এতদূর ছিল যে সকলেই তাহাতে বশ হইয়াছিল। খণ্ডেরাও মহ্লার রাওয়ের পুত্র অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন; তখন অহল্যার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। একটি মাত্র কন্যা ও একটি মাত্র পুত্র। পুত্রটি দুর্দ্দান্ত মদ্যপায়ী ছিল—মাতার এই জন্য নিদারুণ মনোবেদনা পাইতে হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি "সহমরণে" যাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; পরে তাঁহার শ্বশুর বলিলেন "আমাকে ফেলিয়া তুমি যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার পুত্রশোক কতক নিবারণ হয়।" গুরুজনের কথা অবহেলা করিতে না পারিয়া তিনি অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার শ্বশুরের পরলোক গমনের পর তাঁহারই উপর রাজ্যের ভার অর্পিত হইল। তিনি নিজে অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবে জীবন কাটাইতেন—অধিকাংশ সময় দেব সেবায় দিতেন। রাজ্য অতি সুচারুরূপে চালাইতেন। দান ধর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে করিতেন। প্রজাগণ এ রাজ্যে অতি সুখী—সকলেই মাতা অহল্যার স্নেহে বশীভূত।

তিনি দেশে দেশে প্রচুর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, আজিও তাহা বর্ত্তমান। তিনি তীর্থযাত্রাকালে নিজে বৃক্ষ রোপন করিতেন—পথিকেরা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বসিবে সেই নিমিত্ত। মন্দির, রাজপথ, জলাশয় কত কত স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এমন সুবুদ্ধি প্রজাবৎসলা

রমণী অতি বিরল। রাজরাণী হইয়া পথের পথিক ভিখারিণীর প্রতিও তাঁর দয়া ছিল। প্রজারা তাঁর যশ গৌরব সর্ব্বদা গাহিত।

ভিন্ন দেশের রাজা সকল তাঁর উদার চরিতের গুণে সকলেই তাঁহার মিত্র ছিল। একদা যুদ্ধকালে গাইকোয়ার মহারাজার নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন, মহারাজা বিংশতি সহস্র সৈন্য দানে তাঁহাকে সাহায্য করেন।

তাঁর দুরাচার মদ্যপায়ী পুত্র বিনা কারণে এক ব্যক্তির প্রাণ নাশ করে। সেই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া সেই পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার শোকে অহল্যা নিতান্ত কাতর হইলেন। তৎপরে তাঁর একমাত্র দৌহিত্র—তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহে লালন পালন করিতেছিলেন—সে দৌহিত্রটিও অকালে দেহ ত্যাগ করিল। অহল্যা শোকের আঘাতে নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন তৎপরে একমাত্র জামাতাও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। একমাত্র কন্যা মুক্তাবাই তাঁহার সহিত "সহমরণে" যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অহল্যা এই নিতান্ত লোমহর্ষণ ব্যাপারে ম্রিয়মাণ ভগ্ন হৃদয়ে বার বার কন্যাকে বারণ করিতে লাগিলেন।

কন্যা কিছুতেই সম্মত না হইয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি আর কত দিন বাঁচিবে? দুই চারি বৎসরেই তোমার এই পবিত্র জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমাকে বহু দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। পতি-পুত্রহীন হইয়া তোমার মৃত্যুর পর আমার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখ। জীবন তখন আমার পক্ষে ভারবহ হইবে।" এইরূপে নানারূপ কথায় মাতাকে সম্মত করাইলেন। অহল্যা যখন দেখিলেন কন্যা কিছুতেই নিবৃত্তা হইবার নহে তখন তিনি অগত্যা সম্মতা হইলেন।

সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে অহল্যা দেবী স্বয়ং চিতাদর্শনে প্রস্তুত হইলেন।

নর্ম্মদা নদীর উপকূলে চিতা প্রজ্জলিত হইল; অহল্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

যে অহল্যা দেবীর প্রাণ সামান্য নরনারী ভূচর খেচরের দুঃখে কাঁদিত, তিনি তাঁহার হৃদয়-পুত্তলিকাকে চিতায় বিসর্জ্জন দিতে উপস্থিত। অহল্যার হৃদয় প্রথম হইতে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, তথাপি তিনি কিয়ৎক্ষণ অবধি ধীর ভাবে চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন অগ্নিশিখা মুক্তার সুকুমার দেহ স্পর্শ করিল এবং মুক্তার কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিসহযোগে প্রতিবেশীগণ চীৎকার করিয়া মুক্তার আর্ত্তনাদ নিমগ্ন করিতেছিল। স্নেহবৎসলা অহল্যা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উন্মত্তার ন্যায় সেই জনস্রোত ভেদ করিয়া চিতায় ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তাঁহার

দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহার দুইটি হস্ত ধরিয়াছিল, তিনি আর চিতায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না। কিন্তু নিজে নিজের হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার এবং তাঁর স্বামীর দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। এই ঘটনায় তাঁহার এত দূর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল যে তিনি তিন দিবস কোনরূপ আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করেন নাই। কিছুকাল পরে তিনি এক স্মৃতিমন্দির কন্যা ও জামাতার স্মরণার্থ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

অহল্যা ত্রিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রের শোকে তাঁর শরীর মন জর্জ্জরিত হইয়াছিল। মৃত্যু তাঁহার নিকট শান্তিময় বোধ হইল। ষাট বৎসর বয়সে অহল্যা পরলোক গমন করেন।

অহল্যা দেবীর কীর্ত্তি ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। মহারাষ্ট্রীয় হোলকার-বংশ ধন্য—যে কুলে অহল্যা দেবীর ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠা বীর রমণীর জন্ম!

প্রার্থনা।

তব এই সুপ্ত বিশ্বে আজ
একা আমি কেন
বিনিদ্র নয়নে নাথ রয়েছি জাগিয়ে!
এ বিশ্বের শান্ত ছবি
অশান্ত এ প্রাণে
অধীর ঝটিকা যেন দিতেছে বহিয়ে!
অসীম ও নীলিমা ছাইয়া
চেয়ে আছে কারা
স্থিরোজ্জ্বল শান্তিময় আলোক নয়নে!
মনে হয় যেন ওরা
ডাকিতেছে মোরে
যেন কোন শান্তিপূর্ণ স্নেহের ভুবনে!

ভাবি তাহে এ অশান্ত প্রাণ
বুঝি শান্ত হবে,
বুঝিবা মিটিবে তা'র স্নেহ প্রেম তৃষা!
শত স্নেহ বাহু পাশে
বাঁধি লয়ে মোরে
বুঝিবা মিটাবে তারা এ প্রাণের আশা!

হায়রে দুরাশা এ যে মোর!
আপনারে চাহি
ভুলাতে আপনি আপন ছলনা দিয়া!
প্রাণের বাঞ্ছিত যাহা,
তাহে নাহি পেলে
সারা বিশ্ব ল'ভেও কি তৃপ্তি মানে হিয়া!

এ জীবনে আকাঙ্খিত যাহা,
বল কোন দিন
পাব তা'রে পূর্ণরূপে হৃদয়ে ধরিতে।
তৃপ্ত হবে এ পিপাসা,
পূর্ণ হবে প্রাণ,
এ অধীর ব্যাকুলতা হবে না বহিতে।

অসম্ভব একি অতি নাথ
মানব জীবনে,
পূর্ণতা আদর্শ রবে শুধু কি স্বপনে?
যত সাধ ভালবাসা
অপূর্ণ কি সব,
হয় না মিলন হেথা জীবনে জীবনে?

প্রতিদান নাহি কিগো হেথা
প্রাণের, প্রেমের ?
যে যাহারে চায় সে কি চায়না গো তায় ?
বারিধির তীরে বসি
শ্রান্ত তৃষাতুর
পাবে না মিটাতে তা'র দীর্ঘ পিপাসায় ?

কেন তবে দিয়াছিলে বল
এ দেহ জীবন,
এ চির অতৃপ্ত প্রাণ, এ সব কামনা ?
এ উদ্দাম স্রোত কেন
বহালে জীবনে,
কেন বল দিলে এই অনন্ত সাধনা ?

এ উচ্ছল স্রোত মুখে তবে
বুঝি ভেঙ্গে যায়,
পরাণের বাঁধ আজ শত খণ্ড হ'য়ে !
ক্ষুদ্র এ তরণী মম
বুঝিবা কোথায়,
গভীর আবর্ত্তে কোন যায়গো ডুবিয়ে !

কে পারে রোধিতে বল প্রভু
তোমা বিনা আর,
আকুল চঞ্চল এই অধীর প্রবাহ !
মুখ পানে না চাহিলে
কে চাহিবে বল,
জগতে আপন আর আছে কিগো কেহ ?

তুমি জান হে হৃদয়-স্বামী !
তুমি প্রিয়তম ;—
কিম্বা কেহ আছে মোর এ জগৎ পরে
তোমা হ'তে প্রিয়তর,
অতি প্রেমাস্পদ,
কার মুখ নিশি দিবা জাগে হৃদি ভ'রে !

ক্ষমা কি করিবে নাথ মোরে
দুরবল জেনে ?—
অধীর এ প্রাণ নাথ নারি যে বাঁধিতে !
তবু জানি এ প্রাণের
গভীর পিপাসা
কেহ নাই এ জগতে পারিবে মিটাতে !

জুড়ি মম হৃদয় আসন
তুমি এস নাথ,
পূর্ণ কর শূন্য এই অভাব বেদনা !
ভুলে যাব জীবনের
পুরাণ সে সাধ,
নব ভাবে নব গীত করিব রচনা !

তোমারি চরণ অভিমুখে
ফিরাইয়ে দাও,
এ উদ্দাম আকাঙ্খার লালসার গতি।
কামনা কৃতার্থ হোক
তোমারে বরিয়া,
ও পূত চরণমূলে লভি পরিণতি !

আকুল এ পিয়াসা আমার
তৃপ্ত হোক নাথ,
তব প্রেম সুধাধার পিয়ে অবিরত !
উন্মত্ত বাসনা বহ্নি,
স্থির স্নিগ্ধোজ্জ্বল
পূত হোম অগ্নি রূপে হোক পরিণত !

কয়েকটি মহৎ দৃষ্টান্ত।

এক সময় Francis Xavier জাপানে ধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। একদিন জনতাসম্মুখে উপদেশকালে কতকগুলি লোক তাঁহাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ আরম্ভ করে, কিন্তু তিনি তাহাতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থিরভাবে বক্তৃতা করিয়া যান। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া কথা বলিবার ছলনা করিয়া ফ্রান্সিস জেভিয়ারের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, ফ্রান্সিস জেভিয়ার কথা শুনিবার জন্য মুখ বাড়াইবামাত্র উক্ত ব্যক্তি তাঁহার মুখে থুথু ফেলিয়া পলায়ন করে ; শান্তস্বভাব জেভিয়ার কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে রুমালে মুখ মুছিয়া পুনরায় উপদেশ আরম্ভ করেন। তাঁর এই সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেই মোহিত হয় এবং ঘৃণার পরিবর্ত্তে অবশেষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করে।

Martin Luther মৃত্যুকালে যে উইল লিখিয়া যান তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ছিল ;—

প্রভু পরমেশ্বর, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমায় দরিদ্র করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। আমার গৃহ নাই, জমী নাই, ধন নাই যাহা আমি রাখিয়া যাইতে পারি। আমাকে তুমি স্ত্রী সন্তান ছিয়াছ তাহা আমি তোমাকেই আবার সমর্পণ করিতেছি। তুমি যেমন আমায় এতদিন লালন পালন করিয়াছ ইহাদেরও তুমি তেমনি করিয়া দেখিও, শিক্ষা দিও, রক্ষা করিও।

জর্জ ওয়াসিংটন্ যখন অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন তখন একবার নাবিক হইয়া জলযাত্রা করিবার মনস্থ করেন ; এবং সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া জননীর নিকট বিদায় লইতে গমন করেন। সেখানে গিয়া স্নেহময়ী মাতার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া তাঁর হৃদয় বিচলিত হইল এবং মনে ভাবিলেন যে তিনি যাইলে তাঁর মাতার হৃদয়ে ত বড় আঘাত লাগিবে ! তখন তিনি কিছু না বলিয়া কেবল তাঁর ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি ফিরিয়া গিয়া জাহাজ হইতে আমার দ্রব্য সমুদায় লইয়া এস আর তাহাদের বলিও আমি আমার জননীর হৃদয়ে আঘাত দিয়া যাইব না।" এই কথায় ওয়াসিংটনের মাতা অবাক হইলেন ও বলিলেন, "জর্জ, যে সন্তানেরা পিতা মাতাকে সম্মান করে ভগবান তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন ; আমার এই বিশ্বাস তোমাকেও তিনি বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

উত্তর আমেরিকাবাসীগণ অত্যন্ত সত্যপ্রিয়। বাক্যদান করিলে বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাহা রক্ষা করে। নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

১৭২৭ খৃঃ যখন Winnebago যুদ্ধ হয় সে সময় ডেকারী নামক এক প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং আর চারিজন ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সে সময় ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে কয়েকটি নিহত হয় এবং সৈনাধ্যক্ষ এরূপ আজ্ঞা করেন যে যদি

হত্যাকারীগণকে না আনয়ন করা হয়, তবে ডেকারী ও তাঁর সঙ্গীদিগের শাস্তি-স্বরূপ প্রাণদণ্ড হইবে। ইহার জন্য দশ দিন মাত্র সময় প্রদান করেন। ডেকারীর সম্মুখেই এই আদেশ প্রদত্ত হইল, ডেকারী অবশ্য নিজে যে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা জানাইল; কিন্তু তথাপি বলিল তাহার অভাবে যদিও তার সুবৃহৎ আত্মীয় পরিবার অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, কিন্তু সে জন্য মৃত্যুকে সে ভয় করে না। ক্রমেই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। হত্যাকারীগণের কোন খবর আসিল না। বহু দিন বন্দী থাকিয়া ডেকারীর শরীর অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। তখন ডেকারী কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিল নদীতে স্নান করা তার চিরদিন অভ্যাস, যদি একবার অনুমতি হয় ত নদীতে স্নান করিয়া কতকটা সুস্থতা লাভ করে। তখন কাপ্তেন সাহেব ডেকারীকে বলেন, "তুমি যদি সৈনিক পুরুষের প্রতিজ্ঞা দান করিতে পার যে কখনও এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে না তবে যে কয়দিন অবশিষ্ট আছে প্রত্যহ তুমি নদীতে স্নান করিতে পারিবে। ইহাতে ডেকারী প্রথম কাপ্তেনের হস্ত ধারণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করে, পরে দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সে কখনও এক পদও যাইবে না। এবং ইহাও বলিল যে যদি তার একটি জীবনের পরিবর্ত্তে শত জীবন থাকিত বরঞ্চ সে সমুদায়ই সে প্রদান করিত কিন্তু তথাপি তার বাক্য কখনও লঙ্ঘন হইবে না এবং তার জাতির চিরগৌরব তাহা দ্বারা হ্রাস করিবে না।

যখন তাহাকে মুক্ত করা হইল অনেকেই তাহাকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দেয়, কিন্তু ডেকারী গর্ব্বিত স্বরে বলে, "তোমরা কি মনে কর যে সত্য অপেক্ষা আমার জীবনকে আমি বড় মনে করি? আর আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে আমি আমার জীবন রক্ষার্থ বিশ্বাস ঘাতক হইব?"

মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ডেকারী প্রাণপণে তার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল, মৃত্যুর নাম শুনিয়াও কোনরূপ বিচলিত ভাব দেখায় নাই। কিন্তু তাহার পুরস্কার সে পাইল। শেষ দিবসে ইংরাজদলের জেনারেল আসিয়া তাহাদের মুক্তিবিধান করিলেন।

খড়িগড়ের রাণী।

হিন্দুরমণীদিগের মধ্যে কত যে শিক্ষিতা রমণী আছেন, তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। খড়িগড়ের রাণী একজন হিন্দুরমণী, তিনি শিক্ষিতা ও বিদুষী। খড়িগড় অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্গত। রাজধানীর নাম সিঙ্গি। সিঙ্গির রাজবাটী রাজ্ঞীর বাসস্থান অনেকটা ইংরাজী

ধরণের। রাজ্ঞীর নাম শরৎকানওয়ার, তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল ও মিষ্টস্বভাবা। শরৎকানওয়ার আকামের রাজার কনিষ্ঠা কন্যা, তাঁহার মাতা নেপাল-রাজপরিবারস্থ। প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল রাজকুমারী শরৎ জন্মগ্রহণ করেন, জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁহাকে রাজধানী থাটমাণ্ডুতে লইয়া যাওয়া হয়। নেপালের রাজমন্ত্রী, যিনি Lord Clydeকে Mutinyর সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু রাজকুমারীর মাতা স্বজাতির কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি খড়িগড়ের রাজা ইন্দ্রনক্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন। রাজকুমারীর যখন বিবাহ হয় তখন তিনি দশম বর্ষীয়া বালিকা এবং রাজা ঊনবিংশতি বৎসরের যুবা ছিলেন। রাজকুমারীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া তাঁহার শ্বশ্রূমাতা তাঁহাকে নাগ্‌রী ভাষা শিখাইতে লাগিলেন, তৎপরে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে উর্দ্দু ভাষা শিখাইয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি স্বজাতীয় সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতে পারিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন ও রাজ্যশাসন-প্রণালী সংশোধন করিতে যত্নবতী হইলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়াতে রাজা আরও দুইবার বিবাহ করেন। তথাপি রাজ্ঞী শরৎকানওয়ার চিরদিন রাজার প্রিয় ছিলেন। রাজার ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তান না থাকাতে, রাজ্ঞী শরৎকানওয়ারই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। স্বদেশীয় প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হয়। রাজ্ঞী স্বামীকে জীবিতাবস্থায় সকল বিষয়ে—কি সংসারকার্য্য-সাধনে বা রাজকার্য্য সাধনে—সাহায্য করিতেন। অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও তিনি উপযুক্তা রাজ্ঞী হইয়া রাজ্য পালন করেন। স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি অল্পবয়স্কা ছিলেন। তাঁহার সপত্নীগণ ও রাজার আত্মীয়গণ তাঁহাকে অনেক কষ্ট দেয়, তাহারা রাজকর্ম্মচারীর হস্তে কার্য্যভার দিতে চাহে। কিন্তু যখন রাজ্ঞী নিজেকে রাজকর্ম্ম সাধন করিতে সক্ষম মনে করেন তখন তিনি সমুদায় কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এবং এমন সুচারুরূপে তিনি রাজ্য পালন করেন যে তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হয়।

দুই বৎসর হইল তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজিতে কথা বলিতে ও চিঠি লিখিতে পারেন। তিনি Piano বাজাইতে পারেন, ইংরাজী পুস্তকও পাঠ করেন। তাঁহার এক্ষণে ইচ্ছা বিলাত গমন করেন। সম্রাট এডওয়ার্ডকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করেন। রাজ্ঞী শরৎকানওয়ার এত শিক্ষিতা হইয়াও স্বজাতীয় বেশ ভূষা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদিগের বেশ কতকটা মুসলমানদিগের মত।

রাজ্ঞীর মাতামহী স্বামীসহ চিতানলে নিজ দেহ ভস্মীভূত করেন, তাঁহার মাতা বৈধব্য যাতনায় শরীরকে অত্যন্ত ক্লেশ দান করেন ও কঠোর ব্রত অবলম্বন করেন। রাজ্ঞী শরৎকানওার এ সকল ভাব অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি শিক্ষিতা নারী; এরূপে শরীরকে নির্যাতন করেন না। রাজ্ঞী অত্যন্ত ধার্ম্মিকা নারী; তিনি সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম সাধনে রত। একজন ব্রহ্মাচার্য্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকেন ও প্রতিদিন পূজাদি সম্পন্ন করেন। রাজ্ঞী শরৎ কানওয়ার আধুনিক সভ্যতার মধ্যে থাকিয়াও স্বজাতীয় মতে রাজ্যের উন্নতি-সাধনে সতত যত্নবতী।

আর কেন?

বিষয়-ঘোরে মত্ত হইয়া অনেক দিন ত কাটাইলে? প্রাণের বাসনা কি মিটিল? সংসারের সেবাতে জীবন-ক্ষয় করিলে, বিশ্বজনের মন যোগাইতে অনেক সাধ্য সাধনা করিলে, আরও কি সাধ আছে? সংসার-কারাগারে বন্দী হইয়া আত্মাকে কত কাল এমন নির্জ্জীব করিয়া রাখিবে? মুক্ত আত্মা মুক্তাকাশে উড়িবে, না ক্ষুদ্র বাসনা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকিবে? চল আর না, অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, জীবনের সন্ধ্যা আগত প্রায়। গৃহে যাইবার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া আত্মানুসন্ধান করিয়া লও। পথের সম্বল সঙ্গে রাখ, শেষে ভবসাগরের তরঙ্গ দেখিয়া যেন ভয় পাইও না।

সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে যে ধন রত্ন, সব কি হারাইয়া ফেলিলে? কি বলিয়া সেখানে উত্তর দিবে? তাই বলি আর বিলম্ব করিও না, এখনও সময় আছে। এখনও জাগিয়া উঠ; নিজ কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে লও, কার্য্য যাহা বাকি আছে শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন কর। আপন সুখ অন্বেষণে আর ঘুরিও না, ভ্রান্তি ছায়া প্রাণকে কতক্ষণ তৃপ্তি দান করিবে? মায়া-মরীচিকায় পড়িয়া কত প্রাণ, কত জীবন হাবুডুবু খাইতেছে দেখিতেছ না কি? নিজেও ত তার কত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছ? তবে ভগ্নীগণ, তোমরাও এস, সকলে মিলিত হইয়া একটি ভগ্নী-মণ্ডলী প্রস্তুত হই। নিজ নিজ দুঃখে কাতর হইয়া নিজ অদৃষ্টের স্তুতিবাদ করিয়া অনেক দিন কাটাইয়াছি। আর কেন?

এখন একবার পরের দিকে তাকাই। কত গৃহহীন সম্বলহীন ভগ্নী কাঁদিতেছে এস তাদের সঙ্গে অশ্রু বিসর্জ্জন করি। নিঃস্বার্থ স্নেহে স্বার্থপরতার রজ্জু ছিন্ন করি। আমরা অন্তঃপুরবাসিনী বলিয়া কি পরদুঃখে কাতরতা প্রকাশ করিবারও আমাদের অধিকার নাই? অবশ্যই আছে, অন্তঃপুরে থাকিয়াও আমরা জগতের দুঃখে কাঁদিতে পারি। প্রাণের স্নেহ ও দয়া বিলাইতে পারি, সে স্নেহ, সে সহানুভূতি প্রাচীর মানে না, অবরোধ মানে না। এক মুষ্টি অন্ন, এক বিন্দু অশ্রু, একটি মিষ্ট কথা দ্বারাও কত উপকার সাধিত হয়। কিন্তু এ দয়া ও স্নেহ অন্তরে,

বাহিরে নয়। প্রথম হৃদয় একবার অনুভব করিতে শিক্ষা করুক পরে সেই অন্তর্নিহিত স্নেহ দয়া বাহিরে বিনিসৃত হইবে। সেই অনুভূতি যে নাই, সেই পরদুঃখে কাতরতা, পরের সেবার জন্য ব্যাকুলতা নাই, কারণ—কেবল এই স্নেহ দয়ার অভাব; আর কিছুই নহে। তাই বলি সেই ভাবগুলি যাহাতে হৃদয়ে জাগরিত সঞ্চারিত হয় তাহারই চেষ্টা করি। নিজ সুখ-সাধনে ক্ষণকালের জন্য সুখ হইতে পারে, কিন্তু কে কবে শুধু স্বার্থসুখ সাধন করিয়া চিরসুখ পাইয়াছে কেহ কি বলিতে পারে? কিন্তু আত্মসুখের পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া একবার পরসুখে সুখী হইতে চেষ্টা করিয়া, পরের সেবা করিয়া দেখ না! ইহাতে কত শান্তি কত সুখ পাইবে তাহা বর্ণনাতীত।

ভ্রাতৃসমাদর।

১

আজি এ উচ্ছ্বাস কেন বৎসরের পরে
কেন ভাই ভগ্নীগণে, আজি শুভ সম্মিলনে
কেন সমাগত সবে প্রফুল্ল অন্তরে?

২

অনিবার্য্য এ উচ্ছ্বাস ভুলিবার নয়,
ভাই ভগ্নী সম্মিলন, প্রীতি পূর্ণ দরশন
উভয়ের হৃদয়ের আজি বিনিময়!

৩

আসিয়াছি তাই মোরা বৎসরের পরে,
প্রীতি পূর্ণ ভক্তি ভরে, সমাধি প্রাঙ্গন পরে
দিব আজ ভাই ফোঁটা প্রীতির অন্তরে।

৪

অগ্রণী মোদের দেবী অঘোর কামিনী
এই দিনে এই স্থানে, ব্যাকুলতা পূর্ণ প্রাণে
কহেন উচ্ছ্বাসে কত প্রীতির কাহিনী।

৫

সে দিনও এখানে সাধ্বী ভগিনী সুসার
প্রাণের শোণিত দিয়ে, ভ্রাতৃপ্রেম অভিনয়ে,
দেখালেন প্রেম কত উচ্ছ্বাস অপার।

৬

আজি এ শ্মশানে মাত্র প্রতিধ্বনি তার
যেরূপ উচ্ছ্বাসে আর নাহি কেহ দাঁড়াবার
লও তবু ভ্রাতৃদল এই উপহার।

শ্রীমতি সুমতি মজুমদার।

ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল।

এক রাজার একটি অত্যন্ত ধার্ম্মিক মন্ত্রী ছিলেন, যাহা ঘটিত তাহাতেই তিনি মঙ্গল দেখিতেন। লোকে যাহাকে অমঙ্গল বলে তাহা ঘটিলেও মন্ত্রী বলিতেন, ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল। ইহাতে অন্যান্য অল্প-বিশ্বাসী লোকেরা বড় বিরক্ত হইত। রাজার নিজেরও তেমন একটা বিশ্বাস ছিল না, মন্ত্রীর ঐরূপ কথা শুনিয়া কখনও উপহাস করিতেন, কখনও বা বিরক্ত হইতেন। একদিন একখানি ধারাল ছুরী ব্যবহার করিতে হঠাৎ রাজার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল অনেকখানি কাটিয়া গেল, সকল লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, মন্ত্রী বলিলেন ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল, ঔষধ ব্যবহার করুন, সারিয়া যাইবে। অমঙ্গল কিছু হয় নাই। এরূপ কথায় রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং মন্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজার ঘা শুকাইয়া দাগ রহিয়া গেল। কিছুদিন পরে রাজা মৃগয়ায় যাইতে উদ্যোগ করিলেন, হাতী, ঘোড়া, লোকলস্কর সকল চলিল, মন্ত্রীও চলিলেন। রাজা চক্রান্ত করিয়া মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া একটা হরিণের পশ্চাৎ অনেকক্ষণ দৌড়াইলেন, লোকজন সব বহু দূরে পড়িয়া রহিল। গভীর বনে দুইজনে উপস্থিত হইলেন, তখন হরিণটিরও আর অন্বেষণ পাইলেন না; উভয়েই তৃষ্ণায় কাতর; জলের অনুসন্ধান করিতেছেন, বনের মধ্যে কোথায়ও জল পাইতেছেন না। এমন সময় একটা কূপের মতন দেখিয়া মন্ত্রী সেখানে যাইয়া দেখিতেছেন উহাতে জল আছে কি না, এমন সময় রাজাও সেখানে উপস্থিত হইলে বুঝিলেন কূপে জল নাই; এদিকে এক ধাক্কা মারিয়া মন্ত্রীকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। মন্ত্রী পড়িবার সময়ও বলিলেন ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল। রাজা বলিলেন, এইবার তোমার ভাল হউক। এই বলিয়া কিছুদূর যাইতেই বনচারী ডাকাতেরা রাজাকে ধরিল ও অত্যন্ত আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আজ মা কালীকে অতি সুন্দর বলি দিতে পারিব বলিয়া মহা উল্লাস করিতে লাগিল। রাজা বুঝিলেন তিনি নরবলি হইতে চলিলেন। ডাকাতেরা অতি যত্নে তাঁহাকে লইয়া স্নান করাইয়া কালীর সম্মুখে উপস্থিত করিল, সকলই প্রস্তুত; মা কালীকে সুন্দর পুরুষ বলিদান করিয়া কৃতার্থ হইবে। এমন সময় হঠাৎ এক জন দেখিল যে রাজার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলে একটা ক্ষতের দাগ, দেখিয়াই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সকলকে বলিল, যে, ভাই ইহাকে বলিদান করা হইবে না, এটা অক্ষত দেহ নহে। তখন রাজাকে ছাড়িয়া দিল। রাজা ঘায়ের দাগের খাতিরে প্রাণ বাঁচিল দেখিয়া বুঝিলেন ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল। তখন যাইয়া সেই কূপ হইতে মন্ত্রীকে উঠাইয়া বলিলেন যে মন্ত্রী সত্য কথাই বলেন, ভগবান যে তাঁহার হাত কাটিয়াছিলেন তাহাও ভালর জন্য। অতএব মন্ত্রীকে কূপে ফেলিয়া বড় অপরাধ করিয়াছেন। মন্ত্রী বলিলেন যে, না, তাহাও ভালর জন্য, কারণ ডাকাতেরা ক্ষতদেহ রাজাকে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া অক্ষতদেহ মন্ত্রীকে ছাড়িত না, তাহার কূপে পড়িয়া প্রাণরক্ষার কারণ হইয়াছে।

প্রকৃতি।

পৃথিবীতে কত শত প্রকৃতির মানব দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে অসংখ্য মানব জাতি—সেই সমুদয় মানবের মধ্যে একের প্রকৃতি অন্যের সঙ্গে সমভাবে মিলে না। প্রত্যেককেই নিজ নিজ প্রকৃতির পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। আবার ইহাও প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে নিজের প্রকৃতিতে না মিলিলেই মানুষ অন্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া যায়। কিন্তু যিনি বিরক্ত হন তাঁর কি ইহা একবার চিন্তা করা উচিত নয় যে আমার প্রকৃতিও তো অন্যের ঠিক অনুরূপ নয় তবে অন্যেরাও তো আমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারে। ভগবানই এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দান করিয়াছেন এবং তিনি প্রতি জনকেই ভালবাসিতেছেন। তাঁহার তুল্য স্নেহময় আর কে হইতে পারে!

সরমা শৈশবেই মাতৃহীন হইয়াছিল। কিন্তু তার মায়ের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই সে শুনিল তার আর একটী নূতন মা আসিয়াছেন। তার সেই নূতন মা তার সঙ্গে বেশী কথা কখনও বলিতেন না কিন্তু প্রথম দর্শনেই যখন উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি পতিত হইয়াছিল তখনই সরমা যেরূপ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সে জীবনে ভুলিতে পারে নাই। তাহার পর যখনই তার নূতন জননী—সে বাড়ীর গৃহিণী তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন সে কেবল যে চমকিয়া উঠিত তা নয় কিন্তু ভয়ে তাহার হৃদয়ের রক্ত যেন দিন দিন শুষ্ক হইয়া আসিত। সরমা যখনই একটু সময় পাইত নির্জ্জনে বসিয়া তার মার একখানি ছোট ফটো লইয়া দেখিত এবং মনে মনে তাঁর সেই স্নেহের মূর্ত্তিখানি ও তাঁর সেই স্নেহ-সম্বোধন আলো-

চনা করিতে করিতে তার চক্ষু অশ্রু-জলে আপ্লুত হইয়া উঠিত। এইরূপে নীরবেই সে জীবনের বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া ১৩ তের বৎসর পার হইয়া গেল; তাহা দেখিয়া তাহার নূতন জননী সরমার পিতাকে নিতান্ত উৎপীড়ন করিয়া সরমার বিবাহ দিলেন। যদিও সরমার পিতৃ-হৃদয় একেবারে নীরস পাষাণ অথবা কন্যার প্রতি স্নেহহীন ছিল তাহা বলা যায় না কিন্তু তিনি পত্নীর সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তিতে সদাই শঙ্কিত ছিলেন; স্ত্রী যাহা বলিতেন তাহা তিনি নীরবেই কেবল প্রতিপালন করিয়া যাইতেন। তাই তিনি পত্নীর অনুরোধেই অতি দরিদ্র পরিবারে সরমার বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন।

সরমার শ্বশুরালয় পিতার গৃহ হইতে বেশী দূরে ছিল না। তার নূতন জননী আর তাহাকে কখনও আসিতে দিতেন না। যদিও সরমার শ্বশুরের অর্থবল ছিল না, কিন্তু সে গৃহে আসিয়া পর্য্যন্ত স্নেহ, ভালবাসা, দয়া ও বাৎসল্য এ সকলের কোন অভাব সে অনুভব করিতে পারে নাই।

সরমা এক বৎসর না যাইতেই জন্মের মত শ্বশুরাবাস পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ-গৃহে আসিল। সরমার পিতা নির্ম্মম ছিলেন না; যখন তিনি শুনিলেন তাঁহার বালিকা সরমা চিরজীবনের তরে সকল সুখ হারাইয়াছে, অকালে তাঁহার পুত্র-সম জামাতা পৃথিবীর সকল ফেলিয়া কোন অজানিত দেশে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি একবার নিজে গিয়া প্রাণের দুহিতাকে লইয়া আসিলেন।

আবার সে তার নূতন জননীর সেই ভীষণ দৃষ্টির মধ্যে পতিত হইল এবং আবার সে আগেকার মত নির্জ্জনে তার মার কথা স্মরণ করিত। কিন্তু এবার শুধু তার মাকে লইয়াই থাকিত না উপরন্তু আর একখানি স্নেহভরা মুখ যাহা সে হারাইয়াছিল—সেই স্বামীর পবিত্র স্নেহ-দৃষ্টি ভাবিতে ভাবিতে সরমা আকুল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া একের পর আর একটী করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল।

সরমাদের বাড়ীর অনতিদূরে কৃষক-পল্লী ছিল। সরমা মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইত। সরমাকে সকলেই খুব ভাল-বাসিত, সরমাও তাহাদের স্নেহ-চক্ষে দেখিত। একদিন সরমা বাড়ী আসিতে-ছিল, পথে হঠাৎ দেখিল একটি ১২।১৩ বৎসরের বালক সরমার দিকে তাকা-ইয়া আছে। সরমা এমন দৃষ্টি জীবনে কখনও দেখে নাই। সরমার মনে হইল যেন স্বর্গীয় কোন আনন্দে তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভরিয়া গেল। বাল-কের সৌম্য শান্ত সরল মুখখানি হাসিতে যেন মাখা। সরমা তার সেই শীতল সুখময় দৃষ্টিতে কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে বালক যেখানে পথের ধারে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে যাইয়া তার সঙ্গে কথা কহিল। অনেক প্রশ্ন সরমা তাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে করিয়াছিল, কিন্তু বালক

তার স্বাভাবিক সরল সুন্দর চক্ষু নত করিয়া প্রফুল্ল আনন্দে ধীরে—অতি ধীরে উত্তর দিয়াছিল। সরমা পৃথিবীর সবই যেন ভুলিয়া গিয়াছিল, সে যে সেই ভাবে কতক্ষণ সেই পথের ধারে গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল তা সে জানি-তেও পারে নাই। তখন সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল—সে ভাবিতে লাগিল, এ সংসারে কত বিচিত্র প্রকৃতি আবার কত বিচিত্র মানব চক্ষুর দৃষ্টি, কাহাকে দেখিলে বিস্ময়ে ভীতি সঞ্চারিত হয় আবার কাহারও একটী চক্ষের দৃষ্টি জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। এই বিচিত্র বিশ্ব-সংসারে সেই বিশ্বপতি বিধাতা কাহার জন্য কাহাকে করিয়াছেন কে জানে! সরমা এই প্রকৃতি-বৈচিত্র্য ভাবিতে ভাবিতে সবই যেন ভুলিয়া গেল। সে যে কে তাহাও সে সময়ে যেন তাহার মনে ছিল না।

গাছ পালার কথা।

সকলেই জানেন গাছের সিকড় মাটি হইতে এক রকম রস টানিয়া লয়। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছ শুকাইয়া যায়। মাটিতে লবণ জাতীয় নানা রকমের সার থাকে—সেইগুলি গাছের খাদ্য—তাহারা জলে দ্রব হইয়া শিকড়ের ভিতর একটু একটু করিয়া যায়। তাহা ছাড়া পাতাগুলিও বায়ু হইতে কতক পরিমাণে আহার সংগ্রহ করে। আমরা যে পাতার রং সবুজ দেখি তাহার কারণ—পাতার ভিতর এক রকম খুব ছোট ছোট সবুজ বর্ণের দানার মত আছে। এই দানাগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখা যায়। উহারাই সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে। যদি আমরা পাতা spiritএর মধ্যে ডুবাইয়া রাখি তাহা হইলে কিছু-ক্ষণ পরে দেখিতে পাই যে spiritএর রং সবুজ হইয়া গিয়াছে ও পাতার রং উঠিয়া গিয়াছে। যত বড় বৃক্ষ হউক না কেন তাহার খাদ্য এই অতি ছোট ছোট সবুজ দানার সাহায্যে পাতার মধ্যেই প্রস্তুত হয়। যেমন মানব দেহে দেখা যায়, উদরে সমুদায় আহারীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইলে সেই স্থানে উহা পরিপাক হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া সমুদায় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদের পুষ্টিসাধন করে; সেই রকম পাতার মধ্যে সমুদায় পুষ্টিকর সামগ্রী প্রস্তুত হয়,—সিকড় যে রস সংগ্রহ করে ও পাতা যাহা বাতাস হইতে যোগাড় করে—এই দুইটি মিলিয়া এক প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। শ্বেতসার বা starch—যাহা আলু প্রভৃতি কয়েকটি ঐ জাতীয় সবজীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার এক দৃষ্টান্ত। পাতার মধ্যে যখন খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহা প্রথমে পাতার শিরার ভিতর দিয়া, পরে গাছের প্রশাখা শাখা দিয়া অবশেষে গুঁড়ী অবধি সমুদায় জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে। শীতের সময়ে কাণ্ডের মধ্যে বৃক্ষের আহার সঞ্চিত থাকে। বসন্ত হইতে বর্ষা পর্য্যন্ত কয়মাস গাছের সবুজ

পাতা সূর্য্যের আলো, বাতাস ও বৃষ্টির সাহায্যে আহার সংগ্রহ করে এবং উহা কাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে। বৃক্ষটি শীত কালে কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, আবার বসন্ত আসিলে কাণ্ডের ভিতর সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া নব পত্র পল্লবে শোভিত হয়। শীত কালে উহাদের আহার সংগ্রহ করিবার উপায় থাকে না কারণ সে সময়ে গাছের পাতা ঝরিয়া যায়।

কতকগুলি গাছের শিকড় এক স্থানেই সম্বদ্ধ থাকে ও লম্বালম্বী অনেক নীচু অবধি মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। আর এক প্রকার গাছের শিকড় চারিদিকে অনেকটা জায়গা অবধি ছড়াইয়া পড়ে ও তাহারা বেশী নীচে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে না। এই দুই রকম গাছের শিকড়ের অবস্থার সহিত পাতার আকারের একটা আশ্চর্য্য যোগ আছে। কতকগুলি পাতার আকার এরূপ যে তাহাদের উপর বৃষ্টি পড়িলে তাহা বাহিরে পড়িয়া যায়, অপর কতকগুলির উপর বৃষ্টি পড়িলে উহা গুঁড়ীতে পড়ে। ইহার অর্থ—আগে যে পাতার কথা বলিলাম সেই গাছের শিকড় অনেক দূর অবধি বিস্তৃত; শিকড়ের আগার উপর জল পড়া নিতান্ত আবশ্যক, তজ্জন্য সে পাতাগুলির উপর জল পড়িলে উহা ছড়াইয়া সিকড়ের উপর পড়ে। শেষোক্ত পাতা যে সকল গাছে—তাদের সিকড় এক স্থানে সম্বদ্ধ—বিস্তৃত নহে—তজ্জন্য উহার জল গুঁড়ীর কাছে পড়াই দরকার।

গাছের ডগা কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন, উহা হইতেই গাছের বৃদ্ধি। ডগা অত্যন্ত নরম, একটু আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং উহা একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে গাছের বৃদ্ধি হয় না। ডগার উপরিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় ছোট ছোট পাতা দিয়া ঢাকা। যতই গাছ বাড়িতে থাকে ও পাতাগুলি বড় হয় এবং ডগার মুখও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, ততই আবার ছোট ছোট নূতন পাতা জন্মে ও ডগার উপরিভাগ ঢাকিয়া রাখে। কতকগুলি পাতা কাণ্ডকে ঘিরিয়া থাকে—কতকটা ঠোঙ্গার মত গঠন, তাহার মধ্যে জল দেখিতে পাওয়া যায়। পিঁপ্‌ড়ের মত কতকগুলি কীট শত্রু আছে যাহারা ডগাটি নষ্ট করে তজ্জন্য ডগার নীচের পাতাগুলির মধ্যে জল থাকে যে তাহারা যাহাতে উহা পার হইয়া গিয়া ডগাটি নষ্ট করিতে না পারে। ঠিক যেমন আমরা খাবার রাখিবার জন্য চৌকীর চার কোণে জলের বাটি রাখি সেই রকম।

পরগাছার কথা অনেকেই শুনেছেন। পরগাছা অন্য বৃক্ষের উপর বসিয়া তাহার সংগৃহীত খাদ্য আহার করিয়া জীবনধারণ করে। যেমন মনুষ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় কত অলস ব্যক্তি অন্যের টাকায় জীবনধারণ করে, নিজেরা কিছুই উপার্জ্জন করেনা ও পরে অনেক সময়ে যাহার নিকট হইতে উপকার পায় তাহারি অনিষ্ট-সাধন করে; সেইরূপ কতকগুলি গাছ আছে যাহারা অন্যের

সংগৃহীত খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে ও পরে সেই গাছকে মারিয়া ফেলে। স্বর্ণলতা বলিয়া এক প্রকার পরগাছা আছে, উহা কদম গাছ প্রভৃতির উপর জন্মে এবং সময়ে সময়ে এত বেশী হয় যে গাছকে একেবারে ছাইয়া ফেলে। ইহার পাতা নাই শিকড়ও নাই তজ্জন্য নিজে কোন রকমে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না। আবার অন্য অনেক রকম পরগাছা আছে যাহারা নিজেরাও কিছু কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে। Mistletoe নামে এক রকম বিলাতি পরগাছা দেখা যায়—যাহা দ্বারা ইংরাজেরা Christmasএর সময় বাড়ী সাজায়। উহা অন্য গাছের উপর হয় বটে কিন্তু উহার সবুজ পাতা থাকাতে উহারা নিজেরাও কিছু কিছু আহার সংগ্রহ করে। এই পরগাছার ছোট ছোট শিকড় আছে উহা যে গাছের উপর জন্মায় তাহার ডালে গর্ত্ত করিয়া ঢুকাইয়া দেয় যাহা দ্বারা উক্ত গাছ হইতে রস টানিয়া লইয়া নিজের পুষ্টিসাধন করে।

সূর্য্যের আলোক ভিন্ন গাছ বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি ঘাসের উপরে একটা বাক্স চাপা দিয়া রাখা হয় তবে সেই ঘাসগুলি একেবারে হল্‌দে হইয়া যায়। কোন গাছের উপর যদি ধামা চাপা দিয়া রাখা যায় তবে সে গাছ আর বাড়ে না ও তাহার এক রকম রুগ্ন চেহারা হয়। তাহার কারণ এই যে, আলোর অভাবে সে গাছের পাতার সবুজ দানাগুলি নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং তাহারা বায়ু হইতে আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। যদি কতকগুলি চারা গাছ একটি বাক্স চাপা দিয়া রাখা হয়, এবং সেই বাক্সর গায়ে একটী ছিদ্র থাকে তাহলে দেখা যায় যে সব গাছগুলি সেই দিকে যাবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং হয়ত একটা ডাল তাহার মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে; এবং সে ডালের পাতাগুলি বাহিরের আলোক প্রভাবে বায়ু হইতে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছে। বাক্স তুলিলে দেখিতে পাই সেই গাছটি শুধু সবুজ ও সুস্থ, অন্য গাছগুলির রুগ্ন অবস্থা।

আজ এই অবধি।

প্রকৃতিবালা।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যার নাম "প্রকৃতিবালা।" শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া প্রকৃতিই যেন আপন ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন; তাই আদর করিয়া তার পিতা তাকে ঐ নাম দিয়াছিলেন। প্রকৃতিবালা দেখিতে অতি সুন্দরী, তার মনটিও অতি সুন্দর। তাহাতে কোন কপটতা বা অসরলতা ছিল না। সংসারের কুটীলতা সে জানিত না। সে পিতার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত; সেখানে লোক জনের সমাগম তত ছিল না। আর দুই চারি জন আত্মীয় যাঁহারা ছিলেন

তাঁহারাও দরিদ্র বলিয়া কখনও কখনও কিছু দয়ার সাহায্য করা ভিন্ন অন্য কোন-রূপ সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না।

কিন্তু প্রকৃতিবালা যথার্থই প্রকৃতির কন্যা। এই ক্ষুদ্র নির্জ্জন কুটীরখানিতে সে অনেকগুলি বন্ধু পাইয়াছিল। কত ফুলরাশি, কত বিহঙ্গ, তার সঙ্গী। নদী-তীরে বসিয়া সে মাছের সঙ্গে কত কথাই কহিত। সন্ধ্যা হইলে ছাদে বসিয়া তারাগুলির সঙ্গে কত আলাপ করিত। এক একটি তারাকে এক একটি নাম ধরিয়া ডাকিত। তারাগুলি যখন মিট্ মিট্ করিত সে মনে করিত তাহারই কথায় যেন তারা সায় দিতেছে। ফুল গাছগুলিকে কত যত্ন করিত, তার পর বিড়াল, হরিণ, কুকুর ইত্যাদি কত জীবের সঙ্গে ভাব করিত। পৃথিবীর দুঃখ অভাব সে জানে না। পিতাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, আর এই সঙ্গীগুলিকে স্নেহ করিত; তাহাতেই সে সুখী। আর কিছুই সে চাহিত না। তার সেই হাসির তরঙ্গ, যেন সমুদায় স্থানটি হাসাইয়া রাখিত। বিহঙ্গকুলও যেন তার হাসি শুনিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিত। প্রকৃতি দেবী যেন তাকে আপনার করিয়া তাঁর যত সন্তানগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতির পিতা তাকে এক এক সময় আদর করিয়া "পাগলী" বলিয়া ডাকিতেন। তাহা শুনিয়াই সে হাসিয়া অস্থির হইত। পিতা তার সে হাসিমাখা মুখখানি দেখিলে সংসারের সকল অভাব ভুলিয়া যাইতেন। এমন সুন্দর ফুলটি ইচ্ছা হয় এমনি ভাবেই চিরদিন ফুটিয়া থাকে; কিন্তু সংসার তাহা বুঝে না।

একদিন প্রকৃতি মাঠে প্রজাপতির সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল, আর হাসিয়া হাসিয়া চারিদিকে হাসির লহরী ছড়াইতেছিল; ঘটনাক্রমে সেই স্থান দিয়া এক অশ্বারোহী যুবক যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ মাঠের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। এ যে বাস্তবিকই মানবী—কোন ছায়া বা অপ্সরা নহে—তাহা বুঝিতে অনেকক্ষণ লাগিল। এবার প্রজাপতির সঙ্গে খেলা বুঝি যথার্থই প্রকৃতির জীবনে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঘটায়। যুবা তখন বালিকার নিকটে পরিচয় লইবার জন্য অগ্রসর হই-লেন। প্রকৃতি ভয় জানিত না, কিন্তু হঠাৎ একটি অপরিচিত লোক দেখিয়া একটু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল। যুবা তখন তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আমাকে কি তোমার পিতার কাছে লইয়া যাইতে পার?" প্রকৃতি "পারি" বলিয়া তখনই তাঁর সঙ্গে চলিল। প্রথম এক অপরিচিত জীব দেখিয়া যে অল্প সঙ্কোচ হইতেছিল, তাহা চলিয়া গেল; প্রকৃতিবালা পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিঃসঙ্কোচে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিল। তার ফল ফুলের কথা, পাখীর কথা কতই উৎসাহে বলিতে লাগিল। যুবা এরূপ সরলতা কখনও দেখেন নাই, তিনিও অতি গম্ভীরভাবে

তার সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁরা কুটীরদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন, প্রকৃতি যুবাকে "একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেল ও কিছুক্ষণ পরে তাহার পিতাকে লইয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এরূপ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু যুবার সরল মুখশ্রী দেখিয়া তাঁর উপর কোন সন্দেহ রহিল না।

তিনি দীনভাবে ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁকে আহ্বান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন; যুবার নাম নরেন্দ্রকুমার; তিনি এক বড় জমীদার, শিকারে বাহির হইয়া পথ হারা-ইয়া ফেলিয়াছেন পরে ব্রাহ্মণকন্যার সাহায্যে তিনি এখানে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ ও তাঁর কন্যার নিকট বিদায় লইয়া নরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি স্বর্গের প্রতিমা একটি সরল বালিকার মুখচ্ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সেই জমীদার-গৃহ হইতে প্রকৃতিবালার বিবা-হের সম্বন্ধ আসিল। গোত্র বংশ মিলা-ইয়া কোন বাধা রহিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয়ের সোণার পুতলী রাজ-রাণী হইবে ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে পুলকিত হইল। কিন্তু তিনি যে নিতান্ত নিঃস্ব তাহা জানাইলেন। প্রাণের দুহিতাকে নিজে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া সাজাইতে পারিলেন না বটে কিন্তু প্রকৃতিবালা আপনার অতুল রূপ-রাশিতেই আপনি চিরসজ্জিত। যাহা হউক নির্ব্বিঘ্নে অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। প্রকৃতি প্রথম কিছুই বুঝিল না; তার জীবনে একটা কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে কেবল ইহাই জানিল। বিবাহ কি, ধন সম্পদ কি এ সকল ভাব তাহার হৃদয়ে আসে নাই। শ্বশুরগৃহের অর্থও সে জানিত না। তার সরল হৃদয়ে একটি সুন্দর সুপুরুষের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল যাহাকে সে এ জীবনে কখনও দেখিবে আশা করে নাই, যাহাকে সে আকাশের চন্দ্র অপেক্ষাও দুর্ল্লভ বস্তু মনে করিয়াছিল, যাহাকে সে আপন ক্ষুদ্র হৃদয় সিংহাসনে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিল, তাহাকে সে দেখিবে, তাহার সঙ্গে কি একটা প্রাণের যোগ হইবে ইহাই ভাবিয়া সুখে বিভোর হইল। আর কিছু বুঝিল না।

(ক্রমশঃ)

পাক বিধি।

পুরকান্তি।—প্রথমে পরিষ্কার ময়দা খাস্তার কচুরির মত উপযুক্ত পরিমাণ ময়ান দিয়া ভালরূপে মাখিয়া লইবে পরে অতি ছোট ছোট নেচি করিয়া রাখিবে। ময়ানের সঙ্গে একটু চিনি দিলে ভালই হয়, এবং জলের পরিবর্ত্তে ঘন দুধ দিয়া মাখিয়া লইতে হয়। পরে সেই নেচি বেলিয়া একখানি নেচির উপরে নেচি হইতে একটু ছোট ক্ষীরের লুচির মত বেলিয়া রাখিয়া তাহার উপরে

আর একখানি ময়দার লুচি ঢাকা দিয়া চারিধারে পেরাকীর মত বিনাইয়া দিবে; ক্ষীরের সঙ্গে বাদাম পেস্তার কুচি কর্পূর ছোট এলাচের গুঁড়া ও চিনি দিয়া পাক করা হইবে। পরে সেই প্রকারে প্রস্তুত করিয়া জ্বালে ঘি চড়াইবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলি অল্প অল্প করিয়া বেশ গোলাপী ধরণে ভাজিয়া চিনির তিন তার বন্ধ রসে ডুবাইয়া অন্য পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। কিম্বা গজার মত করিয়া রসে উথ্‌ড়াইয়া লইলেও হয়। ইহারই নাম পুরকান্তি। ইহা করাও বেশ সহজ আবার খাইতেও বেশ সুস্বাদু। এক একবার সকলে পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে।

মাছ টাট্‌কা রাখিবার উপায়।—বড় বড় মাছ অপেক্ষা ছোট মাছ দুই এক দিনের জন্য ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখা যাইতে পারে। সচরাচর, অন্য ঋতু অপেক্ষা, শীতকালেই মাছ শীঘ্র পচিয়া উঠে না। শীতকালেই প্রয়োজন-অনুসারে আজিকার মাছ কালি ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে মাছ বাসি রাখিবার প্রয়োজন, তাহা টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে ভাল করিয়া, তাহার ভিতরের (পেটের) ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। পরে, মাছটি ভাল করিয়া ধুইয়া, শুক্‌ন নেকড়া দ্বারা পুঁছিয়া ফেলিবে; এবং শুষ্ক খট্‌খটে স্থানে হুকে তাহা ঝুলাইয়া রাখিবে। মাছ পুঁছিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল বুলাইয়া দিলে ভাল হয়। কেহ কেহ লবণও মাখাইয়া রাখেন। কিন্তু, লবণ মাখাইলে স্বাদের কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। মাছের গায়ে যেমন তৈল মাখাইতে হয়, সেইরূপ পেটের ভিতর ভিনিগার (সির্কা) মাখাইলে ভাল হয়। অর্থাৎ শীঘ্র মাছ পচিয়া উঠে না।

আজকাল, পদ্মার ইলিস মাছ, বরফে রাখিয়া, কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বরফে রাখিলে, শীঘ্র পচিয়া উঠে না। বরফ শীঘ্র গলিয়া না যায়, এজন্য বরফের চাপে মধ্যে মধ্যে লবণ মাখাইয়া দিতে হয়।

স্বর্ণরেণু।

যাঁহার মন অন্তর্মুখীন হইয়াছে তিনি নিদ্রিত হউন, জাগ্রত থাকুন, গমনই করুন, অধ্যয়নই করুন; পুর, জনপদ, গ্রাম, অরণ্যের ন্যায় দর্শন করেন।

যিনি অন্তর্মুখীন হইয়া স্থিতি করেন, তাঁহার নিকট সকলই আকাশ হইয়া যায়। অন্তঃশীতলতা লাভ করিলে সমুদায় জগৎ শীতল হয়।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

বিনীত নিবেদন।

নানা কারণবশতঃ পরিচারিকা বাহির হইতে এবার বিলম্ব হইয়া গেল। আশা করি সহৃদয়া পাঠিকাগণ আমাদিগের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

২৬ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১০। [৮ম সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. DECEMBER, 1903. No. 8.

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।	বিষয়।		পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	১৬৯	একটি গল্প	...	১৮১
স্ত্রীর অলঙ্কার	...	১৭০	সঙ্গী	...	১৮৫
সঙ্গীত	...	১৭২	সন্তান পালন	...	১৮৬
সুন্দর জীবন কাহাকে বলে	...	১৭২	ক্ষুদ্র পাতিয়ার জীবন	...	১৮৭
প্রকৃতিবালা	...	১৭৪	সংবাদ	...	১৯১
গল্প	...	১৭৭	স্বর্ণরেণু	...	১৯২
জীবনচরিত	...	১৮০			

কলিকাতা,

৭৮ নং, অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

—•:o:•—

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

			মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ	...	১৲
১৯ ঐ	২য় ভাগ	...	১৲
২০ ঐ	৩য় ভাগ	...	১৲
২১ ঐ	৪র্থ ভাগ	...	১৲
২২ ঐ	৫ম ভাগ	...	১৲
২৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	...	১৲
২৪ জীবনবেদ		...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ		...	১
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	১ম ভাগ	...	।৶০
২৭ ঐ	২য় ভাগ	...	।৶০
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে			১৷৷০
২৯ সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড			১৷৷০
৩০ ঐ	তৃতীয় খণ্ড	...	১
৩১ ঐ	চতুর্থ খণ্ড	...	১
৩২ ঐ	পঞ্চম খণ্ড	...	১
৩৩ নবসংহিতা		...	৸০
৩৪ মাঘোৎসব		...	৷৷০
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল)	১ম ভাগ	...	৷৷০
৩৬ ঐ ঐ	২য় ভাগ	...	৷৷০
৩৭ ঐ ঐ	৩য় ভাগ	...	৷৷০
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর)	১ম ভাগ		৷৷০
৩৯ ঐ	২য় ভাগ	...	৷৷০
৪০ ঐ	৩য় ভাগ	...	৷৷০
৪১ ঐ	৪র্থ ভাগ	...	৷৷০
৪২ ঐ	৫ম ভাগ	...	৷৷০
৪৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	...	৷৷০
৪৪ ঐ	৭ম ভাগ	...	৷৷০
৪৫ ঐ	৮ম ভাগ	...	।৶০
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ		...	।৶০
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১ম ভাগ		।০
৪৮ ঐ	২য় ভাগ	...	।০
৪৯ প্রেম কুসুম		...	।০
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ		...	৵০
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান		...	৵০
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী		...	৵০
৫৩ সুখী পরিবার		...	৴০
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা	১ম ভাগ	...	৷৷০
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ		...	৷৷০
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর		...	৷৷০
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার		...	৷৷০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ] কলিকাতা অগ্রহায়ণ ১৩১০, ডিসেম্বর ১৯০৩ [৮ম সংখ্যা

বিনীত নিবেদন।

১৩১০ সালের বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় মূল্য দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন নাই। কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন দেশে বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য বলিয়া আজও সংস্কার আছে।

—

জার্ম্মানির মহারাজ্ঞী অত্যন্ত ফুলপ্রিয়। তিনি তাঁহার ঘরে তাঁহার এবং স্বামীর জন্য নিজ হস্তে ফুলের তোড়া প্রস্তুত করেন।

—

অধিক ধূমপান করিলে শুনা যায় স্মরণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি উভয়ই হ্রাস হয়। উহা নিবারণের একমাত্র উপায় ধূমপান না করা!

—

কোরিয়াতে যত দিন পর্য্যন্ত রাজা অবিবাহিত থাকে তত দিন সে দেশের কোন অবিবাহিতা নারীর বিবাহ করিবার হুকুম নাই। রাজা মনোনীত করিয়া যখন কোন একটি পাত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহার পর অন্য সকলের বিবাহ হইতে পারে।

—

কোরিয়াতে সাতটি আশ্চর্য্য জিনিষ আছে; সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা গেল।

১। কিংসণ্ডার নিকটে একটি উষ্ণ ধাতব প্রস্রবণ আছে, এরূপ শুনা যায় উহার জলে সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়।

২। কোরিয়ার দুই প্রান্তে দুইটি প্রস্রবণ আছে, যখন একটি জলপূর্ণ থাকে অপরটি তখন শূন্য হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মৃত্তিকার নিম্নে এই প্রস্রবণ-

দ্বয়ের যোগ থাকা সত্ত্বেও একটির জল অপরিষ্কৃত ও তিক্ত এবং অপরটির জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু।

৩। সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি গহ্বর আছে, শীতকালে তথায় এরূপ প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে যে বলবান ব্যক্তিও সে স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না।

৪। একটি পাইন্ বৃক্ষের অরণ্য আছে, তথাকার বৃক্ষগুলি চিরজীবী। সমূলে উৎপাটন করিলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না এবং পুনরায় ঐ স্থান পাইন্ বৃক্ষে পূর্ণ হইয়া যায়।

৫। একখণ্ড প্রস্তর শূন্যে এরূপভাবে অবস্থিত আছে যে দেখিলে মনে হয় মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত কিন্তু উহার দুই পার্শ্বে দুইজন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া যদি এক গাছি রজ্জু প্রস্তরের নিম্ন দিয়া টানিয়া লন, রজ্জু মৃত্তিকা বা প্রস্তরে বাধিবে না। ইহার সম্মানের জন্য নিকটে একটি বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

৬। পর্ব্বতোপরিস্থিত উষ্ণ প্রস্তর—এই প্রস্তর বহু দিন হইতে চতুর্দ্দিকে সমভাবে তাপ বিকীর্ণ করিতেছে, কিন্তু তাপের হ্রাস হইতেছে না।

৭। একটি মন্দিরে বুদ্ধের এক বিন্দু ঘর্ম্ম আছে বলিয়া শুনা যায়—আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত মন্দিরের ত্রিশ পদ পরিমিত স্থানের মধ্যে কোন প্রকার উদ্ভিদ বা শস্যাদি জন্মে না এবং সে স্থানে কোন পশুই আসিতে চাহে না।

স্ত্রীর অলঙ্কার।

স্ত্রীজাতির অলঙ্কারস্পৃহা স্বভাবতঃই প্রবল। কোন্ সুন্দরী স্ত্রী না বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া আরও সুন্দরী হইবার জন্য ইচ্ছা করেন? এই স্পৃহা ঈশ্বরের দেওয়া। ব্রাহ্মিকাগণ, এই নারী স্বভাবের ইচ্ছাকে বিনাশ করিও না। নারী যখন বালিকা থাকে, তখন সে পিতা মাতাকে বলে, বাবা, মা, আমাকে গহনা করিয়া দাও। কোটি কোটি টাকা অপেক্ষা তাহার পক্ষে এক খানি ছোট গহনা বড়। পিতা যদি সমস্ত রাজ্য দিতে চাহেন বালিকা সেই রাজ্য ছাড়িয়া একখানি গহনা চায়। পরে যখন বালিকার বিবাহ হইল তখন কেবল পাত্র ভেদ হইল, তখন পিতা মাতার কাছে না চাহিয়া সে তাহার স্বামীর নিকট অলঙ্কার চাহিতে লাগিল। নারী প্রকৃতির এই অলঙ্কারস্পৃহা অনিবার্য্য। পরম সুন্দর হরিপাদপদ্ম যে দেশে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত সেই দেশের লোকেরা জানেন কিরূপে স্ত্রীজাতির এই বাসনা পূর্ণ করিতে হয়। ব্রহ্মভক্ত জানেন কিরূপে ব্রহ্মকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়। জগজ্জননী নিজেই জগতের ভূষণ, জগতের চন্দ্রহার। যে স্ত্রী সেই ভুবনমোহিনী জগজ্জননীকে আপনার মস্তকে, কণ্ঠে, হৃদয়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে রাখিয়াছেন তাঁহার ন্যায় সুন্দরী আর কে? সেই জননীর প্রেমানন্দরূপ অলঙ্কার পরিলে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক অল-

ঙ্কারস্পৃহা পূর্ণ হয়। যখন সেই ভাগ্যবতী স্ত্রী ভক্তির সহিত জগদীশ্বরীকে মা বলিয়া ডাকেন তখন সেই জগজ্জননী, বিশ্বের রাণী প্রসন্ন হইয়া বলেন;—"মেয়ে, বর নেও।" মেয়ে বলিল;—"মা, ছেলে বেলা হইতে আমি অলঙ্কার চাহিয়াছি, অধিক বয়সে স্বামীর নিকটে অলঙ্কার চাহিয়াছি, অন্ন বস্ত্র এবং রাজ্য অপেক্ষা অলঙ্কার বড়। যার অলঙ্কার নাই সে অনাথিনী দুঃখিনী, অলঙ্কারের জন্য আমি উন্মাদিনী, অতএব হে জননি, আমাকে এই বর দেও যেন একখানি চিরকালের অলঙ্কার পরিয়া আমার বাল্যকালের আশা পূর্ণ হয়। আমাকে এমন একখানি গহনা দাও যাহা পাড়ার লোক দেখিবামাত্র আমাকে বলিবে সুখী তুমি, ধন্য তুমি।" সেই জগজ্জননী কৃপা করিয়া তাঁহার পাদপদ্মরূপ চিরসুন্দর অলঙ্কার দিয়া কন্যার বাসনা পূর্ণ করিলেন। একদিকে পৃথিবীর রাশি রাশি সোণা, রূপা এবং হীরা প্রভৃতির গহনা। আর এক দিকে মার পাদপদ্মরূপ স্বর্গের গহনা। গহনার জন্য পাগলিনী ব্রহ্মকন্যা আনন্দ মনে স্বর্গের গহনা খানিই গ্রহণ করিলেন। সাধ্বী ব্রহ্মকন্যা দর্পণে আপনার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। মা, মা, বলিয়া তিনি আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে জল আর ধরিল না। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে তিনি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমাকে আর গহনার জন্য বিরক্ত করিব না। স্বর্গের জননী আমাকে এমন গহনা দিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া ত্রিভুবন মোহিত হয়। দুঃখিনী ছিলাম আমি, কখন ভাল বালা কি ভাল বাজু পরি নাই; কিন্তু আজ মার স্নেহে রাণীর ন্যায় গহনা পরিয়াছি। তোমার বন্ধুদিগকে আজ নিমন্ত্রণ কর, এই অপূর্ব্ব গহনা দেখিয়া তাঁহারাও সুখী হইবেন। তুমি বহুকাল আমাকে বিবাহ করিয়াছ বটে; কিন্তু তুমি কখন এমন অলঙ্কার দিতে পারিতে না। ভাগ্যে আমি ব্রাহ্মিকা হইয়াছিলাম, তাই তুমি স্বামী হইয়া যাহা কখনও দিতে পার নাই আজ আমার মা আমাকে তাহা দিলেন। এখন এই গহনা কোথায় রাখিব? সিন্ধুকে রাখিব না বুকের মধ্যে রাখিব? এই গহনাতে আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হইলাম। আমি ছেলে বেলা হইতে যে জন্য কাঁদিতাম মা আজ আমাকে তাহা দিলেন। মার এই পাদপদ্ম আমার হৃদয় পরশমণি, ইহা আমার চক্ষের অঞ্জন, ইহা আমার প্রাণের ভূষণ, ইহা আমার হস্তের ভূষণ, ইহা আমার কণ্ঠের ভূষণ। মার কথা শ্রবণ করা আমার কর্ণের ভূষণ। মার পাদপদ্ম পাইয়া আমার আর অন্য স্পৃহা নাই। আর আমার পৃথিবীতে কি চাই? আমি মার দাসী হইয়া থাকিব, আমি রাণী হইতে ইচ্ছা করি না. আমি পরিবারের সকলকে লইয়া মাকে ডাকিয়া সুখী হইব। আমার

আর কোন কাজ নাই; পৃথিবীতে কেবল মার গুণ কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইব। আহা! মা আমাকে কেমন সুন্দর অলঙ্কার দিলেন! কবে আর আর ভগিনীরা এই অলঙ্কার পাইয়া সুখী হইবেন!! মার পাদপদ্ম পাইয়া আমার ঘর যেমন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইল, সকল ঘর সেইরূপ উজ্জ্বল এবং সুন্দর হউক! ভারতের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না যখন ভারতের সকল নারী এই অলঙ্কার পরিবেন। কবে নারীকুল অসার অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপাদপদ্মভূষণ প্রার্থনা করিবে?

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

সঙ্গীত।

সঙ্গীত আমাদের সুখী করিবার জন্য স্বর্গ হইতে প্রেরিত। সঙ্গীত তাপিত হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে ও দুঃখিত হৃদয়কে সুখী করে। যখনই মনে কষ্ট হয় সঙ্গীত সখী আমাদের কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দেয়। সঙ্গীতের একটী মোহিনী শক্তি আছে! সহজে কত নর নারীর চিত্ত সে হরণ করে, মুগ্ধ করে; কত শুষ্ক হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দেয়। অশান্ত উত্তাপিত হৃদয়কে একবার সঙ্গীত সুধার্ণবে ডুবাইলে সকল উত্তাপ অশান্তি চলিয়া যায়, হৃদয় শান্তিময় হয়। সঙ্গীত! তুমি স্বর্গীয়া দেবী, রূপে গুণে আলো করিয়া সুন্দর বসন পরিয়া নিজ স্বর্গীয় আবাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্ত্য-বাসীগণের মন ভুলাইতে আইস। ধন্য দেবি! তুমি চিত্তহারিণী মনমুগ্ধকারিণী; ত্রিতাপে তাপিত জনকে সুখী কর তুমি, শোকাভিভূত হৃদয়ে শান্তি দাও তুমি। যিনি নিজেই সঙ্গীত-স্বরূপা, যাঁহার মহান গান শুনিয়া সমুদায় বিশ্ব মুগ্ধ, তিনিই তাঁহার মধুর ভাবের একটী কণাকে পৃথিবীতে সঙ্গীতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যিনি সঙ্গীতের আধার এবং মূল তাঁহাকে জানিতে পারি। তাঁহারি মধ্যে সকল গুণ বিরাজিত; তিনি ভক্তের হৃদয় তন্ত্রীতে অবতীর্ণ হইয়া সুন্দর সুর বাহির করেন। সেই সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণে সাধু ভক্ত যোগী ঋষি চিরমোহিত ও চিরমগ্ন।

"সঙ্গীতস্বরূপ তুমি অনন্ত মহান গান
আনন্দে মোহিত বিশ্ব শুনি সে মহান
তান।"

সুন্দর জীবন কাহাকে বলে?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুন্দর জীবনের আর একটি অঙ্গ সেবা। ঈশা বলিয়াছিলেন তিনি সেবা লইতে আসেন নাই কিন্তু সেবা করিতে আসিয়াছেন। আমরা যদি ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই ভাবে জীবন যাপন করিতে পারি তবেই জীবন ধন্য হইবে।

আমাদের চিন্তা কেবল আত্মসুখের জন্য আর ব্যস্ত হইবে না, পরকে কিরূপে

সুখী করিতে পারিব ইহাই ভাবিব। যথার্থ প্রেম গ্রহণে নহে, কিন্তু দানে। আমাদের বন্ধুদিগের নিকটে কিছু প্রত্যাশা করিব না, কেবল কিসে তাঁহাদের উপকার করিতে পারিব, তাঁহাদের ভাল করিতে পারিব তাহাই দেখিব। এই ভাব আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিবে, অন্যের হানি করিতে বা অন্যকে প্রলোভনে ফেলিতে দিবে না।

ইহা সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যদি বা কখন কাহারও প্রতি না জানিয়া উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিয়া ফেলি। ইহাতে আমাদিগকে অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যও স্মরণ করাইয়া দিবে। আমাদিগের জীবনের গতি পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিবে। আত্মসুখ অন্বেষণের পরিবর্ত্তে অন্যকে সুখী করিতে ইচ্ছা হইবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যাঁহারা কিসে নিজের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, অন্যের নিকটে প্রাপ্য সম্মান পাইবেন এই সব চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন; কিন্তু যদি আমরা অন্তর মধ্যে এই সেবা-ব্রতের মন্ত্র রাখিতে পারি এ সব চিন্তা আর আসিবে না। আমাদের সর্ব্বদা যত্ন চেষ্টা থাকিবে যে অন্যের প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না, আমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেও আমরা সদ্ব্যবহারই করিব। ভক্তদের জীবনে যথার্থ সেবা কাহাকে বলে তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। এবং ইহা হইতে শিক্ষা লইয়া এরূপ জীবন প্রস্তুত করিতে সকলে যত্নবান হইব যে আমাদিগের সঙ্গে যাহাদের জীবন সংস্পর্শে আসিবে, সে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও হয় তথাপি কিছু উপকার কিছু সুখ প্রাপ্ত হইবে। অন্যের প্রতি আমাদিগের ভাব, ব্যবহার সব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মানবের প্রতি যখন দৃষ্টি করিব মনে হইবে আমার কাছে হয় ত তাহার পাইবার কিছু আছে, হয় ত তাহাকে দিবার কোন প্রেমের সমাচার বা ভগবানের আশীর্ব্বাদের কথা বলিবার আছে, অন্ততঃ একটি নীরব প্রার্থনাও করিবার আছে।

ইহাই সুখের গুপ্ত মন্ত্র, কারণ গ্রহণ অপেক্ষা দানে সুখ। তখন আর অন্যের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা না পাইলে বিরক্তি থাকিবে না; কে কিরূপ ব্যবহার করিল বা কে অমান্য করিল, কে একটু সম্ভ্রমদানে ত্রুটি করিল এ সব মান অপমান জ্ঞান থাকিবে না। প্রেম কখনও দেনা পাওনার হিসাব রাখে না, সে কেবল সেবা করিতে পাইলেই সুখী।

আর একটি সুখের মন্ত্র প্রতি দিনের জন্য জীবন ধারণ করিতে শিক্ষা করা। আমরা সমস্ত জীবনের কথা মনে করি, কত দীর্ঘ মনে হয়। এত সুদূরব্যাপী জীবন ভাবিতে গেলে তাহার দায়িত্ব, কর্ত্তব্যরাশি যেন গুরুতর ব্যাপার মনে হয়। চিরজীবন এই ভার বহন করিতে হইবে ইহা ভাবিলে বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া

দেখিলে দেখিতে পাই এ জীবনে কোন দীর্ঘতা নাই। জীবন একেবারেই সমুদায় জীবন লইয়া আসে না, একটি করিয়া দিবস একটি করিয়া জীবনের দিন লইয়া আসে। "কাল" ইহাও যতক্ষণ না "আজ" হয় ততক্ষণ আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। অদ্যকার কার্য্য ভালরূপে সুসম্পন্ন করিয়া তাহা কল্যকার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখা ভিন্ন কল্যকার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কও রহিল না। এই যে প্রতি দিনের জন্য জীবন ধারণ করিতে পারা ইহা অতি সুখের মন্ত্র।

প্রত্যেকেই এক দিবসের জন্য অতিশয় কঠিন গুরুভারও বহন করিতে সমর্থ হইবে। প্রত্যেকেই অতি সুখে, শান্তভাবে ধৈর্য্য ধরিয়া একটি দিন কাটাইতে পারিবে। এবং আমাদের নিকটে জীবনের অর্থই এই একটি দিন মাত্র। "অদ্যকার কর্ত্তব্য পালন কর, অদ্যকার প্রলোভন জয় কর, যাহা দেখিতে পাইবে না যাহা ভবিষ্যতের অন্তরালে লুক্কায়িত তাহা ভাবিয়া অস্থির হইও না।" ক্ষুদ্র দিনগুলিকে অন্ধকার হইতে বন্ধ করিবার জন্য রাত্রি আবরণ স্বরূপ। ইহা অতিক্রম করিয়া দেখিবার আমাদিগের ক্ষমতা নাই, আর তাহা দেখিতে চেষ্টা করাও অন্যায়।

অল্প, ক্ষুদ্র একটি দিনব্যাপী জীবন ভাবিতে সহজ; ইহাতে আমরা সাধু জীবন, পবিত্র জীবন ধারণের মন্ত্র শিক্ষা করিতে পারি।

সুন্দর জীবনের এই কয়েকটি গুপ্ত মন্ত্র। আমাদের সকলেরই এক একটি সুন্দর জীবন লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা এ জীবন কেবল এক বারই ধারণ করিব। পুনর্ব্বার আসিয়া যে আবার ভুল বা অন্যায়গুলি সংশোধন করিতে পারিব তাহা নহে। সে জন্য আমাদের জীবন ভালরূপে যাপন করাই কর্ত্তব্য। এবং তাহা করিতে হইলেই জীবন প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রকৃতিবালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে যাইবার সময় পিতার কাছে বিদায় লইবার কালে প্রকৃতির ক্ষুদ্র হৃদয়খানি বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে বড় আঘাত লাগিল। আকুল নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে সে পাল্কীতে উঠিল। সেই ভাবে গিয়া শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছিল। দরিদ্র ঘরের কন্যা ধনী শ্বশুরগৃহে কিরূপ বিচারিত হয় তাহা অনেকেরই জানা আছে। নরেন্দ্রের মাতা পুত্রের জিদ দেখিয়াই এ বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন, নতুবা দরিদ্র কুটুম্ব করিতে তাঁর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। এদিকে আবার পুত্র বিবাগী হবার যো হয়। কাজে কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ বিবাহে স্বীকৃত হন। প্রতিবাসিনীগণ বধূর অতুল রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু শ্বশ্রূঠাকুরাণী যতক্ষণ না মতামত প্রকাশ

করেন মুখ ফুটিয়া কেহই আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। শ্বশ্রূঠাকুরাণী একে জমীদার-গৃহিণী তার উপর ধনীর কন্যা। প্রথম অলঙ্কারহীনা বধূকে দেখিয়াই ত তাহার পিতার উদ্দেশ্যে এক চোট বলিয়া লইলেন। ছোট ঘরের মেয়ে আনিলেই এরূপ হয় ইত্যাদি। প্রকৃতি অর্দ্ধেক বুঝিল, অর্দ্ধেক বুঝিল না। বিস্ফারিত নয়নে অবাক হইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "এমন নির্লজ্জ মেয়েও ত কখনও দেখিনি গা। চোখ্ বুজ্‌তে জানে না।" এইরূপে প্রকৃতির বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইল। তাহার সরলতা মাখা হৃদয়খানি সংসারের অসরলতার মধ্যে পড়িয়া যেন কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল। প্রকৃতি প্রকৃতিই জানে, প্রকৃতিই বোঝে, এ বিষম বিকৃতির ভিতর সবই যেন উল্টা নিয়ম। সে মুক্ত বিহঙ্গ, উদ্যানে উড়িয়া বেড়াইত; তাহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিলে কেন? বিহঙ্গ মুক্ত উদ্যানেই গান গাহে, পিঞ্জরবদ্ধ করিলে সে গান বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের প্রকৃতিরও তাহাই হইল। ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া কেবল সংসারের কথা শুনিতে শুনিতে পরচর্চ্চা শুনিতে শুনিতে তার প্রাণ যেন অস্থির হইত। আর নরেন্দ্র? নরেন্দ্র প্রকৃতিকে পাইয়া বড় সুখী। ইহা ভিন্ন আর কোন ভাবনা তাঁর মনে আসিত না। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল; প্রকৃতির সে হাসি আর ফিরিয়া আসিল না, সে প্রফুল্লতা আর দেখা গেল না। প্রকৃতি এখন নীরব; প্রকৃতির মুখ মলিন, বিষন্ন! নরেন্দ্রের তখন যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি যে বন হইতে বিহঙ্গ চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন যে তাঁহার গৃহে সে গান করিয়া আমোদিত করিবে, আর তিনি শুনিবেন। সোণার শৃঙ্খলে পাখী বাঁধিয়াছেন কিন্তু পাখীর সে গান কোথায় গেল? সে হাসিভরা মুখখানি যে মুখ কখনও গম্ভীর হইতে জানিত না সে মুখে এমন বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দিল কে? তবে কি প্রকৃতি স্বামীকে ভালবাসে না? তাহাই বা কেমন করিয়া হইবে? তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের সকল ভালবাসা ভক্তি যে সে স্বামীর চরণে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু এ কারাগারের মধ্যে যেন তার হৃদয়ের ভাবগুলি সে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। যেন কি বাধা আসে। সে তার ক্ষুদ্র কুটীরে কেমন মনের আনন্দে বিহার করিত; সে তার সেই ফুলগুলি সেই বিহঙ্গগুলি চায়। এখানে বন্দী হইয়া থাকিতে তার যেন জীবনে আর জীবন রহিল না। আকাশের পাখীকে ধরিয়া সোণার পিঞ্জরে যদি বন্দী কর সে কি কখনও সুখী হয়? প্রকৃতির প্রাণ তার সেই পূর্ব্ব জীবনটি আবার ফিরিয়া চায়। সে দিন নরেন্দ্র যখন প্রকৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রকৃতি, তুমি কি এখানে সুখী নও? তোমার আর সে হাসি নাই। কেন তুমি এমন হইয়াছ?"

প্রকৃতি স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে তার মনের কথা জানাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। কেবল বলিল, "আমার বাবার জন্য মন কেমন করে।" আর কথা বাহির হইল না, চোখ ফাটিয়া জল আসিল। নরেন্দ্র তখন তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার মনস্থ করিয়া মার কাছে প্রস্তাব করিতে গেলেন। বাপের বাড়ীর নাম শুনিয়া মা ত একেবারে খেপিয়া উঠিলেন। গরীবের ঘরে আবার বৌ পাঠাইবেন? কখনই না, নরেন্দ্র কি করিবেন। মার কথার উপর আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর হইয়া গেল। প্রকৃতির শরীর ক্রমে অসুস্থ হইল। প্রথমে কিছুই বলিত না কিন্তু শেষে এমন হইল আর চলিবার শক্তি রহিল না। তখন প্রকৃতি শয্যার আশ্রয় লইল। নরেন্দ্রের প্রাণে বড় আশঙ্কা হইল। চারিদিকে কেবলই যেন অমঙ্গলের ছায়া দেখিতে লাগিলেন। প্রকৃতি নীরব, স্থির। রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও শান্ত। নরেন্দ্র একদিন তার কাছে বসিয়া আছেন, তখন প্রকৃতি স্বামীর হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "বড় সাধ হয় তুমি আর আমি আমাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া সেই পূর্ব্বের মত বেড়াই। সে সাধ কি আমার পূর্ণ হবে?" প্রকৃতির এ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র তখনই স্থির করিলেন এবার নিশ্চয়ই প্রকৃতিকে লইয়া তাহার পিতৃগৃহে যাইবেন। তখন প্রকৃতিকে বলিলেন, "এখন কি তুমি যাইতে পারিবে? বল ত কালই তোমায় লইয়া যাই।" এই কথায় প্রকৃতির শুষ্ক মুখেও হাসি দেখা দিল। বলিল "হ্যাঁ পার্‌ব।" সেই উৎসাহে যেন একটু বলও হইল। প্রকৃতিকে পাল্কী করিয়া সেই অবস্থাতেই পরদিন নরেন্দ্র লইয়া গেলেন। নরেন্দ্রের মাতা বিদায় কালে শুষ্ক চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "যাও মা, তোমরা এখনকার মেয়ে আমাদের কথা ত শুন্‌বে না। এতে যদি কোন অমঙ্গল হয় সে তোমারই দোষে।" সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নরেন্দ্র প্রকৃতিকে লইয়া তার পিতৃকুটীরে উপস্থিত হইলেন।

বহু দিন পরে পিতা-কন্যায় মিলন, উভয়েই আনন্দে বিহ্বল। অনেক দিনের পর তাহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া বড়ই সুখ হইল। মনের আহ্লাদে উঠিয়া একবার দাঁড়াইল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। কন্যার বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া পিতার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার মুখে তাহার স্বর্গীয়া মাতার মুখচ্ছায়া যেন দেখিতে পাইলেন। ভয়ে তাঁহার প্রাণ কম্পিত হইল, নরেন্দ্র বৃদ্ধের মনের ভাব কতক বুঝিলেন। নরেন্দ্র ও প্রকৃতির পিতা দুইজনে গম্ভীরভাবে প্রকৃতির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। প্রকৃতি স্থির নিস্পন্দ, যেন নিদ্রিতা; কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, "বাবা আমার সব বন্ধুরা ভাল আছে ত? মাছদের খাবার দিয়েছিলে কি? হরিণ বিড়াল সব ভাল আছে?" আবার একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা

এখানে আবার অত গম্ভীর হ'য়ে আছ কেন?" বলিয়া নরেন্দ্রের দিকে তাকাইল। নরেন্দ্র আর যেন সহ্য করিতে পারিলেন না বলিলেন, "আমি আস্‌ছি" এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সে স্থানটি সবই যেন প্রকৃতির ছায়ায় পূর্ণ, প্রকৃতির সেই হাসি যেন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যেখানে যান্ যে দিকে দেখেন মনে হয় ফল ফুল পাখী সকলেই বলিতেছে, "আমাদের প্রকৃতিকে তুই কেন লইয়া গেলি? সে যে আমাদের ছিল?" এই কথার প্রতিধ্বনি নরেন্দ্রের হৃদয়েও বাজিয়া উঠিল। ভাবিলেন বাস্তবিকই এমন স্বর্গের বিহঙ্গ কেন শৃঙ্খলে বাঁধিতে গিয়াছিলেন? তাহাকে কি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না?

এই সব ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দৌড়িয়া তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর সেখানে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "শীঘ্র এস, প্রকৃতি বুঝি পালাল।" নরেন্ ছুটিয়া গেলেন; দেখিলেন প্রকৃতির অঙ্গ শীতল হইয়া আসিতেছে, কাঁদিয়া তার শয্যাপার্শ্বে পড়িলেন প্রকৃতি ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া স্বামীর দিকে স্নেহভরে দেখিল, পিতার দিকে দেখিল, একটু মৃদু হাসিল; আর সব নীরব! মুক্ত আত্মা উড়িয়া গেল, দেহপিঞ্জর পড়িয়া রহিল। যে শৃঙ্খল কাটিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল সে শৃঙ্খল চির-জন্মের মত ছিন্ন করিয়া প্রাণপাখী চলিয়া গেল। দুটি ভগ্ন প্রাণ সেই শূন্য গৃহে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের সহস্র ক্রন্দনও আর সে মুক্ত বিহঙ্গকে ফিরাইতে পারিবে না।

গল্প।

আমি, পিতা মাতার একমাত্র কন্যা, আমার বয়স ১৮ বৎসর। আমরা লণ্ডন হইতে কিছু দূরে এক গ্রামে থাকিতাম। আমরা যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলাম, তাহার ঠিক পাশেই আর একটি খুব সুন্দর ছোট বাড়ী ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে বাড়ী প্রায়ই কেহ ভাড়া লইত না। আমরা প্রায় ছয় মাস এই গ্রামে আছি, এমন সময় একদিন শুনিলাম যে আমাদের পাশের বাড়ী ভাড়া হইয়াছে। আমার ত শুনিয়াই ইচ্ছা হইল দেখি কে উহা ভাড়া লইয়াছে, কিন্তু আমার মাতা বলিলেন বৈকালে যখন বাগানে বেড়াইতে যাইব তখন দেখিতে। বৈকালে রোজই আমাদের বাগানে বেড়াইতাম, খুব সুন্দর ফুল সকল ফুটিয়াছে, এবং প্রায়ই ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া আমাদের ঘরে সাজাইয়া রাখিতাম। আজ বৈকালে যখন বাগানে যাইলাম দেখিলাম পাশের বাড়ীতে কেহই নাই, আমি ভাবিলাম কি জানি বোধ হয় সকলে বাহিরে গিয়াছে। অনেকক্ষণ বাগানে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিব বলিয়া, কতকগুলি সুন্দর গোলাপ ছিঁড়িলাম, ছিঁড়িয়া যেমন বাড়ী ফিরিতেছি অমনি কে একজন আমাকে

জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" আমি হঠাৎ অজানা লোকের গলা শুনিয়া চমকিয়া, পিছনে দেখিলাম এক বৃদ্ধ, দেখিয়া মনে হইল লোকটি যেন অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, মাথার কেশ ও শ্মশ্রু সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। আমাকে ভয় পাইতে দেখিয়া, আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের পাশের বাড়ী ভাড়া লইয়াছি, তুমি মাঝে মাঝে এই বৃদ্ধকে দেখিতে কি আসিবে?" তাঁহার গলা শুনিয়াই আমার সমস্ত ভয় চলিয়া গেল, এবং তাঁহার স্নেহ-ভরা চক্ষু দুটি দেখিয়া ইচ্ছা হইল যে তাঁহাকে তখনই যাইয়া সেবা ও যত্ন করি। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি একেবারে একলা আছেন?"

"না, আমার একমাত্র পুত্র ফ্রেড আমার সহিত থাকে, সে এখন বাহিরে গিয়াছে, এবং কাল সকালে সে যখন বাড়ী থাকিবে, তাহাকে তোমার সহিত আলাপ করাইয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি বাড়ী ফিরিয়া সকল কথা আমার পিতা ও মাতাকে বলিলাম। তাহার পরদিন দুফুর বেলা বাগানে গিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ খুব উচ্চৈঃস্বরে কাহার সহিত কথা কহিতেছে; আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিলাম, তাহার পর কাছে গিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ একলা একটি গাছের তলায় চৌকিতে বসিয়া আছেন; আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "তুমি আর একটু আগে আসিলেই আমার ফ্রেডিকে দেখিতে; সে এতক্ষণ আমার কাছে ছিল, এখন বাহিরে গিয়াছে।" আমার মনে মনে ফ্রেডিকে বড়ই দেখিতে ইচ্ছা করিত, কারণ যতক্ষণ বৃদ্ধর কাছে থাকিতাম, তিনি সমস্তক্ষণ ফ্রেডির কথা বলিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ফ্রেডিকে একদিনও দেখিতাম না।

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, বৃদ্ধর সহিত রোজই দেখা হইত, আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ গল্প করিতাম, তিনি কেবলই ফ্রেডির কথা বলিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি বাগানে বেড়াইতেছি এমন সময় বৃদ্ধ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই দেখ আমার ফ্রেডিকে।" আমি চারিদিকে দেখিলাম কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া, একটু অবাক হইয়া রহিলাম। বৃদ্ধ একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ফ্রেডির সহিত কথা কহিতেছ না কেন?" তখন আমার হঠাৎ মনে হইল যে এ বৃদ্ধ নিশ্চয়ই পাগল, কিন্তু তখন কি করিব; যদি ফ্রেডির সহিত না কথা বলি, বৃদ্ধর মনে বড়ই কষ্ট হইবে, সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ী বলিলাম, "আপনার নাম বুঝি ফ্রেডি? আপনাকে অনেক দিন হইতে দেখিতে চাই, কিন্তু আপনি প্রায়ই বাহিরে যান, সেই জন্য দেখা হয় না; আশা করি আপনার সহিত প্রায়ই দেখা হইবে এবং আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিবেন।" আমার কথা শুনিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ খুব

খুসি হইয়া শূন্যে হাত দিয়া বলিতেছেন, "ফ্রেডি কেমন লাগে এ মেয়েটিকে? আমার বড় ইচ্ছা তুমি ইহাকে বিবাহ কর।" আমি অনেক কষ্টে বাড়ী আসিয়া মাতাকে সকল কথা বলিলাম, তিনি সকল কথা শুনিয়া, খুব আশ্চর্য্য হইলেন এবং পরে বাহিরে খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন যে এই বৃদ্ধটি সত্য সত্যই পাগল। প্রায় ২ বৎসর আগে ইঁহার একমাত্র পুত্র ফ্রেডি, আমেরিকা নগরে কাজের চেষ্টায় যান, সেখানে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়া কয়দিনের মধ্যেই মারা যান। বৃদ্ধ এই সংবাদ পাইবামাত্র সেই যে শোকে পাগল হইয়া গেলেন, কোন ডাক্তার আর তাঁহাকে ভাল করিতে পারিল না। তিনি সর্ব্বদাই ফ্রেডিকে সম্মুখে দেখিতেন। যে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতেছিলেন তিনি আমাদের বলিলেন যে বৃদ্ধকে কখন না জানাতে যে উহার পুত্র সত্য সত্যই মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদা এমন ভাবে কথা বলিতে, যে ঠিক যেন ফ্রেডিও আমাদের কাছে আছে। এক দিন বৈকালে আমাদের তিন জনকে বৃদ্ধ আহার করিতে বলিলেন; আমি ও আমার পিতা মাতা সন্ধ্যার সময় পাশের বাড়ী যাইলাম। বৃদ্ধ আমাদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং শূন্য দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, "এই দেখুন আমার একমাত্র পুত্র ফ্রেডি, লোকে মিথ্যা করিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে ফ্রেডি আমার মরিয়া গিয়াছে। ফ্রেডি, সকলের সহিত আলাপ কর।" এই কথাগুলি বলিয়া বৃদ্ধ আমাদের সকলকে টেবিলে খাইতে বসাইলেন। আমরা চারি জন লোক মাত্র ছিলাম, কিন্তু পাঁচ জনের জায়গা করা হইল। বৃদ্ধর পাশে একটা জায়গা খালি রহিল। আমরা সকলেই বুঝিলাম ফ্রেডির জন্য এ স্থান করা হইয়াছে।

বৃদ্ধ সমস্তক্ষণ ঠিক যেন ফ্রেডি উপস্থিত আছে এই ভাবে তাহার উদ্দেশে কথা কহিতে লাগিলেন। খাওয়ার পর আমাকে বৃদ্ধ ডাকিয়া বলিলেন, "মেরি, একটি গান করিয়া ফ্রেডিকে শুনাও।" আমি তৎক্ষণাৎ বাজনার কাছে যাইয়া, বাজনা বাজাইয়া একটি গান করিলাম। আমরা বাড়ী ফিরিবার সময় বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন, "মেরি, তুমি আজ আমাকে ঠিক করিয়া বল, ফ্রেডিকে বিবাহ করিবে কি না? ফ্রেডির তোমাকে খুব পছন্দ হইয়াছে, এবং আমার ইচ্ছা যে মরিবার আগে তোমাকে আমার পুত্রবধূ দেখিয়া যাই।" আমি যে কি উত্তর দিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি বলি বিবাহ করিব না তাহা হইলে বৃদ্ধের হয় ত কষ্টে রোগ বাড়িবে; আর যদি বলি বিবাহ করিব, এবং সমস্তক্ষণ বৃদ্ধকে মিথ্যা ঠকাই সেটাও ত ঠিক হয় না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া, বলিলাম, "আপনি যদি আমাকে কাল অবধি সময় দেন, তাহা হইলে আমি ভাবিয়া আপনাকে ঠিক উত্তর দিব।"

বাড়ী ফিরিয়া মাতাকে সকল কথা

বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কি করা উচিত। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন যে, "এত দিন যখন মিথ্যা মিথ্যা ফ্রেডির সহিত ভাব করিয়াছ, তখন ইহাকে বিবাহ করিব না বলিলে বৃদ্ধ কিছু বুঝিতে পারিবে না, এবং রোগও বেশী হইতে পারে;" তখন আমি ঠিক করিলাম যে বৃদ্ধকে বলিব আমি তাঁহার ফ্রেডকে বিবাহ করিব। এইরূপ অনেক রকম ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ীর এক দাসী আসিয়া আমাকে বলিল, যে বৃদ্ধর অসুখ খুব বাড়িয়াছে এবং তিনি আমাকে এখনি দেখিতে চান। আমি তখনি বৃদ্ধর কাছে গিয়া যে কি দৃশ্য দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিব না। তিনি বিছানার উপর বসিয়া পাগলের ন্যায় "ফ্রেডি ফ্রেডি" বলিয়া ডাকিতেছেন এবং যখন কোন উত্তর পাইতেছেন না, তখন খুব কাঁদিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "মেরি, আমার ফ্রেডি কেন আমার কাছে আস্‌ছে না? অনেকক্ষণ তাহাকে ডাকৃছি, সত্যই বুঝি তাহলে মরিয়া গিয়াছে?"

আমি জানিতাম যে যখন তিনি সত্য জানিবেন ফ্রেডি মরিয়া গিয়াছে অমনি তাঁহারও মৃত্যু হইবে, সেই জন্য আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, "ফ্রেডিকে বিবাহ করিব আমি বলিয়াছি, সেই জন্য সে বিবাহের সব ঠিক করিতে গিয়াছে, সে ফিরিয়া আসিলেই আমাদের বিবাহ হইবে। পাদরি এইখানেই আসিয়া বিবাহ দিবে।" তিনি এই কথাগুলি শুনিয়া খুবই শান্ত হইলেন, এবং একটু পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইতি মধ্যে সত্য সত্যই এক পাদরি ডাকিয়া এবং আমি বিবাহের পোষাক পরিয়া বৃদ্ধের বাড়ী যাইলাম। তিনি এখন বেশ প্রফুল্ল মুখে আমাকে ডাকিয়া খাটিয়ার পাশে বসাইলেন, এবং আর একটা চৌকি পাশে দিতে বলিয়া বলিলেন, "ফ্রেডি এইখানে বসে মেরিকে বিবাহ কর। ভগবান তোমাদের দুজনকে চিরসুখে রাখুন—"

* * * *

আমাদের বিবাহ হইয়া যাইবার পর বৃদ্ধর আবার অসুখ বাড়িল এবং দুই দিনের মধ্যেই ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কয়েক বৎসর হইয়া গিয়াছে, এখন সত্য সত্যই ফ্রেডির এক মামাত ভাইয়ের সহিত আমার বিবাহ হইল। ফ্রেডি এবং তাহার বৃদ্ধ পিতার দুইখানি মস্ত ছবি আমাদের বাড়ীতে রাখিয়াছি, এবং এমন আশ্চর্য্য যে আমার স্বামীর মুখ ঠিকই প্রায় ফ্রেডির মতন।

জীবনচরিত।

সেদিন দুপুর বেলায় অনেকগুলি বই দেখিতে দেখিতে একখানি পুস্তক পড়িতে পড়িতে কত কথাই মনে হইল। সেখানি একটি জীবনচরিত। যদি কোন বাগানে বেড়াইতে যাওয়া যায় কতই সুন্দর সুন্দর ফুল দেখিতে পাওয়া যায়।

কত ফুল আবার গাছের মধ্যে এমন ভাবে লুকাইয়া থাকে যে তাহা সহজে দর্শকের চক্ষের সম্মুখে পড়ে না। যে ব্যক্তি ফুল বেশী ভালবাসে সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা বাহির করে ও তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌরভে মোহিত হয়। সেইরূপ এই বিশ্বমণ্ডলীটি একটি ফুলের বাগান। কত সুন্দর সুন্দর মানবচরিত-পুষ্প চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা সারাদিন সে বাগানে ভ্রমণ করিতেছি কিন্তু তাহাদের দেখিতে পাই না, কারণ কি? আমরা ভাল জিনিষের আদর জানি না, তাহা দেখিবার জন্য তেমন আকাঙ্খাও করি না। যদি তেমন আকাঙ্খা থাকিত তবে কত সুন্দর সুন্দর পুষ্প দেখিতে পাইতাম। সাধুরা যদি কোন সুন্দর জীবন দেখিতে পাইতেন তৎক্ষণাৎ চিনিয়া লইতেন।

এ জীবনটি কি সুন্দর, সত্য সত্যই এ জীবনটি একটি সুন্দর পুষ্প যাহা মায়ের চরণপূজার উপযুক্ত। এ বাগানের মালী কত যতনে ঐ সুন্দর পুষ্পটিই রচনা করিয়াছিলেন। আমরা জানিতাম না কোথায় কোন জায়গায় এমন সুন্দর জীবন লুক্কায়িত ছিল। মালী বুঝি তোড়া গাঁথিবার জন্য সে ফুলটি তুলিয়া লইলেন। এখন তার সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। যখন বাগান থেকে ফুলটি তোড়া করিয়া গৃহ সাজানো হয় তখন যেন তার সৌন্দর্য্য বাড়িয়া যায় আর দর্শকেরাও তাহার গুণ দেখিয়া অধিকতর মোহিত হয়। সেইরূপ এই জীবনটি এখন এই বিশ্বকানন হইতে তুলিয়া লইয়া এখন আরও উজ্জ্বলরূপে সেই বিশ্বপিতার গৃহ সাজানো হইয়াছে; উহা মানবমণ্ডলীর সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত। এ সকল জীবন পাঠ করিলে মনে হয় কি ছার নিজ জীবন। আমার যদি আজ মৃত্যু হয় তবে কি জীবনচরিত লিখিবার মত কিছু থাকিবে? কি রাখিয়া যাইব, দুইটি শুক্‌নো পাপড়ী? তাহাও হয় ত রাখিয়া যাইতে পারিব না। হয় ত এ জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই মানবচিত্ত হইতে বিস্মৃতি সাগরে লীন হইবে।

এই সকল উচ্চ ও মহৎ জীবন আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে সৎ পথে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইবার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরিত। একটি একটি জীবন পুস্তক পাঠ করি, দেখি আর সেইরূপে জীবন চালাইতে মনে বাসনা জাগিয়া উঠে। সংসারের অন্ধকার পথে আমাদিগকে আলোক দান করিতেছে এই সকল পুণ্যময় জীবন। আমরা যেন সেই সকল জীবনের প্রতিভায় নিজ নিজ জীবনকে, প্রতিভাময় করিতে পারি।

একটি গল্প।

শচীদের বাড়ী আজ খুব ধূমধাম। নহবৎ বাজিতেছে। দেবদারু পাতা ঝাড় লণ্ঠন দিয়া বাড়ীটি খুব সাজানো হইয়াছে। লাল কাপড় পড়িয়া পাগড়ী মাথায় দিয়া দাস দাসীরা সকলে কাজ

করিতেছে, কাজ থাকুক বা নাই থাকুক সকলে মিলিয়া একটা কাজের উপলক্ষ করিয়া খুব গোলমাল লাগাইয়াছে। এমন গোলমালে মানুষের মাথা ঠিক থাকাই দুষ্কর। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দৌড়াদৌড়ী চেঁচামেচী করিতেছে। বাহির থেকে এক দর্শক দেউড়ীর দরবানকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা তোমাদের বাড়ী আজ কি?" দরবান উত্তর করিল, "দিদিমণি কো সাদি হ্যায়।" এই সময়ে দর্শককে ঠেলিয়া দিয়া এক দল লোক বাড়ী ঢুকিল; সকলের মাথায় থালা। বাড়ীর বাহিরের চাকরেরা দৌড়িয়া ভিতরে খবর দিল তত্ত্ব আসিয়াছে। ছেলে বুড় সকলে "তত্ত্ব এসেছে" "তত্ত্ব এসেছে" বলিতে লাগিল। বাড়ীর চারিদিকে গোলমাল হইতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে গৃহিণীরা মেয়েদের বলিতে লাগিলেন, "তত্ত্ব এসেছে শাঁক বাজা।" মেয়েরা সকলে ঝুকিয়া ঝুকিয়া কেহ চিকের ভিতর দিয়া কেহ অর্দ্ধদেহ ঝুকাইয়া গবাক্ষ দিয়া কেহ দরজার ফাঁক দিয়া তত্ত্ব দেখিতে ব্যস্ত। গৃহিণী সকলকে ডাকিয়া বাড়ীর নীচের বড় ঘরে তত্ত্ব নামাইলেন। গৃহকর্ত্তা আসিয়া তত্ত্ব দেখিলেন। গৃহিণী খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন "খুব দিয়াছে খাসা দিয়াছে।" বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "ওরে খুকী শচীকে এক বার ডাক্ দেখে যাক তার শ্বশুর বাড়ী থেকে কি তত্ত্ব এসেছে।" খুকী শচীকে ডাকিতে ছুটিল। এ গৃহের প্রথমা কন্যা শচী। শচী দেখিতে সুন্দরী। তাহার পিতা মাতা তেমন ধনী ছিলেন না, কিন্তু বেশ টাকা ছিল যাহাতে তাহাদের বড় পরিবারটি বেশ স্বচ্ছলভাবে থাকিতে পারিত। শচী পিতা মাতার বড় আদরের। তাহাকে পিতা মনের মত করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। শচীর বয়স এখন সপ্তদশ বৎসর। তার পিতা মাতা দেখিয়া শুনিয়া একটি ভাল ছেলের সঙ্গে শচীর সম্বন্ধ করিলেন। বিপিন এম, এ, পড়িতেছিল ও ছেলেদের পড়াইয়া কিছু রোজগার করিতেছিল। বিপিনের সংসারে পিতা মাতা, দুইটি ভাই ও বড় একটি বিধবা ভগ্নী। বিপিনের পিতা ডাক্তার ছিলেন এখন পেন্সন্ লইয়াছেন। শচীর বেশ ঘটা করিয়া বিপিনের সঙ্গে বিবাহ হইল। শ্বশুর বাড়ী আসিবার দিন শচীর কান্না থামে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা মাতা ভাই ভগ্নী প্রতিবাসী ও দাসীগণ সকলেই কাঁদিতে লাগিল। শচীকে সকলেই বড় ভালবাসিত। শচী চলিয়া যাইতেছে ইহাতে সকলেই দুঃখিত। শ্বশুর বাটীতে শচীর খুব আদর হইল। সেখানে এই প্রথম বধূ আসিল সকলে আদর যত্ন করিতে লাগিল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। শচীর স্বামী বিদেশে একটী চাকরী পাইয়া সেইখানে শচীকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিন এক শত টাকা মাহিনা পাইত। সেখানে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিল। বিপিনের মাহিনা হইতে কিছু অর্থ তাহার

পিতাকে পাঠাইতে হইত। সেখানে অল্প খরচে সংসার চালাইয়া বাকি টাকা পাঠাইবে স্থির করিল। শচীর বয়স যদিও এখন আঠারো বৎসর তথাপি সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছুই তেমন বিশেষ জানিত না। পিতৃগৃহে তাহার কোন কাজই প্রায় করিতে হইত না, কখনও এক আধ বার তাহার মাতার সাহায্য করিত। শ্বশুর বাড়ীতে যদিও শ্বাশুড়ী ননদ দুইজনেই অনেক কাজ করিতেন, তাহাকে কেহই সাহায্য করিতে দিতেন না। শচী সময়ে সময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতে যাইত কিন্তু প্রায়ই যাহা করিতে যাইত তাহা খারাপ হইয়া যাইত, তাই আর সে কাজ করিতে সাহস করিত না। মনে মনে তাহার বড়ই কষ্ট হইত। কেবল ভাবিত বাপের বাড়ী লেখা পড়া না শিখিয়া যদি কাজ করিতে শিখিতাম কত উপকারে আসিত। লেখা পড়া ত কিছুই উপকারে আসিতেছে না। বিদেশে যখন সংসার পাতিল, তখন চেষ্টায় অনেক কাজ শিখিল। অনেক কাজের মধ্যে কোন্ কাজটা আগে করিবে বুঝিতে পারিত না। কোন কাজই ভাল করিয়া গুছাইয়া করিতে পারিত না। বিপিন কখন কিছু তাহাকে বলিত না। কিন্তু জানিত যে সে কোন কাজই শেখে নাই। শচী মরমে যেন মরিয়া থাকিত। সব কাজই উৎসাহ করিয়া করিতে যাইত, কিন্তু কোনটাই ভাল হইত না। বিপিন যাহাতে শচীর কোন কষ্ট না হয় এরূপ সুবন্দোবস্ত সংসারের করিয়া দিয়াছিল। একদিন বামুন আসে নাই শচী উৎসাহ করিয়া রাঁধিতে গেল। পা পুড়াইয়া রান্নাতে লুন দিতে ভুলিয়া গেল। তাহা খাইয়াই বিপিন বলিল বেশ হইয়াছে শচীর বড় আনন্দ হইল। কেহ তাহার কাজের সুখ্যাতি করিলে তার বড় আনন্দ হইত। শচী কোন দিন কিছু করিলে স্বামীকে গিয়া বলিত এই দেখ কেমন করিয়াছি। স্বামী মনে মনে হাসিত কিন্তু বাহিরে খুব প্রশংসা করিত। এত চেষ্টায়ও শচী যেন সংসারে হাবুডুবু খাইতেছিল। কোন মতেই যেন সংসারটা গুছাইতে পারিতেছিল না। কত তার সাধ হয় মনের মত করিয়া সংসারটি গুছাইয়া লয়, কিন্তু কিছুতেই যেন মনের মত কার্য্য করিতে পারিতেছিল না। শচীর মুখ স্বভাবতই গম্ভীর, দিন দিন যেন আরও সে নীরব হইতে লাগিল। স্বামীর ভাবনা হইল মনে হইল একলাটি রহিয়াছে বলিয়াই এরূপ হইতেছে। শচীকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার একলাটি বোধ হয় ভাল লাগ্‌ছে না? শচী চুপ করিয়া রহিল। বিপিন সেই দিন হইতে শচীকে একটু একটু পড়াইতে শিখাইল। শচী পড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহাতে সংসার আরও বিশৃঙ্খল হইল। বিপিনের কত দিন খাওয়া হইত না। ইহাতে বড়ই মনে মনে লজ্জা পাইত, কিন্তু চেষ্টা করিলেও কিছু করিতে পারিত না। একদিন ভাবিল স্বামীকে ভাল করিয়া খাওয়াইবে খাবার করিতে গেল।

টাকা খরচ করিয়া জিনিষ আনাইল সব নষ্ট হইয়া গেল। বিপিন তাহাকে সংসারের খরচ দিত। দিন দিন খরচ বেশী হইতে লাগিল। বিপিন একদিন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল এত টাকা কিসে খরচ হল। শচীর মুখ লাল হইয়া উঠিল আস্তে আস্তে সব বলিল। বিপিন দেখিল শচী সংসারের কার্য্য জানে না বলিয়াই এত কষ্ট পাইতেছে। সে শচীকে কিছু না বলিয়া তাহার ভগ্নীকে কিছুদিন আসিয়া তাহাদের ঘর সংসার গুছাইয়া দিবার জন্য চিঠি লিখিল। হেম বিপিনের ভগ্নী বাল্য-বিধবা। সে সংসার কার্য্যে সুদক্ষ। শৈশব হইতেই সে গৃহ কার্য্য ভাল-বাসিত। শ্বশুর বাড়ীতে যে কয়েক বৎসর ছিল তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে হইয়াছিল, এমন কাজ করিতে কেহ পারে না, এমন লক্ষ্মী বৌ আর কেহ নাই। সত্য সত্যই হেম লক্ষ্মীস্বরূপা ছিল, তাহার মিষ্ট স্বভাবে সকলেই সুখী হইত। কিন্তু হায় অকালে হেমের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইল। বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হইল। বালিকা হইলেও হেম কঠোর ব্রত সাধন করিত। বেশ তাহার মলিন, বৈরাগ্যের অন্ন তাহার আহার ছিল। আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবাসী সকলেই হেমের শোকে কাতর। কেহই তাহাকে এ কঠোর ব্রত সাধনে নিবৃত্ত রাখিতে পারিত না। সমস্ত দিন হেম পরিশ্রম করিত, যেন তাহার জীবনটি একটি কল, তাহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তা একবার চালাইয়া দিয়াছেন। সে কল, মৃত্যু অবধি চলিবে আর আসিবে না। কাহারও রোগ হইলে হেমকে ডাকাইয়া পাঠাইত হেম সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করিত। হেম দেবীরূপে সকলের গৃহে গিয়া উপ-কার করিয়া আসিত। কোন মারাত্মক রোগ হইলেও হেম কণামাত্র ভয় পাইত না, তাহার মৃত্যুকে বা রোগকে কিছু-মাত্র ভয় ছিল না। একদিন ত মরিতেই হইবে, তবে লোকের সেবা করিতে করিতে মরিলে ভালই হইবে। হেমকে দেখিয়া যেন মৃত্যু অবধি ভয় পাইত। আশ্চর্য্য যে গৃহে হেম সেবা করিতে যাইত সেই রোগীই ভাল হইয়া উঠিত। হেম যে শুধু দুঃখীর সহিত দুঃখ করিত তাহা নয়। যে গৃহে আনন্দোৎসব সে গৃহে গিয়া দেখ, হেম হাসিমুখে আনন্দ মনে সে গৃহে কার্য্য করিতেছে। হেম সকলের সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী ছিল। যখন যে বাড়ীতে কোন কাজ হইত হেমকে না ডাকিলেও সে আগে আসিয়া তাহাদের উপকার করিয়া যাইত। হেম ধার্ম্মিক ছিল এত কার্য্যের কোলাহলে সে পূজা করিতে ভুলিত না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন নিয়ম করিয়া হরিনাম করিত, সে সময়ে সহস্র লোকে তাকে ডাকিলেও উঠাইতে পারিত না। হেম এক মনে স্থির হইয়া ভগবানের নাম করিয়া সুখী ও ধন্য হইত। এই রূপে তাহার সুন্দর ও পবিত্র জীবন নদীর ন্যায় সকলের উপকার করিয়া

শান্তি দান করিয়া প্রবাহিত হইতে-ছিল।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গী।

সাধু ব্যক্তি স্বভাবতঃই সৎসঙ্গের অভি-লাষী। অসৎ সঙ্গ হইতে তিনি সর্ব্ব-দাই দূরে বাস করেন। পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় সকলেই সঙ্গী অন্বে-ষণে ব্যস্ত। কেবল যে মানব তাহা নয় কিন্তু জীব জন্তু পশু পক্ষী এমন কি বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত সঙ্গী অন্বেষণ করে। একা একা কেহই থাকিতে পারে না। আমরা মানব জাতি। আমরা মানবকেই অবশ্য আমাদের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করি। যাহার প্রকৃতি যেরূপ সে সেই প্রকার বন্ধু প্রাপ্ত হয়। হয় ত একজন খুব তরল প্রকৃতি সে কখনও গম্ভীর অথবা গুরুত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলিতে পারে না। সঙ্গের সঙ্গী সেই হইতে পারে যাহার সঙ্গে মনের মিল থাকে। প্রায় ইহা দেখা যায়, ভাল লোক কখনও মন্দ লোকের সঙ্গে বাস করিতে পারেন না। আবার মন্দ লোক কখনও সাধু সহবাসে বসতি করিতে পারে না। সাধু সঙ্গের গুণে কত পাতকী উদ্ধার হইয়াছে। কথিত আছে ভক্তপ্রবর শ্রীচৈতন্য দেবের সঙ্গ গুণে মহাপাতকী যে জগাই মাধাই তাঁহারাও পাপ মুক্ত হইয়াছিলেন। অশেষ দোষে দোষী ব্যক্তিও সাধু সঙ্গের গুণে ধন্য হইয়া অবশেষ মোক্ষ লাভ করেন। "সাধু সঙ্গ বরং একবারও প্রার্থনীয়; তৎপরে তাঁহাদিগকে পরম মিত্র বলা যায়, সাধুদিগের সহিত সহবাস বিফল নহে অতএব সাধু সমাগমে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবেক।" শাস্ত্রের এই মহদ্ব-চন কদাচ মিথ্যা নয়। বাস্তবিক সৎ-সঙ্গ আমাদিগকে সত্যের পথে অগ্রসর হইবার পরম সহায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সঙ্গী বিনা কেহ থাকিতে পারে না ইহা যেমন সত্য আবার ভগবান যে আমাদিগের চিরসঙ্গী ইহা তদপেক্ষা সত্য বলিয়া নিশ্চয়ই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। জন্মি-বার পূর্ব্বে আমরা তাঁহারই সঙ্গে বাস করিয়াছি, তাঁহারই সঙ্গে এ ধরাধামে পদার্পণ করিয়াছি তিনি যেমন সঙ্গের সঙ্গী এমন আর কেহই নয়। কিন্তু কয়জন আমরা নিয়ত সেই প্রেমময় বিধাতাকে সঙ্গীরূপে ধারণ করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছি। একটী কথায় সকলের সহজেই প্রতীতি জন্মিবে যে আমাদের ভগবান যেমন সম্বল ও নিত্য সঙ্গী এমন আর কেহই নয়। যদি আমরা কোন বিষম সঙ্কটে নিপতিত হই সে সময়ে ভগবান ভিন্ন সেই বিঘ্ন-হারী হরি বই আর কাহাকেও তো মনে পড়ে না, তাঁহাকেই আমরা সকলে আকুল অন্তরে কাতর প্রাণে ডাকি। যদি কোথাও যাইতেছি গম্য পথের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড মাঠ, আমি একাকি, ভয়ে প্রাণ উৎকণ্ঠিত; সেই ভয়ানক বিপদের স্থলে, "ভগবান রক্ষা

কর” ইহা ভিন্ন আর কিছু কি মনে আসে? বিপদে পরীক্ষায় শোকে দুঃখে মানুষ হরি বই আর কাহাকেও দেখিতে পায় না দেখিবার আকাঙ্খাও করে না। ধন, সম্পদ, বিষয়, বিভব, আত্মীয় বন্ধু জনে পরিবৃত থাকিলেও তদবস্থায় এক মাত্র হরি বিনা সেই পরমাশ্রয় বিনা কিছুতেই বা কোন মনুষ্য সহবাসেই প্রাণের পরিতৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। অতএব আমরা দেখিতে পাই সেই পরম ব্রহ্ম ভগবানই আমাদের সঙ্গী। তাঁহার সঙ্গ ও সহবাসই আমাদের প্রার্থনীয় এবং আকাঙ্খার বস্তু। এই বিশ্ব সংসারে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তিনি ভিন্ন কাহাকে আর দেখি? মৃত্যুকালে এই ঘোরতর ভবনদী আর কে কর্ণধার হইয়া পার করেন? চারি পার্শ্বে আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া হরি নামই শুনাইতে থাকেন। সকলেই জানেন হরি নাম বিনা আর কেহ দেহ পিঞ্জর হইতে গমনোন্মুখী আত্মা বিহঙ্গকে আর কোন সঙ্গ দিয়া রক্ষা করিতে পারে না। যিনি আমাদের নিত্য এবং চিরসহচর, তাঁহার সঙ্গে আমরা বাস করিতেছি মুহূর্ত্তও তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা থাকিতে পারি না। আমাদের এই দেহ, মন, আত্মা সেই মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত। প্রেমময় দীনবন্ধুকে সঙ্গী করিয়া আমরা সকল বিপদ এবং পাপ প্রলোভন হইতে মুক্ত হই। সর্ব্বদা যেন বলি “সঙ্গের সঙ্গী করে লও আমারে ওহে দয়াময়।”

সন্তান পালন।

পাঠিকাগণ, তোমরা মনে করিতে পার, এই পুরাতন বিষয় বার বার লিখিবার কি আলোচনা করিবার কি দরকার? কিন্তু পাঠিকা, যদি ভাবিয়া দেখ, এ পৃথিবী কত পুরাতন কিন্তু সকলের কাছে ইহা নিত্য নূতন; আকাশের চাঁদ কত শত শত বৎসরের তবু সকলে ইহার রূপে মোহিত; তেমনই মাতার কাছে সকল সময়েই সন্তানের কথা সর্ব্বদা নূতন বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কত মাতার অসাবধানতায় সন্তানদের নানারূপে ক্ষতি হয়। প্রতিদিন পিতা মাতার সন্তানের জন্য সতর্ক ও সাবধান হওয়া উচিত। পিতা মাতার সামান্য কথায় পুত্র কন্যার কত যে ক্ষতি হয় তাহা একটু ভাবিলেই বুঝা যায়। একটি ছোট বালক একদিন সন্ধ্যা আহারের পর তাহার পড়িবার ঘরে গেল, কিছুক্ষণ পরে খুব একটা গোলমাল চীৎকারের শব্দ শুনিয়া আমি ঘরের বাহির হইতে “কি হইল” দেখিতে গেলাম। দেখি সেই বালকটি আরও কয়েকটি বালক লইয়া খেলা করিতেছে, অর্থাৎ ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, হাসি দ্বারা ঘর পূর্ণ করিতেছে। খেলার ভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া দ্বারের আরও একটু কাছে গেলাম, দেখি শিশি করিয়া লাল জলের মত কি রহিয়াছে আর গেলাস করিয়া তাহা ঢালিতেছে ও পান করিতেছে। কোন বালক বলিতেছে

“আমার বাবা কিন্তু খাইয়াই পান খায়,” আর একজন বলিল “আমার বাবা খাইবার খানিকক্ষণ পরে মাটিতে গড়াগড়ি দেন।” একজন বলিল “আমার বাবা, একদিন এসে মাকে এত মেরেছিলেন, মা বল্লেন আজ বুঝি খুব খেয়েছ?” কথাগুলি শুনিয়া প্রাণটায় এত আঘাত লাগিল, নিঃশব্দে আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম, জানিলাম পিতা মাতার জন্য সন্তানদের এই শিক্ষা। একদিন একটি বালিকা তাহাদের ছাদের উপরে একটি ফুলের টবে একটি পয়সা পুঁতিতেছিল আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, “মা সে দিন বল্‌ছিলেন এ পৃথিবীতে, টাকাই সব। যার টাকা নাই, তার বাঁচা উচিত নহে। তাই আমি একটি পয়সা এনে পুঁতিতেছি। যখন বড় হব তখন আমার কত টাকা হবে।” দেখিয়া, শুনিয়া অবাক হইলাম। কি শিক্ষাই সন্তানেরা পাইতেছে! ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নীতি, রীতি কোথায় গেল, শেষে সন্তানদের এই শিক্ষা? নির্দ্দোষ সন্তানদের কষ্ট আমাদেরই জন্য। নতুবা, কেন একবারও আসে না! দেখেছি তাহাকে, ছিল যখন এখানে, সন্ধ্যা কালে, ছাদের উপরে, নক্ষত্রের পানে তাকাইয়া কত কথা বলিত, যেন বলিত “কবে আবার তোমাদের কাছে যাব।” দেখেছি ফুল হাতে নীরবে ফুলের পানে তাকাইয়া হাসিতে। কিন্তু সংসারে দেখেছি ভাবিয়াছি কি সাজ সজ্জা, কি বিলাসী, কি সংসারাসক্তি! কিন্তু এসে-ছিল খেলিতে, ভাল বুঝি লাগে নাই তাহার এ খেলা, তাই বুঝি চলে গেল সে! কিন্তু আছে ভাল সে। স্বধামে সুখধামে নক্ষত্রের নিকটে, পুষ্পদলের মাঝে সে সুখেই আছে।

ক্ষুদ্র পাতিয়ার জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাতিয়া দিন দিন আপনার পলায়নের অভিপ্রায় অন্তরে পোষণ করিয়া শেষে কার্য্যে পরিণত করিবার পথ পাইল। তাহার একটী সমবয়স্কা প্রতিদিন তাহারি মত প্রাতঃকালেই পুকুরঘাটে বাসন মাজিতে যাইত ও তাহার সহিত মনের কথা কহিয়া পরস্পরের সদ্ভাব দিন দিন ঘনীভূত করিয়াছিল; (সে বধূটীর নাম কি তাহা আমার মনে নাই) পাতিয়ার মত সেও শ্বশুরালয়ে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সময় সময় জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প করিত; এত দিন সময় ও সুবিধা পায় নাই। পাতিয়ার সহিত ভাব হওয়ায় তাহার আবার জীবনের মায়া হইল। পাতিয়ার সখী পতিহীনা, পিতৃ-মাতৃহীনা; যে খুল্লতাত তাহাকে শৈশবে লালন পালন করিয়াছিলেন তিনিই আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন; তাহাতে সে পরম সুখী ছিল। সে পূর্ব্বে জানিত না যে সে তাহার মৃত পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, এই জন্যই তাহাকে বিষয়ের লোভে খুল্লতাত পুত্রবধূ করিয়া তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন।

আশৈশব-সঙ্গীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগিনীর অল্প দিনের মধ্যেই সকল সাধ আশা ফুরাইয়া গেল; ১৫ বৎসর বয়সে সে বিধবা হইল, খুল্ল-তাত-পত্নী বা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীরও তাহার পর কাল হইল। সংসারের সকল ভার তাহার মাথায় পড়িল। তাহার আর তিনটী দেবর ও দুইটী ননদিনী ছিল; একটী দেবরের বিবাহ হইয়াছিল। ছোট ননদিনী একটী তাহার সমবয়স্কা ছিল; তাহার কাজ ছিল সমস্ত দিন বধূ যাহা কাজ করে কি কথা কহে তাহার ছল ধরা; আর বড়টীর কাজ জ্বালা দেওয়া, দেবরের কাজ তাড়না। কেবল শ্বশুর সময় সময় স্নেহের কথা কহিতেন; অভাগিনীর ভাগ্যে তিনিও করাল কবলে পতিত হইলেন। পাতিয়ার সখীর এ সময়ে দুঃখের সীমা রহিল না, এই সময়েই সে প্রাণপণে মৃত্যু কামনা করিত; বিধাতার দয়ায় সে এই দুঃখের সময়েই, পাতিয়াকে প্রতিবাসিনীরূপে পাইল। পাতিয়ার কথাতেই প্রমাণ পাইলাম যে পাতিয়া কিন্তু তাহার মত লক্ষ্মী মেয়ে ছিল না। পাতিয়ার সখী সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত, মুখরা পাতিয়া তাহা পারিত না; কথা কহিয়া আরও দ্বিগুণ প্রহার ও যন্ত্রণা ভোগ করিত। অনেক যত্নেও পাতিয়া বাল্যকালে যে লেখা পড়া শেখে নাই, এ অবস্থায় পড়িয়া সে জন্য বড় অনুতাপ হইল; ভাবিল একখানি পত্র লিখিয়া পিতাকে দুঃখ জানাইলে অবশ্যই সেখান হইতে তাহাকে লইতে আসিবে, কিন্তু তাহা পারিত না। ভাবিত অনেক দিন ত আসিয়াছি কেন পিত্রালয়ের লোক আসে না? এদিকে শ্বাশুড়ী যে তাহাকে একেবারে পাঠাইবে না বলিয়া লোক আসিলে ফিরাইয়া দেয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অবধি দেয় না সে কথা পাতিয়া কিছুই জানে না। পাতিয়া পিতা ও ভ্রাতাগণের উপর অভিমান করে, শেষে কোন প্রতিবাসিনীর নিকট শ্বাশুড়ীর এই গুণের কথা শুনিয়া অন্তরে জ্বলিয়া গেল; শ্বাশুড়ীর সহিত বচসা করিয়া স্বামী ও শ্বাশুড়ী দুজনের কাছেই মার খাইল, আহার করিল না, কাজ করিল না, সমস্ত দিন পড়িয়া কাঁদিল; সন্ধ্যার সময় সুযোগ দেখিয়া সখীর সাক্ষাতে সমস্ত মনের কথা কহিয়া পিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিল; সখী প্রতিশ্রুত হইল সকলে ঘুমাইলে সে রাত্রে লিখিয়া রাখিবে। এখন সে লেখনী মসী কাগজ কোথা পাইবে? পাতিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গেল। পাতিয়ার সখী পাতিয়ার পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিল; পরদিন অতি প্রত্যূষে নির্দ্দিষ্ট বাঁশ বনের অন্তরালে গিয়া পাতিয়ার সাক্ষাতে সমস্ত পত্রখানি পড়িয়া শুনাইতেছে এমন সময় বোধ হইল তাহার অপর দিক হইতে কোন মানুষ নড়িল ও হুঁ করিয়া শেষ কথায় সায় দিল; পাতিয়ার বন্ধু ভীত হইয়া চারিদিক চাহিল; পাতিয়া হাসিয়া কহিল ও কিছু নয়, বাঁশে বাঁশে লাগিয়া ও রকম

অনেক শব্দ হয়—মনে হয় যেন মানুষে কথা কহিতেছে; বন্ধু তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া আপন কাজে গেল, যাইবার সময় বলিল আমি ডাকে দিতে পারিব, আমাদের গোয়ালিনী বড় বিশ্বাসী। সে দিন সমস্ত দিন আর পাতিয়া সুস্থির হইতে পারিল না। কখন আহারের পর শ্বাশুড়ী নিদ্রা যাইবেন? হায়! সে দিন শ্বাশুড়ীও যেন পাতিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন, নিদ্রা গেলেন না। পাতিয়া ভাবিল আজ শ্বাশুড়ীর চোখে ঘুম নাই কেন? দুই প্রহর অতীত হইতে না হইতে স্বামী জ্বর হইয়াছে বলিয়া কার্য্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পাতিয়ার কি বিপদ! সে মনে মনে স্বামীকে গালি দিতে দিতে ক্রমে অস্পষ্ট করিয়া মুখেই বলিয়া ফেলিল; মুখের কথা শেষ পর্য্যন্ত বাহির হইতে না হইতে দুই দিক হইতে ঝাঁটা জুতা লাঠী প্রভৃতি অনর্গল তাহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। লোক জমা হইল, কেহই পাতিয়ার হইয়া কথা কহিল না; অবশেষে "ঢেঁটা বউ" "তেঁদোড় বউ" নামে পাতিয়াকে অভিহিত করিয়া দর্শকমণ্ডলী গৃহে ফিরিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে পল্লী নিস্তব্ধ হইলে পাতিয়াকে আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী জ্বর গায়েই অন্বেষণে বাহির হইল, শ্বাশুড়ী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়াই পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রিণীর মত ঘরে গর্জ্জিতে লাগিলেন। পাতিয়ার সখী চোরের মত নিজ গৃহের কোনে লুকাইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মহা হুঙ্কার শব্দে পাতিয়ার স্বামী একখানি পাল্কী করিয়া পাতিয়াকে লইয়া ফিরিলে গ্রামে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। পাতিয়ার সখীর ননদিনী ভ্রাতৃজায়াকে আগুণে চিম্‌টা পোড়াইয়া তাহার হাতে ছেঁকা দিলেন। পাড়াময় রাষ্ট্র হইল সখীই পাতিয়ার পলায়নের মন্ত্রণাদাত্রী। দুই ঘরের দুই বধূর তাড়না অমানুষোচিত হইতে লাগিল। "বধূ ভ্রষ্টা," রটনা করিয়া শ্বাশুড়ী পুত্রের শীঘ্রই বিবাহ দিলেন। পাতিয়ার সপত্নী দরিদ্রার কন্যা, তাহার মাতা পর্য্যন্ত ঘরে আসিল; সেও দারুণ কষ্টে ফেলিয়া পাতিয়াকে গোয়াল ঘরে আশ্রয় দিল, স্বামীকেও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে দিত না। পাতিয়া ধনীর কন্যা, সে গরুকে আহার দিতে ও গোয়াল কাড়িতে পারিত না বলিয়াও সপত্নীমাতা তাড়না করিতেন। দিবা রাত্রি যাতনায় পাতিয়া শীর্ণ হইল; তখন তাহার মনে হইত যে ভ্রাতৃজায়াদিগকে যে সামান্য ক্লেশ দিয়াছি সেই পাপেই আমার এই দুর্দ্দশা; ভাবিত আবার যদি কখন পিত্রালয়ে যাওয়া ভাগ্যে থাকে, এই যাতনা সহিয়া বাঁচি, তবে তাহাদের উপর কত সৎ ব্যবহার করি। ঘোর দুঃখে পড়িয়া পাতিয়া আল্লা নাম প্রাণের ভিতর লইতে শিখিল। এ সংসারে পাতিয়ার জুড়াইবার স্থান প্রিয় সখী, তাহার কথা শুনিয়াই সে এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে, মনে করিত; সখীকে বলিল চল আমরা দুজনেই এ যন্ত্রণাময় স্থান হইতে পালাই! সখী কহিল তোমার পিত্রালয় আছে

যাইতে পার, আমার স্থান আর নাই। পাতিয়া কহিল আমার স্থান যেথা তোমারও সেথা। সখী কহিল তুমি পলাইও না, পলাইলে আমার যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না; আমার ভালবাসার জন্যই তোমাকে থাকিতে হইবে। পাতিয়ার তাহা ইচ্ছা নয়।

এইরূপে কিছুদিন গেল। একদিন এমন কোন ঘটনা হইল যাহাতে পাতিয়ার সখী পলায়ন ব্যতীত অন্য কোন পথ দেখিতে পাইল না; যেথা যাইতে হয় স্বীকার, এ পাপ গৃহ ত্যাগ করিবে, দেবরগণের অবচণীয় উৎপীড়ন অসহ্য—ইহা পাতিয়াকে জানাইল। পাতিয়া কালবিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রেই পলায়ন সঙ্কল্প করিল। বাড়ীর কেহই এবার জানিতে পারিল না। পূর্ব্ববারে যেমন জানিতে পারিয়া সতর্ক হইয়াছিল এবার আর কিছুই হইল না। সে দিন কোন প্রতিবাসিনীগৃহে কর্ম্ম উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষগণ সেইখানে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; দুই বধূ অবসর বুঝিয়া আপনাদের পথ দেখিল। পাতিয়ার সখী বয়সে বড়; এস্থানে আশৈশব বসতি করিতেছে, পথ ঘাট সকলি জানে; সে সমস্ত ঠিক করিল—কাঠ, কয়লা, মালসা, ধূণা, বিড়া, সোলা, চকমকি, ইত্যাদি। ঘরে সন্ধ্যা দিয়াই পাতিয়াকে সঙ্গী করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল; বাহির হইবার সময় একটী কৌটা লইয়া গাছ-কোমর বাঁধিল। পাতিয়াকে কাপড় "সাপটাইয়া পর" বলিল; পাতিয়া পরিল। সে পাতিয়াকে কয়লা সমেত মালসা ও একটী বিড়া দিল, অন্য মালসা ও বিড়া নিজে লইল, চকমকি বস্ত্র মধ্যে রাখিল; পরে পথে বাহির হইল। কর্ম্ম-বাড়ীতে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে; তাহারা সে দিকে গেল না; পুকুর পাড় দিয়া চলিয়া গেল। খানিক গিয়া পাতিয়া কহিল ঐ ওদিকে সেবার ধরা পড়েছি, চলে চল; ওখানটী দেখ্‌লে বুক দুড় দুড় করে। তাহারা দ্রুত গতিতে চলিয়া অনেক দূর আসিল। অন্ধকারে পথ চলা দুষ্কর। গ্রামের পর গ্রাম চলিয়া গিয়াছে; মালসায় ধূণা জ্বালিয়া মাথায় করিল, শীতকালে ঘর্ম্ম বাহির হইয়া গেল, পাতিয়া অবসন্ন হইল। তখন মনে হইল, কোথা যাইব? সখীকে জিজ্ঞাসা করিল কোথা যাব কত দূরে যাব? সখী কহিল আমার নানার বাড়ী। পাতিয়া কহিল সে কত দূর?

স। অনেক দূর।

পা। আমার পা ব্যথা কর্‌বে।

স। আমার জুতা তুমি পর।

পা। পায়ে বড় হয়, পড়ে যাব।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে যাইতে লাগিল; ক্রমে আর কথা চলে না কারণ সখী অনেক আগে আগে যাইতেছিল; পাতিয়া পিছাইয়া পড়িতে লাগিল; এক মুঠা ধূণা আগুণে দেয় আর চলে। ক্রমে নিশার অন্ধকার দূর হইতে লাগিল, আকাশে শুক-তারা দেখা দিল। সখী উতলা হইল, কহিল আর বিস্তর পথ নয় একটু চলে চল; আমি আগিয়ে

যাই, আমার মাথার আগুণে লক্ষ্য রেখে পাছু পাছু এস; আর কথা কয়ো না। নীরবে পথ চলিতে চলিতে পাতিয়া একটী বিকট চীৎকারে চমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটী লাল পাগড়ী ওয়ালা লোক দেখিয়া হুছট খাইয়া পড়িয়া গেল; মুখে বাক্য সরিল না। পাহারাওয়ালা রুল বাহির করিয়া কহিল, কে তুই কোথা যাচ্ছিস্? পাতিয়া কহিল—বাপের বাড়ী।

পাহারাওয়ালা কহিল, সে কোথা?

পা। এলাহাবাদ।

পাহা। (হাসিয়া) এইখান থেকে হেঁটে এলাহাবাদ যাবে! এ নিশ্চয় পাগল।

পাতিয়া সখীর নাম করিয়া কান্না আরম্ভ করিল। পাহারাওয়ালা বুঝিল আর এক জন পালাইয়াছে; সে হাঁক্ দিয়া অপর কন্‌ষ্টবলকে ডাকিল, অন্য জন আসিলে পাতিয়াকে থানায় লইয়া যাইতে বলিয়া পলাতকের অন্বেষণে গেল।

পাতিয়ার কাহিনী শুনিবার পর তাহার সখীর কি হইল জানিবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হইল। পাতিয়া যখন তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইত তখন বড় মন কেমন করিত।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

সিংহমুখে ভয়ানক মৃত্যু!—বার্লিন হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বিগত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তত্রত্য কোন পশু প্রদর্শনীতে ম্যাডাম ফিসার নাম্নী এক বিবি দশটী সিংহের সহিত ক্রীড়াকালীন ভয়ঙ্কররূপে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিতা হন।

ম্যাডাম ফিসার দেখিতে অতি সুন্দরী, নাতিস্থূলা, নাতিকৃশা। তিনি সুন্দর সান্ধ্যসজ্জায় সজ্জিতা হইয়া পরিষ্কার শুভ্র পাদুকা পরিধান করতঃ সিংহ-পিঞ্জরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে কেবল এক গাছি চাবুক ছিল; তিনি যে কোন অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার তৎকালীন ভাব ভঙ্গীতে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইতেছিল না।

প্রথমতঃ দশটী সিংহই তাঁহার ইঙ্গিত মত ক্রীড়া করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রীড়ার শেষ ভাগে উহাদিগের মধ্যে আফ্রিকাদেশীয় একটী বৃদ্ধ বন্য সিংহ একটী কাগজনির্ম্মিত চক্রের মধ্য দিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। ম্যাডাম ফিসার তাহাকে চাবুক আঘাত করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই উক্ত চক্র মধ্য দিয়া না যাওয়াতে তিনি তাহার মস্তকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সিংহ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আক্রোশে ম্যাডাম ফিসারের উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং সম্মুখস্থ

পদনখর দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিল। এইরূপ ঘটিতে না ঘটিতে অপর নয়টী সিংহ মনুষ্যশোণিত আঘ্রাণে ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে হতভাগিনী নারীর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

এত শীঘ্র ম্যাডাম ফিসার প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সিংহমুখ হইতে রক্ষা করিবার অবসর একেবারেই ঘটিয়া উঠে নাই। মৃত্যুর পর উক্ত প্রদর্শনীর স্মিথ নামক এক সিংহ ক্রীড়ক একটা লৌহদণ্ড লইয়া পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মনুষ্যশোণিত-লোলুপ সিংহ দশটীকে একেবারে অসমসাহসে আক্রমণ করিলেন। প্রদর্শনীর অপর কতকগুলি লোক সেই সময় বাহির হইতে লৌহদণ্ড দ্বারা সিংহগুলিকে আঘাত মানসে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

প্রথমে দর্শকবৃন্দ মনে করিলেন বুঝি স্মিথও উক্ত নারীর দশা প্রাপ্ত হইবেন। সিংহগুলি ভয়ঙ্কর আক্রোশে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। স্মিথ অকুতোভয়ে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া ধৈর্য্য প্রদর্শন করতঃ তাহাদের সকল আক্রমণ সহ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার লৌহদণ্ড দ্বারা সিংহ দশটীকে এক কোণ ঠাসা করিলেন; ইতিমধ্যে প্রদর্শনীর দুই জন লোক ম্যাডাম ফিসারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃত দেহ বাহির করিয়া আনিল। মানুষে পশুতে যুদ্ধ! অপূর্ব্ব দৃশ্য!! যখন এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে, তখন প্রদর্শনীক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য! অনেক মহিলা এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, আবার অধিকাংশ লোকেই পলায়নের জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু যখন স্মিথ পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দর্শকবৃন্দ পলায়নে বিরত হইলেন; তাঁহারা অবাক হইয়া স্মিথের ক্রীড়া কলাপ দর্শন করিতে লাগলেন! দশটী সিংহের বিরুদ্ধে এক জন মাত্র মনুষ্য, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ম্যাডাম ফিসার ত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন; দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এক সহস্রবার তিনি সর্ব্বসমক্ষে সিংহপিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; অপরাপর সকল সিংহ ক্রীড়কের ন্যায় তাঁহারও এ প্রকার জীবনধারণে বড় ঘৃণা ছিল। তিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জনের প্রতীক্ষায় এত দিন এই কার্য্যে লিপ্তা ছিলেন। সিংহমুখে যখন তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন তখন তাঁহার ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ষীয় তিনটী শিশু সন্তান সেই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। আহা কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য!

স্বর্ণরেণু।

অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংসারী হইলেও মুক্ত, আর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দীর্ঘকাল তপস্যা করিলেও মায়াবদ্ধ।

একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত-ফল ভোগ করে।

কেহ কঠোর কথা বলিলে তাহা সহ্য করিবেক, কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; এই মানব-দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বৈর আচরণ করিবেক না।

২৬ বর্ষ] পৌষ ও মাঘ ১৩১০। [৯ম ও ১০ম সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. JANUARY & FEBRUARY, 1904. Nos. 9 & 10.

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।	বিষয়।		পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	১৯৩	প্রতীক্ষা	...	২১০
ধার্ম্মিকা নারী	...	১৯৪	সংসারে যোগ	...	২১১
পদ্য	...	১৯৫	এই কি সত্য দৈববাণী	...	২১২
মৃত্যু	...	১৯৬	সময়	...	২১৬
জীবন-কুসুম	...	১৯৬	এই তো সংসার	...	২১৭
পত্র	...	২০০	আদর্শ পরিবার	...	২১৮
সাধনা	...	২০১	জিজ্ঞাসা	...	২১৯
বিমলার জীবন-কাহিনী	...	২০২	মৃত্যুকালীন উক্তি	...	২২০
সুন্দর জীবন কাহাকে বলে		২০৭	পাক বিধি	...	২২১
ক্রোধ	...	২০৯	Selections	...	২২২
বেশী কিছু নয়	...	২১০	সংবাদ	...	২২৩
			স্বর্ণরেণু	....	২২১

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga: Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays: Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

		মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ ...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৶০
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৶০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১৷৷০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১৷৷০
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা ...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব ...	৷৷০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	৷৷০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৷০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৷০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	৷৷০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	৷৷০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৷০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	৷৷০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	৷৷০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	৷৷০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	৷৷০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৶০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৶০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৵০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার ...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৷৷০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৷৷০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৷৷০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৷৷০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ। কলিকাতা, পৌষ ও মাঘ, ১৩১০। ইং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯০৪। ৯ম সংখ্যা।

বিনীত নিবেদন।

১৩১০ সালের বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় মূল্য দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন নাই। কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শুনা যায় সূর্য্যের আলোক প্রায় ৭ লক্ষ চন্দ্রের আলোকের সমান।

যৌবন অপেক্ষা বৃদ্ধ বয়সে আহার দ্বিতীয় বা তৃতীয়াংশ কমিয়া যায়।

মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে দণ্ডায়মান অবস্থায় ৮০ বার, উপবিষ্ট অবস্থায় ৭১ বার, এবং শয়নাবস্থায় ৬৬ বার নড়িয়া থাকে। এই সাধারণ নিয়ম।

গরম জলে আধ-শুকন ফুল বোঁটার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে আবার টাট্‌কার মতন হয়।

লণ্ডনে ৪০টি হোটেল আছে তাহাতে মাছ মাংসের ব্যবস্থা নাই; সমুদয়ই নিরামিষ ভোজের আয়োজন।

কাগজকে জলে কিঞ্চিৎ সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কাচ মুছিয়া, পরে শুষ্ক কাগজ দিয়া আর একবার মুছিলে, তাহা সুন্দর পরিষ্কার হইয়া থাকে।

মানুষ যখন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন তখন তিনি অপরাপর সকল সময় অপেক্ষা আপনাকে অধিকতম দুর্ব্বল জ্ঞান করেন।

কোন ব্যক্তি বেলুনে আরোহণ করিয়া দেখিয়াছেন যে এক মাইলের ঊর্দ্ধ উঠিলে

পুরুষের কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না; কিন্তু স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর পাঁচ মাইলেরও উর্দ্ধে শুনা যায়।

স্বর্গীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে উপবেশন করেন তখন এক দিন তাঁহার মন্ত্রী লর্ড মেল্‌বোর্ণ কোন একটি রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহার নিকটে প্রস্তাব কালীন বলেন, "এইটি সুবিধা।" ভিক্টোরিয়া ইহাতে উত্তর করেন, "ভাল আর মন্দ এই দুইটি কেবল আমি বিচার করিতে শিখিয়াছি; সুবিধা বলিয়া যে শব্দ প্রচলিত তাহা আমি শুনিতে কিম্বা বুঝিতে ইচ্ছা করি না।"

ধার্ম্মিকা নারী।

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সকল দেশেই এই বিষয়ে বাদানুবাদ চলিতেছে ক্ষমতায় কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট সকলেই এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে কাহার শ্রেষ্ঠতা আজ আমরা তাহাই আলোচনা করিব। ধর্ম্মেতে যে কেবল পুরুষেরাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন এমন নহে। সকল দেশে সকল ধর্ম্মসমাজেই এমন স্ত্রীলোক সকল সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা আজিও ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা প্রতি ধর্ম্মসমাজ হইতে দুই এক জন ভাল স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিব। খ্রীষ্টধর্ম্মে মহাত্মা ঈশার মাতা মেরী অতি ধার্ম্মিকা ছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মসমাজে তাঁহার এত দূর প্রাধান্য যে উক্ত ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ঈশা অপেক্ষা তাঁহাকে উচ্চ আসন দান করিয়াছেন। পাপের নিমিত্ত ক্ষমা, রোগ বা বিপদ্ শান্তি ইত্যাদির নিমিত্ত প্রার্থনা "মাতা মেরীর" নিকটই প্রেরিত হইয়া থাকে। লাটিন ভাষায় একটি খুব ভাল প্রার্থনা আছে তাহার প্রথম শব্দ "আমাদের মাতা মেরী" রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সকল প্রকার উচ্চ কোমল পবিত্র সদ্‌গুণে মেরীকে ভূষিত করিয়াছেন। বাইবেলে আরো অনেক ধার্ম্মিকা নারীর নাম পাওয়া গিয়া থাকে। মোহম্মদের স্ত্রী খাদিজা ও তাঁহার কন্যা ফতেমা ও তাঁহার ধর্ম্মমাতা হালিমা মুসলমান ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তকে অনেক ভাল স্ত্রীলোকের উল্লেখ আছে। শাক্য বা বুদ্ধদেব যখন অনাহারে বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক সমাধিমগ্ন থাকিতেন তখন একজন ভদ্র নারী স্বহস্তে পরমান্ন প্রস্তুতপূর্ব্বক তাঁহার আহারার্থ প্রেরণ করিতেন। ইনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্যা হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশেও ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের অভাব নাই। পুরাতন কালে অনেক স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশে ধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী গার্গী ইত্যাদি মুনিপত্নীগণ যোগতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের অতি উচ্চ কঠিন ও গূঢ় বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়ীর সহিত তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তরাদি সকলেই অবগত আছেন। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ইঁহারা পতিভক্তি, দয়া, ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সংসারে ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মোন্নতির অতিশয় উচ্চতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

* * * *

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

পদ্য।

(হিন্দুমহিলা রচিত)

হে ভগবান তোমায় করিলে স্মরণ।
হৃদয়ে আনন্দ হয় প্রফুল্ল আনন॥
যখন তোমায় আমি ডাকি প্রেমভরে।
আনন্দেতে মন-পাখি কত নৃত্য করে॥
তাই বলি তুমি হরি ওহে প্রাণসখা।
একবার হৃদি মাঝে আসি দাও দেখা॥
কত দিনে পরীক্ষা অনলে পোড়াইবে।
পরীক্ষাতে মরি যদি কি করিলাম ভবে॥
তোমার স্বর্গীয় বায়ু দাও মম গায়।
সে বাতাসে পাপ-ধুলা যেন উড়ে যায়॥
মিশিয়া মম নিশ্বাসে তোমার নিশ্বাস।
অন্তরের দাও পঙ্ক ধুইয়া বিশ্বাস॥
পবিত্র করিয়ে দাও মম এই দেহ।
ছুঁতে নাহি পারে যেন রিপু আসি কেহ॥
পবিত্র হইয়ে তব হইব বিশ্বাসী।
চিরকাল পদতলে হয়ে রব দাসী॥
হরিনামে ভরসা হে হইবে হে আমার।
তুচ্ছ হবে টাকা কড়ি স্বর্ণ অলঙ্কার॥
সরলতা ধনে ভরা হৃদয়-ভাণ্ডার।
থাকিবে না রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অহঙ্কার॥
ফেলে দিতে পারি যেন দেহ অভিমান।
সমজ্ঞান হয় যেন মান অপমান॥
হে প্রভু হৃদয় মম করে দাও উচ্চ।
সংসার বাসনা মম হয়ে যাক তুচ্ছ॥
এ মনে এস্থানে আর থাকিতে না চাই।
নব মন দেহ মোরে এই ভিক্ষা চাই॥
যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করি অনেক আছে ছায়া।
তাহাতে কল্পনা আছে কই শুদ্ধ কায়া॥
লয়ে যাও ওহে হরি ঠিক সত্য রাজ্য।
আর না বহিতে পারি মিথ্যা সব কার্য্য॥
তুমি হে রাজ্যের রাজা নাম সত্যবান।
অসত্য তোমার রাজ্যে পায় নাক স্থান॥
আমার কল্পনা পক্ষ করিয়ে ধারণ।
উড়ে গিয়ে নানা স্থানে করয় ভ্রমণ॥
নানা প্রকার পাপ লয়ে আসে চঞ্চুপুটে।
লাভে মাত্র পাপ হল তার পক্ষ উঠে॥
মুক্ত কর শুদ্ধ কর সেই কল্পনাকে।
সে পথে যাইতে আর দিও নাক তাকে॥
কৃপা করে প্রভু এই কর আশীর্ব্বাদ।
উড়ে গিয়ে তব কাছে আনুক প্রসাদ॥
প্রসাদ পাইয়া যবে শুদ্ধ হবে মন।
পাইব তখন আমি সার সে সাধন॥
সাধিতে সাধিতে কেবল দেখিব সত্য!
তখন আর কি করিবে সংসার অনিত্য॥
ফেলে দেব হরি হে ধোঁয়া আর কুয়াশা।
আর না করিব আমি অন্ধকারে বাসা॥
পরিষ্কার হবে তবে মম হৃদাকাশ।
দূরে যাবে যত সব কল্পনা আভাস॥

ঠিক স্থানে বসে মম ভ্রম কেটে যাবে।
হায় কবে সেই দিন আমার হইবে॥
বুঝিতে পারিব এই ধ্যানভূমি বটে।
এত দিনে আসিয়াছি পিতার নিকটে॥
আশ্চর্য্য করুণা তোমার বলিব হে হরি।
তোমার নিকট আর কিবা ভিক্ষা করি॥

রচয়িত্রী শ্রী—

মৃত্যু।

গেলে কি আর আসে না, তবে যায় কেন? এই সাধের গৃহ সংসার, এত সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, সব ভুলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষ কোথায় চলিয়া যায়? আর কেন চলিয়া গেল? এমন কি কোন সময় আছে যখন মানুষের এ পৃথিবীর কিছু ভাল লাগে না, এমন কি একটা মুহূর্ত্ত আছে একটা দণ্ড, একটা পল আছে, যখন মানুষ বলে, "আর আমি এখানে থাকিব না?" এই যে মানুষ চলিতেছিল, কথা কহিতেছিল, সে মানুষ কোথায় গেল। আজ গহনার হুকুম গেল, জামা তৈয়ার হইয়া আসিল কিন্তু পরিবে কে? সকালে যে জীবিত ঘর উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছিল সন্ধ্যার সময় সে আর নাই রোগ শয্যায়ও নাই! রোগ হইল কয়েক ঘণ্টায় সাধের দেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণপাখী কোথায় চলিয়া গেল, দেহ ভস্মীভূত হইল গৃহ শূন্য হইল। আর সে আসিবে না আর তাহাকে দেখিব না। অল্প বয়সে সাধের সংসার সুখের সংসার "রূপের ডালি" দেহখানি ফেলিয়া সে চলিয়া গেল। ছেলেরা কাঁদিল মা বলিয়া, স্বামী ডাকিল নাম ধরিয়া কিন্তু কেহই ত আর তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। সব ভাঙ্গিল; শূন্য হইল. সন্ধ্যা হইতে না হইতে, সংসারের সাধ মিটিতে না মিটিতে কেন তবে সে চলিয়া গেল? তবে কি সে ইচ্ছা করিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্ত সেই দণ্ড পল কি তাহার আসিল, সে কি বলিল, "আর আমি এখানে থাকিব না।" সে কি এমন এক অপূর্ব্ব শোভাময় ধাম দেখিল যাহা দেখিয়া সংসারের সৌন্দর্য্য আর তাহার ভাল লাগিল না? কেহ কি এ পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা স্নেহভরে, মধুর স্বরে ডাকিল, সেই জন্য কি সব ফেলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিলম্ব না করিয়া তাহার প্রাণ ছুটিল। তবে সে নিশ্চয়ই সুখধামে, নিত্যধামে। তবে সে আছে ভাল। আর ত সে আসিতে চাহে না, আর ত দেখা দেয় না। নিশ্চয়ই এখানে কষ্টে ছিল।

জীবন-কুসুম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুঃখের সংবাদ।

চতুর্দ্দিকে ঘন বনরাজিবেষ্টিত প্রকাণ্ড পর্ব্বত। তাহার বিরাট পদপ্রান্তে পরম রমণীয় পবিত্রসলিলা ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বিনী ধীরে ধীরে বহিয়া সাগর সন্নিধানে চলিয়াছে, বিশাল মহাজলধির গভীর অতলস্পর্শ অনন্তবক্ষে নিজের ক্ষুদ্র প্রাণকে

মিশাইয়া বিলীন করিতে ছুটিয়াছে। মহোচ্চ ভীষণ পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তরময় বক্ষ হইতে সুশীতল করুণারূপিনী নির্ঝরিনীর প্রেমধারা অজস্রধারে নির্গত হইয়া, উত্তপ্ত ধরাপ্রাণকে শীতল করিয়া অবিরাম গতিতে বহিয়া যাইতেছে—এ দৃশ্য বড়ই মধুর বড়ই হৃদয়স্পর্শী। নানা বৃক্ষশ্রেণীশোভিত সেই পর্ব্বতমালার উপর এক পরম সুন্দর সুবৃহৎ দুর্গ বিরাজিত। দুর্গের অদূরে ঘন নীবিড় জঙ্গল। সেই দুর্গের অধিস্বামী একজন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত কাউণ্ট। তাঁহার গৃহের চারিদিকে সুন্দর সুশৃঙ্খলা, নানা প্রকারের সুন্দর ফল পুষ্পভরা বৃক্ষরাজি গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার সংসারে কেবলমাত্র ধর্ম্মপরায়ণা জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তাঁহাদের এই আদর্শ সুখী পরিবারে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদের নিঃসন্তান নিরানন্দময় ভবনে আনন্দের কুসুম ফুটিল। একটি পরম সুন্দর পবিত্র স্বর্গীয় পুষ্প তাঁহাদের গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতে আসিল, একটি সুন্দর ফুটন্ত ফুল দুর্গস্বামীর সুন্দর গৃহের সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিল। এই ক্ষুদ্র শিশুরত্নই তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র আনন্দ, প্রাণের আলোক ও নয়নের মণি। তাঁহাদের সকল আদর সকল যত্ন হৃদয়ের সমুদায় স্নেহ ভালবাসা সেই ক্ষুদ্র শিশু অধিকার করিল। তাহাকে তাঁহারা যথার্থই প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন।

ঈশ্বরের অপার করুণায় পরম সুখশান্তিতে দিন কাটিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ পরিষ্কার নির্ম্মল আকাশে ঘোর বিপদের মেঘ উঠিল, দুঃখের ঘন অন্ধকারে সুখের জীবনকে ঘেরিয়া ফেলিল। শিশুটি তখন ভালরূপে কথা বলিতে শিখে নাই, মধুর কণ্ঠে সুধামাখা মা, বাবা, বলিয়া ডাকিতে শিখে নাই; সেই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সদাশয় সম্ভ্রান্ত কাউণ্ট যুদ্ধে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে যে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, আত্মীয়, স্বজন, সুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই ভীষণ যুদ্ধানলে জীবনাহুতি দিবার জন্য এইরূপে কত শত শত জনকে নিদারুণ ভাবে বিদায় লইয়া গমন করিতে হইয়াছে তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? কাউণ্টের শোক-দুঃখপূর্ণ বিদায় কাহিনী নিতান্ত হৃদয়-বিদারক, বর্ণনার অতীত। তাঁহাকে বিদায় দান করিয়া কাউণ্ট-পত্নী একাকিনী সেই দুর্গে অতিশয় মনক্লেশে আঁধার প্রাণে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঐ শিশুই তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল হইল। নির্জ্জন, নিরানন্দময়, শূন্য, অন্ধকার গৃহবাসে ঐ স্নেহের পুতলী প্রিয়তম সন্তানই তাঁহার একমাত্র প্রাণের আলোক, জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইল। তিনি সন্তানের লালন পালন ও সুশিক্ষার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নবতী হইয়া সেই একই উদ্দেশ্যে

সমুদায় প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন, সেই একই কার্য্যে একই লক্ষ্যে সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিলেন, এবং নিতান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে সতৃষ্ণ অন্তরে স্বামীর প্রত্যাগমনের দিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। যে দিন তিনি ভগবানের কৃপায় প্রিয় সন্তানকে বক্ষে লইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইতে পারিবেন সেই সুখের দিন শুভ মূহুর্ত্তের প্রত্যাশায় আকুল প্রাণে অপেক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মাতা সন্তানকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন, নিকটে মার্গারেট নাম্নী আয়া দণ্ডায়মান আছে। তাহার হস্তে কয়েকটি সদ্যোজাত নব প্রস্ফুটিত পুষ্প লইয়া শিশুকে দেখাইয়া খেলা দিতেছে, শিশুও সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়া আনন্দে হাসিতেছে ও তাহার ক্ষুদ্র সুকোমল হস্ত প্রসারণ করিয়া ফুলগুলি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে; শিশুর এই সুমিষ্ট আমোদ দর্শনে মাতার বিষণ্ণ বদনে আনন্দের রেখা ফুটিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ একজন কর্ম্মচারী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; ঐ কর্ম্মচারী কাউণ্টের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিলেন যে তাঁহার প্রভু সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন এবং মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া আপনার সহিত একবার শেষ দেখা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই বজ্রতুল্য নিদারুণ সংবাদে কাউণ্ট-পত্নীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণপ্রায় হইল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে কম্পিত হস্তে শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলেন। কর্ম্মচারী তদীয় প্রভু-পত্নীর এতাদৃশ ভয় ও ব্যাকুলতা দর্শনে নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন তাঁহার প্রভুর পুনঃ আরোগ্য হইবার আশা আছে কিন্তু যদিও ইহা অনিশ্চিত, সেই জন্য এখন হইতে এক মূহুর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া দিন রাত অবিশ্রান্ত চলিলে তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। কাউণ্ট-পত্নী নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া সেই মূহুর্ত্তেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। সেই উত্তপ্ত অশ্রুবারি তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুর উপরে পড়িতে লাগিল। মাতা অতিশয় কাতর প্রাণে বলিতে লাগিলেন হায়! প্রিয়ধন অবোধ শিশু! তুমি এখন কিছুই জান না কিসের জন্য তোমার মা কাঁদিতেছেন, তুমি তোমার স্নেহময় পিতাকে চিনিবার পূর্ব্বেই হারাইতে বসিয়াছ, সংসারে আসিতে আসিতেই অকালে অমূল্য পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, এই সংসারারণ্যের মাঝে অভাগা পিতৃহীন অনাথ বালক হইতে চলিলে। আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইতেছে যে আমি এই সুদীর্ঘ কষ্টদায়ক পথের জন্য তোমাকে পিতার নিকটে লইয়া যাইতে পারিলাম না।

তখন তিনি আয়ার দিকে ফিরিয়া

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সকাতরে বলিলেন প্রিয় মার্গারেট! আমি তোমার কাছে আমার প্রাণের প্রিয়তম সন্তান অমূল্য রত্নকে সমর্পণ করিতেছি, আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন তোমার হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি। দেখিও তুমি ইহাকে কখনও এক মূহুর্ত্তের জন্যও তোমার কাছ ছাড়া করিও না, চক্ষের আড়ালে রাখিও না। এমন কি যখন শিশু নিদ্রিত থাকিবে তখনও ইহাকে একাকী রাখিয়া যাইও না। আমি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তুমি যেমন করিয়া তাহাকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা কর ঠিক সেই রূপ করিবে। প্রতি দিন ইহাকে উদ্যানে সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনার্থে লইয়া যাইবে, বিশেষতঃ প্রীতিকর রমণীয় প্রভাত কালে ইহাকে বাগানে লইয়া বেড়াইবে। তাহার নিকট ছোট ছোট সুমিষ্ট সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইবে। তাহার সহিত কথা কহিবে, সর্ব্বদা তাহাকে সুন্দর ফুল এবং অন্যান্য নানাবিধ সুন্দর সামগ্রী দেখাইয়া আনন্দে রাখিবে। অবোধ ক্ষুদ্র শিশুকে এমন কোনও জিনিষ হাতে লইতে দিবে না যাহা হাতে কিম্বা মুখে দিয়া তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। সর্ব্বোপরি এইটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিও তুমি কখনও কোনও রকমে ইহার অনিষ্ট করিবে না এবং ইহার শিশুকালের অসহায় অবস্থায় কোনও প্রকারে বিরক্ত অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হইও না। গৃহরক্ষক যাঁহার তত্ত্বাবধানে আমি আমার গৃহাদি সমর্পণ করিয়া যাইতেছি তিনি এই সকল নিয়ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে কি না তাহা আমাকে বলিবেন, আমার এই সকল কথা সম্যকভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কি না আমাকে জানাইবেন। প্রতিজ্ঞা কর কখনও আমার আদেশ প্রতিপালনে অমনযোগী হইবে না তাহা হইলে আমি অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আমি এখন হইতে দিন গণনা করিব যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসি। তখন যদি তুমি আমার সন্তানকে সম্পূর্ণ সুখী ও সুস্থ শরীরে প্রত্যর্পণ করিতে পার তোমাকে আমি যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব, গৃহে ফিরিবার সময় তোমার জন্য খুব সুন্দর কোনও সামগ্রী লইয়া আসিব।

মার্গারেট অকপট হৃদয়ে সমুদায় প্রতিজ্ঞা করিল। কাউণ্ট-পত্নী তখন প্রাণ ভরিয়া সন্তানের মুখচুম্বন করিলেন, হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন, স্বর্গীয় পিতার চরণে প্রিয় পুত্রকে বিশ্বাসের সহিত সমর্পণ করিলেন, সর্ব্বস্ব ধনকে স্বর্গের দেবতার হস্তে গচ্ছিত রাখিলেন। তার পর শিশুকে আয়ার কোলে অর্পণ করিয়া দ্রুতবেগে গাড়ীতে উঠিতে গেলেন। সেই সময়ে বাড়ীর ভিতরে সমুদয় দাস দাসীগণের উচ্চ ক্রন্দন শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল, বাহিরের আকাশেও ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর গর্জ্জনে প্রবলবেগে ঝড় বৃষ্টি

হইতেছিল। এই ভীষণ অন্ধকারময় ঘোর দুর্য্যোগপূর্ণ গভীর রজনীতে কাউণ্ট-পত্নী সকলের ক্রন্দন ধ্বনির মধ্য দিয়া বিদায় লইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

পত্র।

প্রিয় ভগিনি,

আমি অনেক দিন পরে তোমাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছি। রাগ কর নাই ত? কতবার ভাবি একবার গিয়া তোমাদের দেখিয়া আসি, আজ এই এক বৎসর হইল আমার সে ইচ্ছা ভাবেতেই বদ্ধ রহিল, কাজে আর সিদ্ধ হইল না। আনন্দবাজারের সময় কিন্তু যাবই যাব। তোমাদের সংসার হইলে কি করিবে জানি না, আমি কিন্তু সংসারকূপে ডুবিয়াছি কখনও যে বাহির হইব, এমন মনে হয় না। দিন রাত্রি অসার ভাবনায় সময় নষ্ট করি। কি যে পরিণামে হবে জানি না। তখন বেশ ছিল, পাঁচজনে সংসার চালাইত; নিজের এত ভাবনা, দায়িত্ব থাকিত না। ভাইদের কেমন স্নেহ ছিল! শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, জা, ননদে সংসার পূর্ণ থাকিত আর হিংসা দ্বেষও ছিল না। এখন ঠিক বিপরীত। কাহারও কথা সহ্য হয় না, অন্য পরিবার আসিয়া থাকিলে অসুবিধা হয়। কত যে পরিবর্ত্তন! কি করিব তবু সত্য কথাই বলিতেছি। সব সত্য। আমারই ঘরের কথা বলিতেছি আমার বড় জা এসেছেন তিনি মান্যে আমার চেয়ে বড় কিন্তু বয়সে অনেক ছোট, তবু তাঁকে দিদি বলি। ভাসুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ভাসুর সম্প্রতি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তাঁর বড় ইচ্ছা দিদি আমার কাছে, কলিকাতায় থাকিয়া "মেম" হয়েন। আমারও কত ইংরাজি শিক্ষা জান! ভাসুরের দুইটি মেয়ে ১০।১২ বৎসরের তাদের Convent এ দিয়াছি তবু তাদের সমস্ত পড়া শুনা বলিয়া দেওয়া, দেখা, শুনা এবং সাজ সজ্জা দেখা ইত্যাদিতে অস্থির হইয়াছি, আর পারি না। উপর-তলা ভাসুরকে ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার ছেলেদের বড় কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কৈ ভাসুরদের যাবার কথাও শুনি না! সেদিন বোসেদের বাড়ী বড় একটা পার্টি ছিল, ভাসুরের ইচ্ছা দিদি যান, আমি সকালে দিদির মাথা ঘষিয়া দিলাম, ঠিক সময়ে ম্যাক্সের তেল দিয়া চুল বাঁধিয়া দিলাম, আমার একখানা রেশমের কাপড় পরাইয়া দিয়া দেখিলাম বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। দিদির রঙ্ বেশ গৌরবর্ণ, চুলও ঘন ও লম্বা। তাঁকে সাজাইয়া আমি সাজিতে গেলাম। আসিয়া দেখি, দিদি সেই চুল বাঁধার উপর আবার আরও খানিকটা নারিকেল তেল দিয়া চুল খুব টানিয়া কপালের উপর আনিয়াছেন ও তাহার উপর প্রায় এক আঙ্গুল চওড়া সিঁদুর দিয়াছেন! আমি কিছু বলিলাম না। দুজনে

গাড়ী ও স্বামীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, দিদি সেই সুযোগে পান খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং চুন ও পানের জলের হাত কাপড়েই মুছিলেন। কাপড় খানি একেবারে নষ্ট হইল, আর বদল করিবার সময় নাই। এই সময় আমার স্বামী আসিয়া বলিলেন পার্টিতে যাবার সময় হইয়াছে। আমি বলিলাম, "দিদির কাপড়খানা বদলাতে হবে, চুন খয়েরের দাগ পড়েছে।" স্বামী দেখে আমাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খুব বকিলেন। কেন দিদিকে আমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাপড়, গহনা দিয়াছি, আর এত ভাল কাপড় আর আমি পাব না ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন আমার কাপড় ও জামা তাঁর ভাল লাগিল না, শেষে বলিলেন, "তোমরা যাও আমি যাব না।" আমি দেখিলাম আমারই দোষ, আমি ভাল বস্ত্র অলঙ্কার পরি নাই, তাহার উপর ভাল কাপড় নষ্ট করিলাম। সুতরাং রাগটা অধিক হইল। আমি কত খোষামোদ করিলাম; তিনি শেষে বলিলেন, "যাব, কিন্তু বৌদিদির সঙ্গে যাব না।" আমি দিদিকে যাব না, বলিতে যাব এমন সময় ভাসুরের গলা পাইয়া আর ঘরে গেলাম না। শুনিলাম ভাসুর (দিদির সৌন্দর্য্যে) মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কি সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে বড় লাট সাহেবের বাড়ী নিয়ে যাই। ছোট বৌ ত তোমাকে খুব তৈয়ার করেছে।" শুনে এসে স্বামীকে বলিবামাত্র তিনি দৌড়িয়া গিয়া দাদাকে বলিয়া আসিলেন, "তুমি বৌদিদিকে লইয়া পার্টিতে যাও, আমার একটু অসুখ কর্‌ছে যাব না।" ভাসুর অমনই সুবিধা পাইয়া বলিলেন, "আমিও ভাবছি একবার গড়ের মাঠে বেড়াতে যাই, পার্টিতে আর যাব না।" সস্ত্রীক ভাসুর বেড়াতে গেলেন, আমার স্বামী মহাশয় সস্ত্রীক বাড়ীতে রহিলেন। এখনকার এই মিল। আর আমাদেরও আর ইংরাজি বাঙ্গালা মিল খায় না। বেশী ব্যয় হয়, আয় কম, স্নেহের অভাব। আমার ইচ্ছা হয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি কিসে এখন ভালরূপে সংসার চলে।

"সাধনা।"

সাধন করিলে সর্ব্ববিষয়েতেই সিদ্ধি-লাভ করা যায়। ভগবান আমাদের হৃদয়ে এমন একটী প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন যদ্দ্বারা সাধন করিয়া সর্ব্বকার্য্যে আমরা সিদ্ধ হইতে সক্ষম হই। মহাত্মা মহাপুরুষেরা এই সাধন দ্বারা কত শত মহত্তর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় স্বীয় পুণ্য কীর্ত্তি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয় জয় প্রভৃতি ষড় রিপুকে নির্জ্জিত করা এ সকলই সাধন বলে পরাজিত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি একজন খুব রাগী ছিলেন, কেবল এই মহাসাধন বলে সেই প্রবল ক্রোধ-রিপুকে জয় করিয়া পৃথিবীতে কোমল অতিশয় শান্ত প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। আমরা সহজেই দেখিতে পাই কোন একটা সামান্য

বিষয়ে যদি করিবই মনে করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কার্য্য সমাধা করিয়া উঠি। কলম্বস গারফিল্ড প্রভৃতি সকল মহজ্জনগণ যদি তাদৃশ অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেন তাহা হইলে আজিও কি তাঁহাদের নাম জগতে ঘোষিত থাকিত? বিজ্ঞানের যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কত পরিশ্রম কত সাধন করিয়া তবে এ সকল কত বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিতেরা বাহির করিয়া আমাদের সেই সুফল প্রদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ভগবানের জ্ঞান ভাণ্ডারের এই সকল তত্ত্ব কে আলোচনা করিতে পারে তিনি জ্ঞান না দিলে? অবশ্য তিনিই মানব হৃদয়ে তাঁহার সেই অনন্ত জ্ঞানের কণা রাখিয়া দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্ভোগ করি। জ্যোতির্ব্বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানই যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বা আজিও করিতেছেন কত পরিশ্রম কত প্রাণের আকাঙ্খা কত অমিত সাহস বল বীর্য্য ও সাধন ক্ষমতায় সাধিত হইয়াছে হইতেছে তাহা সেই সকল বস্তুর সঙ্গে সেই মহাত্মাদিগের মহজ্জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম সাধন বিনা, শ্রম বিনা, প্রাণগত চেষ্টা যত্ন বিনা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। অবলা নারীও সাধ্য মত চেষ্টা যত্ন করিলে সে অধ্যবসায় ভগবান নিশ্চয়ই সফল করেন। সকল সাধু ও সৎ কার্য্যের পুরস্কার তিনিই আনিয়া দেন। অতএব আমরা যেন সৎ কর্ম্মে কখনও শ্রান্ত না হই।

বিমলার জীবন-কাহিনী।

জীবনী লিখিতে বা গল্প লিখিতে হইলে কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ইহা ভাবিতেই অনেক সময় লাগে। আমি কিন্তু আমার মধ্যজীবন হইতেই তোমাদের নিকট বলি। আমার পূর্ব্বজীবনে বিশেষ তেমন কিছু ঘটনা ঘটে নাই, যেমন সকল জীবন হয় সেই রূপই হইয়াছিল।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা; বালিকা-বয়স হইতে কঠোর বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে হইয়াছে। সংসারে যাহাকে "আপনার লোক" বলে তাহা আমার কেহ নাই সত্য, কিন্তু গ্রামের পাড়া প্রতিবেশীগণ সকলে আমাকে তাহাদের অতি আপনার করিয়াছিল। গ্রামের ছোট বড় সকলেই আমায় "বিমলা পিসি" বলিয়া ডাকিত। সুখের দিনে, বিবাহোৎসবে, গৃহ অনুষ্ঠানে "বিমলা পিসি" না হইলে কার্য্য যেন সুসম্পন্ন হইত না; দুঃখ রোগ শোকেও সকলে আমায় চাহিত। আমার আপনাকে একা ভাবিবার সময়ও হইত না। নিজের জীবনের দুঃখ শোক আমার ভাবিবার অবকাশও ছিল না, আর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অতি অল্প

বয়সেই ঘটিয়াছিল, অতএব তাহার তীব্রতা ও আঘাত আমায় অভিভূত করিতে পারে নাই। আমি একটি পরিবারের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি পরিবার পাইয়াছি, দুই চারিজন আত্মীয়ের পরিবর্ত্তে বহু আত্মীয় লাভ করিয়াছি। এই ভাবে আমার ক্ষুদ্র জীবনটি বেশ সুখ-সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রে আমি একা ঘরে বসিয়া আছি, হঠাৎ বাহিরের দরজায় কে যেন আঘাত করিতে লাগিল। সে রাত্রে বড় দুর্য্যোগ, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। পাঠিকাগণ হয় ত মনে করিবেন আমি না জানিয়া কেন এত রাত্রে দরজা খুলিলাম, কিন্তু ভাই পাঠিকা, তুমি যদি আজন্মকাল পাড়াগাঁয়ে আমার মত অবস্থায় বাস করিতে, যদি জানিতে সে গ্রামে তোমার আত্মীয় ভিন্ন আর কেহ নাই, তবে আর মনে সন্দেহ আসিত না। ইহা ব্যতীত দরিদ্র ঘর তস্করের প্রবেশ সম্ভব নহে। আমি দরজা খুলিয়া দিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সমুদায় অঙ্গ একখানি বৃহৎ চাদরে আবৃত। পুনরায় আমায় দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া ভিতরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমিও একটু অবাক হইয়া তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম। তখন সে তাহার আবরণ মুখ হইতে সরাইল। দেখিলাম এ আমার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত। রমণীর বয়স ২৫।৩০ বৎসর হইবে। তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, চাতুরীপূর্ণ ভাব আমার যেন কিছুই ভাল লাগিল না। আমার বিশ্বাস ছিল সে গ্রামের সকলকেই আমি চিনি কিন্তু ইহাকে ত কখনও দেখি নাই। আমি অবাক হইয়া তাহার দিকে অনেকক্ষণ দেখিতেছি, সে কিছুক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, "আমাকে দেখিয়া আপনি বোধহয় খুব আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আমাকে আপনি চেনেন না কিন্তু আপনার নাম ও আপনার স্নেহ দয়ার কথা কাহারও নিকট অবিদিত নাই। আজ আমি একটি বিশেষ দরকারে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার সঙ্গে আপনার যাইতে হইবে। আমার এক বৃদ্ধা ঠাকুরমা আছেন, তিনি অত্যন্ত পীড়িতা, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন। আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে আমার উপর অত্যন্ত রাগ করিবেন।" আমি তাহার কথা কত সত্য, কত মিথ্যা কিছু বুঝিতে পারিলাম না, আর এই অন্ধকার রাত্রে একা একজন অজানিত লোকের সঙ্গে যাওয়াও সঙ্গত মনে হইল না। আমি বলিলাম, "তোমার উপকার কি সাহায্য করিতে পারিলে খুব সুখী হইতাম; কিন্তু এত রাত্রে এরূপ দুর্য্যোগে যাইতে সাহস হয় না। তার পর তোমাকেও আমি চিনি না। আমি যাইতে পারিব না।" এ কথা শুনিবামাত্র সে একেবারে আমার দুটি পা ধরিয়া মহা অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল। "আমি না যাইলে সে মহা বিপদে পড়িবে। তাহার ঠাকুরমা তাহাকে অব-

শ্যাই তাড়াইয়া দিবে; তাহার ঠাকুরমা অত্যন্ত কঠোর নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তাহার কথা ঠেলিতে পারিলাম না। তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলাম। ইহাতে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি আমার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলাম। আমি বাহিরে আসিয়া দেখি আমার গৃহের সম্মুখে একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। উক্ত রমণী তখন আমাকে আর কোন কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া একেবারে হাত ধরিয়া আমায় গাড়ীতে উঠাইল। উঠিবামাত্র যেন কলে গাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ হইয়া গেল! বাহিরের কিছুই আর দেখা গেল না। কেবল বৃষ্টির শব্দ আর ঘোড়ার পায়ের খট্ খট্ শব্দ। আমার এ সকল দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ কৌতুহল স্বভাব আরও একটু মাত্রায় বাড়িয়া গেল। তখন ভয়ের অপেক্ষা এই রহস্য ভেদ করিবার বাঞ্ছা বেশী হইল। গাড়ী ক্রমাগতই চলিতে লাগিল, আমার সহযাত্রী নীরব নিস্পন্দ। গাড়ীতে যে অন্য কেহ আছে তাহাও যেন জানা যাইতেছিল না। কেবল সেই অন্ধকার মধ্যে একটি শ্বেতবসনাবৃত এক পদার্থ, ইহা ব্যতীত আকার গঠন কিছুই বোঝা গেল না।

কোন্ পথ দিয়া কোন্ রাস্তা দিয়া যে গাড়ী যাইতেছিল তাহা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা এই ভাবে আসিয়া একটি স্থানে গাড়ী থামিল, থামিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল; সেই রমণী অবতরণ করিল ও আমাকে নামিতে বলিল। কেবল একটি গলি বা অত্যন্ত সরু রাস্তা বুঝিলাম, যে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম তাহা দেওয়াল, কি বাড়ী বোঝা গেল না। দরজা, জানালা কিছুই নাই, এক অতি উচ্চ দেওয়ালের ন্যায় মনে হইল। এমন সময় এক পার্শ্বে একটি দরজা খুলিয়া গেল। আমি ও আমার সঙ্গিনী তার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম এক বৃদ্ধ একটি প্রদীপ হস্তে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধের আকার প্রকার যেন যমদূতের ন্যায়। রুক্ষ কেশ, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, পরিচ্ছদও কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু দুটি জবা ফুলের ন্যায়, মুখের ভাব অতি নিষ্ঠুর! অন্ধকার অজানিত স্থানে হঠাৎ এরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। সমুদায় অঙ্গ যেন শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি রমণীর একমাত্র উপায় অবগুণ্ঠন বা ঘোম্‌টা তাহারই আশ্রয় লইলাম। কিন্তু এখানে আমার ভয়ের কোন কারণ অন্ততঃ তখন ছিল না, কেন না বৃদ্ধ নীরবে যেমন দরজা খুলিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ নীরবেই সে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তখন আমি আবার আমার সঙ্গিনীর পদ অনুসরণ করিলাম। কতগুলি ছোট ছোট ঘর ছোট ছোট দালান পার হইয়া অবশেষে একটি সরু সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় বাড়ীতে

কোথাও একটি জানালা বা গবাক্ষ কিছুই নাই; আর আলোকের চিহ্নও নাই। আমি আন্দাজ করিয়া কেবল চলিতে লাগিলাম। কেবল সিঁড়ির কাছে উপর হইতে যেন একটু আলোকের আভা দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বোধ হয় ত্রিতল গৃহে উপস্থিত হইলাম, কেন না খুব উঁচু মনে হইতে লাগিল। এক দিকের একটি দরজা খুলিয়া উক্ত রমণী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, আমাকেও ডাকিল। এতক্ষণ আমরা কেহই একটি বাক্যও উচ্চারণ করি নাই। আমার ত ভয়-ভাবনা-কৌতুহল মিশ্রিত কত রকম ভাবনায় মনটা অস্থির হইতেছিল; কথা যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে ঘরে আমরা প্রবেশ করিলাম দেখিলাম ঘরটি অতি প্রশস্ত; বেশ সুন্দর মহামূল্যের জিনিষ; কিন্তু বাড়ীর বহির্ভাগের মত এ ঘরেরও জানালা নাই। ছাদের উপর দিকে একটি গবাক্ষের মত ছিল। আমার মনে হইল ইহারা অবশ্য গুপ্ত ভাবে বাস করিতে চায়, জানালা দরজা বহির্দ্দিকে থাকিলে ঘরের আলোক রাস্তার লোকে দেখিতে পাইবে। তাহাই বোধ হয় এরূপ ভাবে বাড়ীটি নির্ম্মিত।

আমাকে এই ঘরে বসিতে বলিয়া আমার সঙ্গিনী চলিয়া গিয়াছে, তাহাই আমি বেশ মনযোগের সহিত সব দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া দাঁড়াইলাম। ফিরিয়া দেখি এক জীর্ণ শীর্ণ অতি বৃদ্ধা রমণী আমার দিকে আসিতেছে। এ বাড়ীর কি সকলই অদ্ভুত! এরূপ রমণীও ত কখনও দেখি নাই। বৃদ্ধার শুক্ল বেশ, একটিও দন্ত নাই, কেমন এক অসাত্ত্বিক অমানুষিক চেহারা, যেন কেবল পাপ কার্য্যে তাহার সমুদায় জীবন কাটিয়াছে। আমার যেন তাহাকে দেখিয়া কেমন হইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধার চক্ষু দুটি অতি তীক্ষ্ণ, অতি তীব্র। আমার দিকে এমন ভাবে দেখিতে লাগিল যেন সেই দৃষ্টিতে আমার অন্তরের সকল ভাব জানিয়া লইল। আমি আর কি করিব চুপ করিয়া তাহাকে আমার পরীক্ষা করিবার অবসর দিলাম। তার পর বৃদ্ধা কি বুঝিল জানি না সন্তুষ্ট ভাবে কাছে আসিয়া বসিল। বসিয়াই খুব কাশিতে লাগিল, তাহার কষ্ট দেখিয়া আমি আর সব ভুলিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে বলিলাম, "কিছু ঔষধ দিব কি? আপনার বড় কষ্ট হইতেছে।" সে আমায় হাত নাড়িয়া সরাইয়া দিল; কিছুক্ষণ পরে একটু যখন সুস্থির হইল বলিল, "না আমার কিছু করিতে হইবে না। আমি জানি আমার আর বেশী দিন নাই। শীঘ্রই আমি মরিব। কিন্তু আমায় দেখিবার জন্য আজ তোমায় ডাকি নাই। আমার একটি কাজ, একটি উপকার করিতে হইবে।" আমি অবাক হইয়া রহিলাম। তবে কি ছলনা করিয়া ইহারা আমায় লইয়া আসিয়াছে? কিন্তু এখানে কিছু বলা আমার বৃথা।

একা স্ত্রীলোক, অজানিত অপরিচিতের মাঝে কি বলিব, কি করিব? আমি চুপ করিয়া কেবল শুনিতে লাগিলাম। তখন সে আবার বলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কাশির জন্য চুপ করিতে হইল; এই ভাবে যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে আমি বলিতেছি:—

"তোমার নাম আমি অনেক দিন শুনিয়াছি। আমি পৃথিবীতে অনেক দিন আসিয়াছি; অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু আমার জীবনের কথা বলিবার জন্য তোমায় ডাকি নাই। আমি মরিয়া গেলে কিছু হইবে না; সংসারে আমার একটি বন্ধন আছে তাহারই জন্য আমি তোমায় এখানে ডাকিয়াছি। আমার সঙ্গে এস।" ইহার মধ্যে আরও কি গুঢ় রহস্য আছে জানিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সেই ঘরের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ঘর, তাহার এক দিকে একখানি ছোট পালঙ্কের উপর শায়িত একটি স্বর্গের শিশু। শিশুর সুন্দর মুখখানি প্রস্ফুটিত কুসুমের মত হাসিতেছে। চারিদিকে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি মুখখানি বেষ্টন করিয়া আছে। মনে হইল স্বর্গের কোন দেব-শিশু বুঝি ভুলিয়া এখানে আসিয়াছে। বৃদ্ধা এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ সেই সুন্দর নিদ্রিত শিশুর দিকে চাহিয়া অবশেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, চাহিয়া দেখিলাম সেই সৌন্দর্য্যবিহীন মুখেও স্নেহের ভাব আসিয়া একটি কোমল ভাব আনিয়াছে। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম। পরে বৃদ্ধা চক্ষু মুছিয়া আমায় বলিল, "দেখ, আমিও একদিন ঐরূপ নির্দ্দোষ শিশু ছিলাম, কিন্তু পৃথিবীর পাপ-কলঙ্কে পড়িয়া আমার জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। আমার তাই বড় ইচ্ছা এই পাপ সংসর্গে এ শিশুকে রাখিব না। আমার একমাত্র কন্যা এই শিশুটিকে রাখিয়া পরলোক চলিয়া গিয়াছে। তোমাকে ইহার ভার লইতে হইবে। আজ বাড়ীর পুরুষেরা সকলেই ডাকাতি করিতে বাহির হইয়াছে, আমি সেই সাহসে তোমায় ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। তুমি বিলম্ব করিও না শীঘ্র ইহাকে লইয়া যাও, তোমার কোন অভাব থাকিবে না। এই লও তোমার পুরস্কার।" এই বলিয়া এক তোড়া স্বর্ণ-মুদ্রা আমার হাতে দিতে আসিল। কিন্তু আমি তাহা স্পর্শ করিতে পারিলাম না। কোন্ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়া এ ধন অপহৃত হইয়াছে কে জানে? আমি বলিলাম, "টাকা আমি চাহি না। আপনি এ পাপ পুরীতে কেন থাকিবেন, আমার সঙ্গে উভয়েই আসুন।" ইহাতে বৃদ্ধা একটু হাসিয়া বলিল, "আমার মুক্তির আর উপায় নাই, এখন বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি ইহাকে লইয়া যাও ভগবান তোমাকে ইহার জন্য পুরস্কৃত করিবেন।" আমি আর কি বলিব, ভাবিলাম ইহার ভিতরে অবশ্য ভগবানের কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে। আমার

ক্ষুদ্র জীবন দিয়া যদি এ শিশু-জীবনটি সৎপথে ধর্ম্মপথে যায় আমি কেন তাহাতে প্রতিবন্ধক হইব? বৃদ্ধা সজল নয়নে, মনের আবেগ চাপিয়া শিশুটিকে গরম শালে জড়াইয়া আনিয়া আমার হাতে দিল, একবার প্রাণ ভরিয়া তাহার সুন্দর মুখ চুম্বন করিল, কষ্টে বৃদ্ধার মুখ পাংশু-বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার প্রাণও ব্যথিত হইতে লাগিল দেখিলাম বিষাদে, দুঃখে তাহার মুখ মলিন, প্রায় বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছে। আমায় শিশুকে দিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "এখন যাও, বাড়ীর লোকেরা ফিরিয়া আসিলে বড় মস্কিল হইবে। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। দেখিও, আমার প্রাণের রত্নটিকে যত্ন করিও, সকল পাপ কুটিলতা হইতে রক্ষা করিও।" আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম। বৃদ্ধা আমাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া সেই পূর্ব্বকার গাড়ীতে উঠাইয়া চলিয়া গেল। আমার সেই পূর্ব্বসঙ্গিনীকে আর দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী আবার আমার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সকলই যেন স্বপ্নতুল্য মনে হইতে লাগিল। কেবল ক্রোড়ের শিশুটি এই ঘটনার যথার্থত্ব প্রমান করিতেছে।

* * * *

উক্ত ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। সেই শিশুটি আজ একাদশ বর্ষীয়া বালিকা। তাহার নাম রাখিয়াছি "প্রতিমা"—সে রূপে গুণে জীবন্ত প্রতিমা, আমার জীবনের ধন, চক্ষের মণি। প্রতিমার সুন্দর মধুর স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ, সকলেই আকৃষ্ট।

এত বৎসর পরে একদিন খবরের কাগজে দেখিলাম, এক দল ডাকাত সেই গ্রামের অদূরে এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। বহু বৎসর ধরিয়া ইহারা এইরূপে অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু কেহ এতদিন ধরিতে পারে নাই। তখন হঠাৎ আমার মনে হইল হয় ত ইহারাই আমার প্রতিমার আত্মীয়! ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠিল। প্রতিমার পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস সে কোন দিন জানিল না। আমারই সন্তান ইহাই তার ধারণা ছিল। তাহাকে পাইয়া আমার জীবন আজ সুখময়, শান্তিময়। এই সুখের মধ্যে এক একবার প্রতিমার মাতামহীর কথা মনে পড়ে; এক একবার সেই গভীর রাত্রের কথা মনে পড়ে; কিন্তু প্রতিমার হাসিমাখা মুখখানি যখনই দেখি সব ভুলিয়া যাই।

সুন্দর জীবন কাহাকে বলে?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহত্ত্বের যথার্থ স্থান সেবা বা কর্ম্মে। বিদ্যা, বল, বুদ্ধি দ্বারা আমাদের জীবন বোঝা যায় না, কিন্তু জীবন লইয়া আমরা কি করি তদ্দ্বারাই জীবনের পরীক্ষা।

এই কয়েকটি কথার মধ্যে অতি উচ্চ-

তম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়;—যথা, "সেই ব্যক্তিই মহৎ হৃদয়, যিনি প্রেমে জগৎ প্লাবিত করেন। তিনিই যথার্থ উচ্চ মন যিনি উচ্চ চিন্তায় জগৎকে জাগ্রৎ রাখেন। তাঁহারই ইচ্ছা শক্তি প্রবল যিনি পৃথিবীকে উচ্চ ব্রতের জন্য গঠিত করিতে পারেন। এবং তিনিই সর্ব্বোচ্চ যিনি এই সকল কার্য্যগুলি করিতে পারিয়াছেন এবং ভালরূপে করিয়াছেন।"

আমাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সমুদায়ই বিশ্বজগতের নিকটে দেয়।

St. Paul বলিয়াছিলেন তিনি সভ্য, অসভ্য, জ্ঞানী, মূর্খ সকলের নিকটেই ঋণী। সে ঋণ কেবল প্রেমের ঋণ। এই ঋণেই তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন কেবল প্রেমঋণ ব্যতীত কাহারও নিকটে ঋণী হইও না, প্রেমের ঋণ কখনও পরিশোধ সম্ভব নহে। আজ হয়ত তুমি সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তার পর দিন দেখিবে সে ঋণ-ভার তেমনি রহিয়াছে। এ ঋণে প্রতি জনেই প্রতি জনের নিকটে ঋণী। ইহা কেবল কতকগুলি ভাবের কথায় বা মনের কল্পনায় পরিশোধ করা যায় না। কেবল বক্তৃতা দ্বারা বা অর্থ দান করিয়া এ ঋণ শোধ হয় না। কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করিতে মহাত্মাগণ আপনার সমুদায় দিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই, শেষে আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

প্রেমের দাবী বড় কঠিন। আমাদের নিজেদের জীবন বাঁচাইয়া আমরা কখনও জগতের নিকট প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমাদের ঋণ সকলের নিকটে। বিনম্র প্রকৃতি, সাধু লোকের নিকট এ ঋণ ভাবিতে কোন কষ্ট নাই; কিন্তু যেখানে নিষ্ঠুর প্রকৃতি, নির্দ্দয় ব্যবহার, অভদ্র আচার, সে সব স্থানেই ঋণের ভার গুরুতর হইয়া উঠে, কোন রকমে দূর হইতে তাদের প্রতি একটু কৃপা কটাক্ষ দান করিয়া আমরা মনে করিতে পারি ইহাতেই আমাদের কর্ত্তব্য সাধন হইল। কিন্তু তাহা নহে, তাহাদেরও যথার্থ প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে হইবে। হয়ত তাহাদের নিকটে আমাদের ঋণ অধিকতর, কারণ তাহারা আমাদের নিকট হইতে আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যাশা করে। প্রত্যেকের নিকটেই আমরা প্রেমঋণে ঋণী এবং প্রেম সর্ব্বদা সেবায় নিযুক্ত। প্রেম কখনও কিছু চায় না। প্রেম কেবল কাহাকে কি দিতে হবে তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে এরূপ আছেন যাঁহারা বন্ধু অন্বেষণ করেন যে তদ্বারা তাঁদের উপকার হবে। কিন্তু সে বন্ধুত্ব যথার্থ বন্ধুত্ব নহে। যথার্থ প্রেম কেবল সেবা করিতে চায়। সেই ভাবেই সেণ্ট পল্ বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক লোকের নিকটেই তিনি ঋণী। কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তাঁহার প্রাণ তখনই তার দিকে আকৃষ্ট হইত এবং তার সেবা করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত।

এই ভাবেই প্রত্যেক মানবের নিকটে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন হওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটেই আমাদের কিছু না কিছু দিবার আছে। নিম্নে সেই ভাবের একটি পদ্য উদ্ধৃত হইল।

May every soul that touches mine—
Be it the slightest contact—get there-
from some good,
Some little grace, one kindly thought,
One inspiration yet unfelt, one bit of
courage
For the darkening sky, one gleam of
faith
To brave the thickening ills of life,
One glimpse of brighter skies beyond
the gathering mists
To make this life worth while,
And heaven a surer heritage.

ক্রোধ।

ক্রোধ বড় ভয়ানক রিপু। এ রিপুর যে জীবন অধীন, এ পৃথিবীতে তাহার বড় কষ্ট। ক্রোধ সকল সদ্‌গুণ গ্রাস করিয়া ফেলে। নারী-জীবন একেবারে ক্রোধশূন্য হওয়া উচিত। নারীর কেবল এক বিষয় রাগ থাকা উচিত সে কেবল "দুর্নীতি।" নতুবা স্ত্রীলোকের জীবনে ক্রোধকে স্থান দেওয়া মহা অন্যায়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ নম্রশীলা, ধীরা, যদি কিছুমাত্রও রাগের ভাব প্রবেশ করে হৃদয় উত্তেজিত হইবেই হইবে। নারীস্বভাব উগ্র হইলে তাহাকে পুরুষ-প্রকৃতির স্ত্রীলোক বলিয়া লোকে অখ্যাতি করে। নারী-প্রকৃতি মিষ্টভাষী হইবে, সে প্রকৃতিতে যদি ক্রোধ স্থান পায় তবে সে নারী আর মিষ্ট কথা বলিতে পারে না। যে নারী মাতা হইয়াছে, সে নারীর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত সন্তানেরা যেন কখনও তাহার সে দুর্ব্বলতা না দেখে। যে নারী ক্রোধকে বশ করিয়াছে সে নারী ধন্য। গৃহিণীর হৃদয়ে রাগ বাস করিলে গৃহে সদাই অশান্তি। স্ত্রীর রাগের জন্য স্বামী অসুখী, সন্তান অসুখী, দাস দাসী অসুখী। রাগীর অনেক দোষ। রাগী পুরুষের জীবনই কত কঠোর মনে হয়, আর স্ত্রীলোকের এ দোষ থাকিলে ত কথাই নাই। স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না সে যদি ক্রোধ পরবশ হইয়া সংসারে বাস করে। স্বামী, স্ত্রীর রাগের জন্য কত সময় গৃহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্ত্রীর জন্য স্বামীর জীবন অশান্তিতে অন্ধকার হয়। ক্রোধে যত মিষ্ট কথা নীরস হয়, পাড়া প্রতিবাসী কোন্দলের জন্য সদা ভয়ে ভয়ে থাকে, লোকের কাছে সেই ক্রোধপরায়ণা নারী এক উপহাসাস্পদ দ্রব্যের মত হয়। সকল গৃহিণীর প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত ক্রোধকে বশীভূত রাখিতে। ক্রোধকে জয় করা অর্থাৎ জীবনকে সরস করা। জীবনকে সরস করিতে হইলে সকল প্রকার কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিতে হয়। একটি নারী জীবন একটি গৃহিণী ভাল হইলে একটি সংসার ভাল হয়, একটি পরিবার সুন্দর হয়। আমরা নারী, বলিলেই হইবে না, "আমাদের এ পৃথিবীতে কোন কাজ নাই।" আমা-

দের এ পৃথিবীতে অনেক কাজ। আমাদের জীবন বিনয়ী, সরস, কোমল লজ্জাশীলা, মিষ্টভাষী প্রভৃতি কোমল ভাবে পূর্ণ থাকিবে। সংসারের দায়ীত্ব ভীষণ দায়ীত্ব; এ দায়ীত্ব যাহারা বুঝিয়াছে তাহারা সকল প্রকার কঠোরতা, ক্রোধ প্রভৃতি পাপ, অন্যায়কে প্রথমে বিনাশ করিয়াছে। নিজের জীবন সরস ফুলের মত হইলে, সকলকে সুগন্ধ দিধেই দিবে; নিজ জীবন সুশীতল সমীরণ তুল্য হইলে অন্যকে শীতল করিবেই করিবে। এ সংসারে গৃহিণীর জীবন সুন্দর সরল সৌন্দর্য্যময় হইলে নিশ্চয়ই সংসারও সুখময় হয়।

বেশী কিছু নয়।

শুধু দুটি মিষ্ট কথা, শুধু এক বিন্দু স্নেহ, দুঃখের সময় শুধু এক ফোঁটা চোখের জল, আর কিছু নয়। সংসার! এইটুকু দিতেও কি তোমার এত কৃপণতা? তোমার কাছে বেশী কিছু ত চাহিতেছি না? তবে এত ভয় কেন? কেহ অযাচিত স্নেহ সুখ পাইতেছে আর কেহ এক কণা মাত্র পাইবার আশায় ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহার দিকে একবার তাকাইতেও কি এত কষ্ট? সংসারের এ কৃপণতা দেখিলে দুঃখ হয় আবার দুঃখের মধ্যে হাসিও পায়। কাহারও ভাগ্যে এত স্নেহ ঐশ্বর্য্য, আর কাহারও ভাগ্যে সামান্য এক বিন্দুও দুর্ল্লভ! এ পক্ষপাতিতা কেন? প্রকৃতির এ রহস্য কে বুঝিবে? অনেক সময় ইহার একটী মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অবশেষে এ মহা রহস্য-সাগরে পড়িয়া শেষে নিজেই হাবুডুবু খাইতে হয়। তাহাকে পরাজয় করিতে গিয়া নিজেই পরাস্ত হই। অবশেষে মনস্তুষ্টি সাধনের একমাত্র উপায় "অদৃষ্ট দেবীর" দোহাই দিয়া কোনরূপে মনকে প্রবোধ দিই। পাঠিকা, তোমরা কি মনে মনে হাসিতেছ? কিন্তু তোমাদের মধ্যে এরূপ ভাব কি কখনও হয় না?

মনে কি হয় না যে সংসার এক এক সময় এত পক্ষপাতী হয় কেন? সংসারের মায়া বুঝিব কেমন করিয়া? মানব তরাইবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা অদৃষ্টের অন্তরালে লুকাইয়া কত ভাবে কত রূপে জীবনের সঙ্গে খেলা করিতেছেন তাহা কে বুঝিবে? কাহাকেও সুখ সম্পদের ভিতর দিয়া, কাহাকেও বা দুঃখ বিপদের মধ্য দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। তবে আর দুঃখ অভিমান করি কাহার কাছে? অভিমান অভিমানে মিলাইয়া যায়, দুঃখ দুঃখেই বিলীন হইয়া যায়; থাকে কেবল আমার ক্ষুদ্র আমি—তাহাও আবার এক একবার বিলোপ হইবার উপক্রম হয়!!

প্রতীক্ষা।

আমি একদিন লণ্ডন হইতে কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিতেছিলাম। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাক্স পত্র নামাইবার চেষ্টায় আছি এমন সময় দেখি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মহিলা অতি ব্যগ্রভাবে আমার দিকে আসিতেছে, একবার মাত্র আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আবার ত্রস্তভাবে কাহার অন্বেষণে সমুদায় রেল গাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিতে লাগিল। পরিশেষে একটু বিষণ্ণভাবে হাসিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে বলিল, "এ গাড়ীতে আসেন নাই, বোধহয় পরের গাড়ীতে আসিবেন।" এই বলিয়া অদূরে এক খানি বেঞ্চেতে বসিল। সে মহিলাটির সেই শান্ত অথচ ব্যগ্রদৃষ্টি, নিরাশা-আশা মিশ্রিত হাসি, আমার অন্তরে কি এক ভাব উদ্দীপন করিল। এই ঘটনার পরে যতবার আমি ঐ ষ্টেসনে যাইতাম ততবারই সেই অদ্ভুত রমণীকে দেখিতাম। কাহার অন্বেষণে আসিত আর তাহাকে না পাইয়া বলিত, "আজও আসেন নাই, পরে আসিবেন।" ঐ একই কথা শুনিতাম; এক এক সময় তার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ষ্টেসন মাষ্টারের চক্ষে জল আসিতে দেখিতাম। অবশেষে ষ্টেসন-মাষ্টারকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন শুনিলাম, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত মহিলা তাহার স্বামীকে কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া আহার প্রস্তুত করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু জীবন্ত স্বামীর পরিবর্ত্তে তাঁহার মৃত দেহ গৃহে প্রত্যাগমন করে। পথে অকস্মাৎ অপঘাতে মৃত্যু হয়। সেই নিদারুণ আঘাতে দুঃখিনীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কেরও দোষ ঘটে। আজ দশ বৎসর প্রতিদিন ট্রেণ আসিবার সময় সে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করে। আর প্রতি দিনই নিরাশ হইয়া আবার পরদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। এই প্রতীক্ষায় এত বৎসর চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। কিন্তু যাহার অন্বেষণে আসে সে ত আর ফিরিল না! একদিন ষ্টেসনে যাইলাম কিন্তু সে দিন আর সে অপরিচিত-পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম না। ইহার কারণ আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না! বুঝিলাম এত দিনে স্বামীর সঙ্গে মিলন হইয়াছে। চিরদিনের প্রতীক্ষার ফল পাইয়াছে। সে আর ফিরিবে না আর তার প্রতীক্ষা করিতে হইবে না!

সংসারে যোগ।

(প্রেম-কুসুম হইতে উদ্ধৃত)

হে প্রেমস্বরূপ, মোরা কভু না মরিব।
ঘর ছাড়ি কেন তবে শ্মশানে যাইব॥
নাহিক বিনাশ মোর অবিনাশ আমি।
ভগ্ন দেহ গেহ ফেলি হব স্বর্গগামী॥
দয়াল শ্রীহরি, তুমি গৃহদেবী হয়ে।
গুছাইয়া দেবে ঘর যাবে সঙ্গে লয়ে॥
ঘুচিবে জঞ্জালময় অসার সংসার।
স্বর্ণময় পুরী ভক্তে দিবে উপহার॥
তথায় সকলে হরি যতনে রাখিয়া।
আপনি সামগ্রী সব দেবে গুছাইয়া॥
আমরা সংসারী হই নহে ইচ্ছা তব।
কিন্তু চাহ দাস হয়ে থাকি মোরা সব॥

পৃথিবী অদ্যাপি তাহা দেখেনি কেমন
পরম সুন্দর হরিদাসের জীবন ॥
ঘৃত তৈলাধারে যথা বিরাজিত ব্রহ্ম।
দেখেনি জগৎ তাহা কেমন সে ধর্ম্ম ॥
এ বৈকুণ্ঠ বহু দূরে ওহে প্রাণেশ্বর।
ইহাকে ধরিতে শ্রম হইবে বিস্তর ॥
পাহাড়ে জঙ্গলে আছে যে বৈকুণ্ঠ পুর।
তাহাত সহজলভ্য অতি অল্প দূর ॥
এ বৈকুণ্ঠ বহু দূরে ছুঁতে যদি যাই।
ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি ধরিতে না পাই ॥
যে ঘরে প্রবেশি আলো ধক্ ধক্ তায়।
দেখে ইচ্ছা হয় বাস করিগো তথায় ॥
ঝাঁট দিতে যাই আমি যখন সে ঘর।
তব হস্ত দেখি মম হস্তের ভিতর ॥
যবে এইরূপ হবে সকল সংসার।
হরিময় নেহারিব সব ঘর দ্বার ॥
সাজাইছ যে বৈকুণ্ঠ আমাদের তরে।
তখন বুঝিতে তাহা পারিব অন্তরে ॥
আলো করি দাঁড়াইবে যখন সংসার।
ভক্তিভরে প্রণমিব চরণে তোমার ॥
যে ভক্তি তখন আমি করিব অর্পণ।
সে ভক্তি বুঝিতে আমি নারিব এখন ॥
সুখের সংসারে বসে ভাল দিন এলে।
হেরিব শ্রীহরিরূপ অন্ধকার গেলে ॥
না থাকি সংসারে যেন বনে নাহি যাই।
তোমার সংসারে থাকি যোগানন্দ চাই ॥
পূর্ণ যোগানন্দে মগ্ন হয়ে সদা আমি।
দেখিব সকল দ্রব্যে আছ অন্তর্যামী ॥
ছোট ছোট হরিখণ্ড হেরি চারি ধারে।
বহিবে নয়নে প্রেমধারা শতধারে ॥

এই কি সত্য দৈববাণী ?

অবতরণিকা।

রোহিলখণ্ডের অন্তঃপাতী রামপুর নামে একটী অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে; পুণ্যসলিলা সরযূ দেবী কুলুকুলু রবে তাহার পদ ধৌত করিয়া মৃদুমন্দ ভাবে অতীতের গান গাহিতে গাহিতে আপন সঙ্গিনী সনে মিলিত হইবার জন্য যাইতেছেন। মহাত্মা রামচন্দ্র এক সময়ে সরযূ বক্ষে বিহার করিয়াছিলেন। ঋষি, ভক্ত, সাধকগণ এক সময়ে সরযূর সৈকত পুলিনে বসিয়া গম্ভীর ভাবে হরিগুণ গান করিতে করিতে তাহার মধ্যে জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ঐ ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য-মালায় সমাবৃত ছিল। রামপুর স্থান অতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত; যেন স্বয়ং প্রকৃতি দেবী সে স্থানে বসিয়া উৎফুল্ল নেত্রে হাসিতেছেন। তাঁহার অনুচর ও বসন্তদূত কোকিল কুহু কুহু রবে ললিত পঞ্চমে গাহিয়া দিগদিগন্ত পূর্ণ করিতেছে। নববধূ যুঁই ও মল্লিকা লজ্জাবনত মুখে মস্তক নত করিয়া রহিয়াছে। এ জগতে ফুলের সৌন্দর্য্যের ন্যায় আর কি সুন্দর পদার্থ আছে? ইহা দেখিয়াই ঋষিভক্তগণ জগদীশ প্রেমে মজিয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়াই ভক্ত প্রেমিক ফুলের ভিতর মায়ের হাসি দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন—

"ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি!
কিবা মৃদুমন্দ সুধা গন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি!"

এই স্থান প্রকৃতই মুনিঋষিগণের তপস্যা করিবার স্থান।

রামপুর নগরের এই অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া দয়াল সিংহ নামে এক জন অতি সম্ভ্রান্ত নরপতি এ স্থান বাসের জন্য মনোনীত করিয়া সপরিবারে স্বনগর হইতে আসিয়া এ স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার উন্নত দেহ ও গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া মানবদেহের ভিতরে ভক্তির উদয় হয়। বাস্তবিকই তিনি শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র। সে সময়ে ভারতবর্ষে ধন, মান, যশ, বীরত্ব ও দয়ায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিতেন, আবার যুদ্ধশেষে তিনি শত্রুর প্রতি দয়া ও সেবা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই সকল সদ্‌গুণ দ্বারা তিনি প্রজা ও শত্রুবৃন্দকে বশ করিয়া নিজ রাজ্য দৃঢ়তম অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ সব ব্যতীত তাঁহার একটী বিশেষ গুণ ছিল। সে সময়ে রাজা মহারাজাদের অনেকগুলি করিয়া পত্নী থাকিত। কিন্তু আমাদের দয়াল সিংহ একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন নাই। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "ইহাই কি একটী বিশেষ গুণ?" ইহাকে কি গুণের মধ্যে ধরিতে হইবে? আজ কাল ত অনেকেই একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন না।

কিন্তু পাঠিকা! আজ কালকার কথা ছাড়িয়া দাও——জিজ্ঞাসা করি পাপের মধ্যে থাকিয়া পাপ না করা কি আশ্চর্য্য নয়? তখনকার সমাজে ইহা গুণ বই কি! তাঁহার একমাত্র ধর্ম্মপত্নী ছিলেন তিনি তাঁহাকেই আপন হৃদয়ের সমগ্র প্রেম উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মহিষীও যথাযোগ্য মহারাজের উপযুক্তা ছিলেন। সেই সেই গুণে তিনিও ভূষিতা ছিলেন। তিনি রূপে লক্ষ্মী ও গুণে তিনি সরস্বতী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, সে জন্য সদা সর্ব্বদা মহিষীকে বিমনা দেখা যাইত।

মহিষী এক দিবস সখীগণকে বিদায় দিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে একাগ্র মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি মনে করিয়া আবার তিনি সখীগণকে আহ্বান করিলেন। সহচরীগণ আসিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সখি! এরূপ ভাবে বিদায় দিয়াও পুনরায় আহ্বান করিলে কেন? বাস্তবিক মহিষী তোমাকে আমরা রাণী বলিয়া জ্ঞান করি না কিন্তু আমাদের হৃদয়ের প্রিয়তমা সখী বলিয়া পূজা করি। তোমাকে এরূপ ভাবে কালযাপন করিতে দেখিয়া হৃদয়ে বিষম কষ্ট অনুভূত হয়। সখি! অনুরোধ করি বৃথা চিন্তা হইতে হৃদয়কে দমন কর ও কাল চিন্তাকে আর হৃদয়ে স্থান দিও না। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হইবে।" রাজ্ঞী কহিলেন, "সখীগণ! তোমরা আমাকে যেরূপ জ্ঞান কর সত্য সখী তোমাদিগকে তাহা হইতে

ভিন্ন ভাবে না। কয়দিন হইতে মনটা কি রকম করিতেছে। সর্ব্বক্ষণ মনে হইতেছে একবার ভগবান রামচন্দ্রের স্থান দর্শন করিয়া পাপ প্রাণ শীতল করি। কি জানি কবে মৃত্যু আসিয়া এ জগত হইতে অন্তরিত করিয়া লইয়া যায় তখন মনের সাধ মনে মিলাইয়া যাইবে, প্রাণের বাসনা পুরিবে না।"

তখন রাণীর প্রধানা সখী প্রমীলা কহিল, "সখি! তাহার জন্য চিন্তা কি? তবে কিনা মহারাজাকে একবার জানাইতে হইবে। আপনি অনুমতি করিলেই মহারাজের নিকট গিয়া অনুমতি ভিক্ষা করি।"

সত্য সখী কহিলেন, "প্রমিলা! তোমারও যদি আমার ন্যায় কৌতুহল উদ্দীপন হইয়া থাকে তাহা হইলে এই পত্র খানি লইয়া তুমি রাজাধিরাজ সকাশে গমন কর। এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত জ্ঞাত হইব।" তবে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তখন প্রমীলা রাণীকে অভিবাদন করিয়া রাজ-সকাশে প্রস্থান করিলেন।

প্রমীলা রাজসভায় আসিয়া দেখিলেন যে মহারাজ দয়াল সিংহ রাজমন্ত্রীর সহিত কি কি রাজকার্য্য দেখিতেছেন; এত নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিতেছিলেন যে কেহ রাজসভায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ পরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেই প্রমীলা রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন।

রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "এরূপ অসময়ে যে আজ বৃন্দাদূতীর আবির্ভাব? কি মনে করিয়া আজ হঠাৎ এখানে উদিত হইলে জানিতে পারি কি?" প্রমীলা লজ্জাবনত মুখে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া মহিষীর পত্র রাজাকে প্রদান করিলেন। মহারাজ পত্রখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন পরে মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে মন্ত্রীকে দিয়া পাঠ করিতে বলিলেন।

পাঠান্তে মন্ত্রী মহাশয় হাস্যমুখে বলিলেন, "মহারাজ দেবীর অদ্যই রামচন্দ্র দর্শন করিতে অভিলাষ হইয়াছে, আপনার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছেন।" তখন মহারাজ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া পত্র লিখিয়া প্রমীলার হস্তে প্রদান করিলেন। প্রমীলাও লজ্জাবনত মুখে মৃদুমন্দ হাস্য সহিত মহারাজকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে লিপি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এখানে রাণীর মন বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ও মাঝে মাঝে চিন্তা করিতেছেন প্রমীলা কি কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই? না হয় আমি নিজেই গিয়া অনুমতি ভিক্ষা করি।

এমন সময় প্রমীলা হাস্যমুখে আগমন করিতেছেন দেখিয়া রাণী বুঝিলেন যে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। অতঃপর প্রমীলাকে বলিলেন সখি! সংবাদ কি? প্রমীলা বলিলেন যে দেবি! বোধ হয় কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। রাণী প্রমীলার এবম্বিধ আনন্দসূচক বাক্য শ্রবণে একেবারে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন এবং

দণ্ডায়মান হইয়া সাদরে প্রমীলাকে আলিঙ্গন করিলেন।

রাণী প্রমীলার হস্ত হইতে রাজদত্ত পত্রখানি লইয়া সখীগণে পরিবৃতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন এবং আপনি যে পতিসোহাগিনী সে জন্য কতই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। রাণী পত্রপাঠান্তে সখীগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে মন্ত্রী মহাশয় বহির্দ্বারে যানাদি সজ্জিত করিয়া আপনাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন! রাণী এই কথা শ্রবণ মাত্রেই আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন হে অন্তর্যামি পিতা! তুমি আমার প্রাণের ভিতর আছ সকলি দেখিতে পাইতেছ, তোমার অজানিত কিছুই নাই! জগদীশ কৃপা করিলে আমার আশা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া রাণী নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; দুই চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতাশ্রু বহিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

স্তব:

(জয়) শিব সনাতন দৈত্য বিনাশন
অনাথ পালন তারণ হে।
(জয়) অখিলের পতি অনাথের গতি
বসুধা ভারতী, শরণ হে॥
(জয়) অনাথ পালক বালক পালক
সদর্প নাশক ত্র্যম্বক হে।
(জয়) ভূতেশ মহেশ গুণাদি অশেষ
যোগেশ রমেশ দান্তীক হে॥
(জয়) মহাভীতি হারী শ্মশানচারী
পিনাকধারী হারণ হে।
(জয়) জয় হাড়মালী ত্রিশূলী কপালী
মহাবলশালী জীবন হে॥
তোমারি কারণে বনে অনশনে
মহাযোগীগণে ডাকিছে হে।
করি প্রণিপাত এই কর নাথ
থাকি যেন তব সাথে হে॥
অতি দীন জন ভজন বিহীন
একে মূঢ় মন কাঁদিছে হে।
দিয়ে পদছায়া ভেঙ্গে দাও মায়া
দীনে কর দয়া মিনতি হে॥

উপাসনা-সমাপনান্তর রাণী প্রমীলাকে আহ্বান করিলেন এবং সখীগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন।

প্রমীলা আজ্ঞামাত্রেই সকল সখীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মহারাণী অদ্যই রামচন্দ্র দর্শন করিতে যাইবেন অতএব তোমরা সকলে পূজার দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া ত্বরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাণী সত্যবতী প্রমীলাদি সখীগণে পরিবৃতা হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। প্রাতঃকালে তাঁহারা সকলে রামপুর পরিত্যাগ করিলেন।

প্রাতঃকালের মৃদুমন্দ সমীরণ উপভোগ করিতে করিতে তাঁহারা সকলে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। বসন্তের মৃদুল পবন ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। বনাভ্যন্তর হইতে বসন্তদূত কোকিল ললিত পঞ্চমে কুহু কুহু রবে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া

হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া অতীতের স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া গগন মার্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তাকাশে মিলাইয়া গেল।

এইরূপ স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর তাঁহারা সকলে পূরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে ভগবান রামচন্দ্রের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। তখন সকলে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পূজা সমাপনান্তে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে মহারাণী সত্যবতী ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে একদিকে দাতারা দানকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং কত সাধু সন্ন্যাসন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

সময়।

বহু পুরাতন "সময়" প্রবন্ধ এত দিন পরে পরিচারিকায় দেখিয়া কত পাঠিকা না জানি বিরক্ত হইবেন। কিন্তু এই "সময়" কথাটি পুরাতন হইয়াও জীবনে নূতন বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক জানিয়া এই প্রবন্ধটি লেখা হইল।

প্রতি শিশুই শৈশবে পদার্পণ পরে যৌবন তৎপরে বার্দ্ধক্য সম্ভোগ করিবে জানিয়া সাধারণে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সেই শিশু যেমন একটি নহে, এ পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং প্রত্যেক শিশুর কাছে তাহার শৈশব নূতন, যৌবন নূতন, এবং বার্দ্ধক্য নূতন বলিয়া বিশ্বাস হয়; তেমনই সময়ও কত দিনের পুরাতন তথাপি নূতন বলিয়া নিত্য ইহাকে মনে হয়।

সময় যাহা যায় আর আসে না। জীবন যে সময় রাখিয়া যাইতেছে, সময় তাহা লইয়া ধরিয়া থাকে আর ফিরাইয়া দিবে না। আজ একটু যদি তুমি অন্যায় করিয়া ফেল এবং মোচন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর কিছুতেই সক্ষম হইবে না। সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাক প্রাণপণে সে সময় ফিরাইতে চেষ্টা কর, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যদি ভাল কাজ করিয়া থাক, পাঠিকা, দশ বৎসর পূর্ব্বে, দেখ ভাবিয়া আজও সেই সময়টা মনে করিয়া, প্রাণে কত আনন্দ হইবে আর এই আহ্লাদ যে সে কাজটা "সময়" যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সময় অমূল্য। পৃথিবীর ধন, মানে "সময়" কিনিতে পারা যায় না। আজ যদি কাহাকেও গালি দিয়া থাক, কাহারও প্রাণে আঘাত দিয়া থাক, আরও পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও দেখিবে সময় তোমার কাছে আজিকার ঘটনা সকল স্মরণ করাইয়া বিকট হাসি হাসিবে। সুন্দরী স্ত্রী ভাবিতেছে, "আমি ষোড়শী যুবতী আমার রূপের সঙ্গে কাহার তুলনা?" দেখিতে দেখিতে ষোড়শ বৎসর চলিয়া গেল, যৌবনের

রূপ বার্দ্ধক্যে উপস্থিত! সুন্দরী চমকিয়া উঠিল, "সময়" হাসিয়া বলিল "আমি কখনও একস্থানে থাকি না, দ্রুত আমার গতি।"

সেই জন্যই আমাদের আরও বেশী যত্ন, আদরের সহিত সময়ের সেবা করা উচিত। সময়ের দাসী আমরা সকলে, আজই যদি সময় নিকটে আসিতে অনিচ্ছুক তখনই আমরা পরধামে চলিয়া যাইব।

পূর্ব্বকালে নক্ষত্রাদি দিয়া নানারূপ গণনা দ্বারা গমনাগমনের দিন, বিবাহাদির দিন ঠিক করা হইত এখন কুসংস্কার বলিয়া অনেকে ইহা গ্রাহ্য করে না। অবশ্যই কোন কোন কাজের ভিতর কুসংস্কার আছে স্বীকার করি কিন্তু গূঢ় অর্থও ইহার ভিতর আছে। সময় ঠিক করা অর্থ, স্থির ভাবে কার্য্যাদি করিতে হইলে সময় প্রথমে ভাবা উচিত। হয় ত সন্ধ্যার সময় সুবিধা নহে, কিম্বা ঝড় তুফানের সময় যখন তখন যাওয়া উচিত নহে। এই সকল নানা কারণে হয় ত দিন গণনার নিয়ম হইয়াছিল। এখন সভ্যতা, শিক্ষার প্রভাবে হয় ত অনেকে সময়কে দাসীত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিতে প্রস্তুত! কখন হয় ত কোন সময়ে সময়, অসময় না বুঝিয়া কোন বন্ধুকে একটা কথা বলিয়াছি তাহার সঙ্গে চির শত্রুতাই হইল! সময়ের সম্মান রাখিয়া কার্য্য না করিলে বড় কষ্ট। নিজের কষ্ট, অন্যের কষ্ট, আর জীবনের ক্ষতি। ভাবিয়া দেখ, পাঠিকা, সময় হু হু শব্দে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু আমাদের জীবন যে স্থানে ছিল, ঠিক সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। সেই নারীই ভাগ্যবতী ও সুখী যে নারী সময়ের মাহাত্ম্য বুঝিয়া সময়ের গৌরব রক্ষা করে। সময় চলিয়া যায় আর আসে না, মৃত্যুও কাহারও জন্য বিলম্বে আসিবে না। যে যত জীবনের কার্য্য করিতে পারে সে জীবন তত পরিমাণে সময়ের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অতএব পাঠিকা এই পুরাতন প্রবন্ধটি ঘৃণা না করিয়া যদি আমরা বিশ্বাস করি যে "সময়" নিত্য নূতন, দিন নিত্য নূতন এবং প্রতি মূহুর্ত্ত প্রতি দণ্ড, পল আমাদের নিকট অমূল্য তাহা হইলে আমরা সকলে কিছু কিছু সৎকার্য্য জীবনের কার্য্য ধর্ম্মকার্য্য করিয়া, সকলেই সুখী ও কৃতার্থ হই।

এই তো সংসার।

এই তো সংসার! যে যায় সে যায়। শুধু দুদিনের আলাপ পরিচয়, তারপর? সব শেষ। যে গেল যার স্থান শূন্য হইল সে স্থান কি অপূর্ণ থাকে? না, আবার কোথা হইতে লোক আসিয়া সে স্থান অধিকার করে? আমি যাহাকে বড় আপনার বলিয়া ভাবি সেও কি আমি চলিয়া গেলে আমায় একেবারে ভুলিয়া যাইবে? এ জগতে এমন কি একটিও প্রাণ, একটিও হৃদয় নাই যে হৃদয়ের স্থান চিরদিন আমারই থাকিবে, যাহাকে চিরদিন "আমার" বলিতে

পারিব? এ সংসারে যে কাহাকেও আপনার বলিয়া দেখিতে পাই না। যে যতদিন নিকটে সেই ততদিন কেবল আপনার, যে দূরে সেই বিস্মৃত! হায় রে, ভ্রান্ত মন, এই দুদিনের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এতই ব্যস্ত! অনন্ত সম্পর্ক ভুলিয়া দুদিনের মায়াময় সংসারের দুটো মিষ্ট কথা দুদিনের একটু স্নেহ আদর পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা! ইহা যে অনিত্য, সকলই যে দুদিনের। সকলেই যে পর, কেহই যে আপনার নয়। এই আমি, যাহার আজ এত আদর যত্ন, যাহার উপর এত মায়া এত ভালবাসা, সেই আমি যদি আজ চলিয়া যাই, মৃত্যু আসিয়া যদি গ্রাস করে, তখনই যে চোখের অন্তরালের সঙ্গে মনের অন্তরাল হইবে? তখন কি আর কেহ আমায় মনে রাখিবে? স্বামী, পুত্র আত্মীয় স্বজন কেহই তাদের অন্তরের একটু স্থানও চিরদিন আমার জন্য রাখিতে পারিবে না? চিরবিস্মৃতিসাগরে এ নাম জন্মের মত বিলীন হইয়া যাইবে? তবে সংসারই বা কাহার? আপনার বলিই বা কাকে? তাই বলি;—

"নয়ন মুদিলে আঁধার, কেহ নহে
আপনার,
সকলই অসার ভবে সকলই অসার।"

আদর্শ পরিবার।

আদর্শ পরিবার কাহাকে বলে? যে পরিবারের নরনারী সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় ও উপাসনাশীল, তাঁহারা ন্যায় ও সত্যের পথে থাকিয়া জীবনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন, সকল সময় সকল অবস্থায় সেই পরম দেবতার চরণে সমুদায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুখ দুঃখ সমভাবে বহন করিয়া সুখী হইতে পারেন। সন্তান সন্ততিগণ যে পরিবারের কখন পিতা মাতা গুরু জনের অবাধ্য হয় না, সর্ব্বদা পিতা মাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, মনোযোগের সহিত সকল প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিয়া সকলকে সুখী করে ও নিজেরাও কত সুখী হয়। সন্তানগণ যাহাতে সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ও ঈশ্বর পরায়ণ হইতে পারে, পিতা মাতা অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। আদর্শ পরিবারের কেহ কখন দাস দাসীর প্রতি কর্কশ হন না, সদা মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে মিষ্ট শাসনে রাখেন।

স্বামী স্ত্রীর প্রতি স্ত্রী স্বামীর প্রতি কখনও কোনরূপ অনাদর বা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন না, উভয়ে উভয়কে অতি পবিত্র ভাবে দর্শন করিয়া কায়মনবাক্যে পরস্পরকে সুখী করিতে চেষ্টা করেন। সর্ব্বদা এক মন প্রাণ হইয়া সকল কাজ সম্পন্ন করেন ও সকল কাজের আগে সপরিবারে সন্তানগণকে লইয়া সেই পরম মঙ্গলময় গৃহদেবতার চরণতলে বসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতে থাকেন, এবং সেই অভয় পদে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া কোন

কাজই করা উচিত মনে করেন না। আদর্শ পরিবারে অতিথি সেবা একটি প্রধান কার্য্য। অতিথি আসিলে সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার সেবা করেন। দীন দুঃখী অসহায় নিরাশ্রয়দিগের সাহায্য ও সেবা করা ঐ পরিবারের একটি মহাকার্য্য। এই সকল কাজ করিলে যত সুখ ও আনন্দ হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না, সে সুখ ও আনন্দ বাস্তবিকই স্বর্গীয়।

সেই পরিবারের একটি কাজও কোনরূপ বিশৃঙ্খল হয় না সকল কাজই অতি সুন্দর পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়। আদর্শ পরিবারে প্রতি জনের মুখে সেই প্রেমময়ী জননীর মুখচ্ছবি সদাই প্রকাশিত থাকে, সকলকে দেখিলেই মনে হয় যেন বাস্তবিকই স্বর্গীয় আদর্শ পরিবার। হায় সে দিন কবে হবে, যে দিন প্রতি মনুষ্য পরিবারে জগতে আদর্শ পরিবার বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে। জীবনে এই সকল পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আদর্শ পরিবার গঠন করা যায়। আত্মচিন্তা দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। আত্মোন্নতি না হইলে সুন্দর জীবন লাভ করা যায় না, এবং জীবন সুন্দর না হইলে পরিবার সুন্দর হইতে পারে না, ভক্তিভাজন স্বর্গীয় শ্রীআচার্য্য দেব সুন্দর সুখী পরিবার গঠন করিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইলেন কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন কত আশাই করিয়াছিলেন। আমরা কি সে বিষয়ে একটুও চেষ্টা করিব না? ভগিনিগণ! যদি আমরা সকলে মিলিয়া দয়াময়ী জননীর সেই অপার করুণা সহায় করিয়া প্রাণপণে নিজ নিজ জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করিতে চেষ্টা করি সেই ভক্তবৎসল ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন, জগতে তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

"জিজ্ঞাসা।"

কেন বিধি হেন রূপে জগতে গঠিলে?
মনের মতন সুখ, নাহি হেথা মিলে।
কভু যদি সুখ, উজলয় হৃদি শশী,
তাহারে অচিরে গ্রাসে, দুঃখ-রাহু আসি।
হেথা-সবে, সুখ আশে ঘুরিয়া বেড়ায়,
সুখের আলয় হেথা, খুঁজিয়া না পায়;
সুখ সে চলিয়া যায় হৃদয় পরশি,
যথা স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, পোহাইলে নিশি।
সুখেরে শুধাই,—নিবাস কোথায় তোর?
কোন্ দেশ থাকে শুধু তোমাতেই ভোর?
ব'লে দাও, সেই দেশে যাব আমি চ'লে
সুখেরে অঞ্জলি দিব, নিত্য নব-ফুলে।
কিন্তু হায়! যত দিন আছি এ ধরায়,
আলিঙ্গন করি তোরে, "আয়, দুঃখ আয়।"
এ জীবনে অশ্রুজল হইয়াছে সার
সুখ আশে, বৃথা কেন ফের বার বার?
দুঃখই আমার হবে, পরিণত সুখে,
হৃদয়ের সাথী ক'রে রাখি তারে বুকে।
"দুঃখের আগুণ জ্বালি, এ হৃদি কাঞ্চন
কর দেব, নিরমল, উজল বরণ"॥

মৃত্যুকালীন উক্তি।

Dr. Goodwin শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন, "এই কি মৃত্যু? আমি এই সহাস্যবদন বন্ধুকে শত্রু জ্ঞানে এত ভয় করিতাম?"

Philip J. Jenksএর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে একজন তাঁহাকে বলে, "মৃত্যু কি কঠিন?" তাহাতে তিনি বলেন, "না, না মৃত্যু সহজ, মৃত্যু ধন্য, মৃত্যুর জয়।"

Risden Daracott বলিয়াছিলেন, "আমি শোকার্ত্ত বন্ধুদের আর্ত্তনাদ হইতে স্বর্গদূতদিগের সম্ভাষণে এবং দেবগণের নিকটে স্বর্গে যাইতেছি। ধন্য ভগবান, সকলই মঙ্গল।"

John Dodd মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি সম্মুখে মৃত্যু দেখিতে ভয় করি না। আমি বলিতে পারি মৃত্যু, কোথায় তোমার শূল? মৃত্যু আমাকে আঘাত করিতে পারে না।"

Dr. Payson মৃত্যুকালে বলেন, "আমার ভগবান এই গৃহে, আমি তাঁকে দেখিতেছি, আহা কি সুন্দর দৃশ্য, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, দশ সহস্র হৃদয় যদি আমার থাকিত তাহা দিবার উপযুক্ত এ দৃশ্য।" আর এক সময় যখন রোগ যন্ত্রণায় দেহ অস্থির হইয়াছিল তখন বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধ সাঙ্গ হইল, যুদ্ধ সাঙ্গ হইল; জয় লাভ হইল, চিরদিনের মত জয় লাভ হইল। এখন আমি সেই পবিত্রতা, দয়া সুখের অনন্ত সাগরে স্নান করিতে যাইতেছি।"

Cæsar Borgia মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন, "আমি আমার জীবনে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, কেবল মৃত্যুর জন্য কিছু করি নাই; এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।"

Edward Deering বলেন, "আমার মৃত্যুর জন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে আমি অন্তর মধ্যে আত্মাতে এত সুখ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। যদি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আমাকে কেহ মনোনীত করিতে বলে, আর যদি ভগবানের পবিত্র ইচ্ছা তাহাই হয় বুঝি তাহা হইলে আমি সহস্রবার মৃত্যুকেই মনোনীত করি।"

একজন স্কচ্ পাদ্রীকে তাঁহার শেষ রোগশয্যায় কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার কি মনে হইতেছে মৃত্যু সন্নিকট? ইহাতে পাদ্রী বলেন "বন্ধু, সত্যই বলিতেছি আমি থাকি বা না থাকি আমার তাহাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ যদি আমার মৃত্যু হয় আমি জানি আমি ভগবানের সঙ্গে থাকিব; আর যদি বাঁচি তিনি আমার সঙ্গে থাকিবেন।"

Cardinal Wolsey যখন সম্রাটের বিরক্তিভাজন হইলেন তাহার পর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এই কয়েকটি কথা বলেন।

"আমার রাজাকে আমি যেরূপ পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত সেবা করিয়াছি সেইরূপ যদি ভগবানের সেবা করিতাম তাহা হইলে আমার এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি এরূপ ভাবে আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু ভগবানের সেবা না করিয়া কেবল রাজার সেবা করিবার যে যথার্থ পুরস্কার তাহাই আমি পাইয়াছি।"

পাক বিধি।

মধুরার্দ্রক।—প্রথমে, আদার খোসা ছাড়াইয়া, তাহার সরু সরু খণ্ড করিবে। এখন, তাহাতে লবণ মাখাইয়া রাখিবে।

এদিকে, চিনির রস প্রস্তুত করিয়া, তাহা জ্বালে চড়াইবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে কাগজি কিম্বা পাতি লেবুর রস ঢালিয়া দিবে। যে পরিমাণ চিনির রস, তাহার সিকি পরিমিত লেবুর রস দিবে। পাকে উহা অর্দ্ধেক মরিয়া আসিলে, তাহাতে জাফরান বাটা মিশাইয়া দিবে। এখন রসে আদাগুলি ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে।

অনন্তর, উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইয়া রাখিয়া, অপর একটি পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে রস-সহ আদা ঢালিয়া দিবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া আসিলে, তাহা নামাইবে। পরে, তাহাতে গন্ধদ্রব্য-চূর্ণ দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, ঢাকিয়া রাখিবে। এইরূপ পাক করা আদাকে মধুরার্দ্রক কহে।

রোগীর পথ্যে মধুরার্দ্রক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আদা অত্যন্ত উপকারী। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ সর্দ্দি কাসিতে, আদা খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

আজ কালকার মেয়েরা গৃহকর্ম্মকে অতি নীচ কার্য্য মনে করিয়া সে সকল হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিতে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ তো নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া কাটাইতে পারে না; তাই তাঁহারা বাজনা গান বা কোন বাবুয়ানী, সেলাই অথবা নভেল লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে উৎফুল্ল হয়েন। স্বামী বামুনের বা বাবুর্চ্চির একঘেয়ে রান্না ও বাজারের শুষ্ক পচা মিঠাই খাইয়া অম্বল ও অরুচিতে অস্থির, তবু কি মনে হয় না কিছু মিষ্টান্ন বা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া তাঁকে ও অন্যান্য পরিজনকে তৃপ্ত করি ও তৃপ্ত হই। শচী যে কিছু পারিত না তাহাতে কি তার কম কষ্ট ছিল। নারী জীবন ধরিয়া সেরূপ বিপদে যেন কাহাকেও পড়িতে না হয় আশীর্ব্বাদ করি। আমি রাঁধিয়া বৃদ্ধা হইতে চলিলাম আজ সামান্য এই খাবারটী সকলে করিয়া বাড়ীর সকল প্রিয়জনকে খাওয়ান এই

আকাঙ্ক্ষা; তাঁহারা উৎসাহিত করিলে ক্রমে রন্ধনে পরিপক্কা হইয়া উঠিবেন, রন্ধন পরিবেশনে আনন্দিত হইবেন।

গোল আলুর নিম্‌কি কচুরি —ইহার নির্ম্মান কৌশল বেশ সহজ। প্রথমে নাইনিতাল গোল আলু জ্বালে সিদ্ধ করিতে দিবে। উত্তম সিদ্ধ হইলে নামাইয়া খোসা ছাড়াইবে। অল্প গরম থাকিতেই বেশ চট্‌কাইয়া লইবে। এদিকে কচুরির ময়দার মত ময়ান দিয়া ময়দা মাখিয়া তাহাতে সত ময়দা তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ঐ আলুর থাসা ও একটু লুন দুটী গোল মরিচের গুঁড়া দিয়া মাখিবে। জল যেরূপ লাগে তাহার বেশী যেন না হয়। অন্য দিকে ঐ বাকি আলুর থাসা ও সেই আলুর পরিমাণ হইতে তিন ভাগ বেশী মটর সুঁটী যেমন কচুরী করিতে ছাড়ান হয় সেইরূপ ছাড়াইয়া বাটিয়া লঙ্কা বাটা গোল মরিচ বাটা আদা বাটা অল্প হলুদ বাটা লুন পরিমাণ মত দিয়া ঐ আলু ও মটরসুঁটী বাটা ঘিয়ে ভাজিয়া পুর প্রস্তুত কর। পরে সেই আলু ও ময়দা মাখার নেচী করিয়া ঠুলী প্রস্তুত করিয়া সেই পুর দিয়া একটু মোটা নিমকীর গড়নে বেলিয়া খুব সাবধানে ঘিয়ে ভাজিয়া তুলিবে কিন্তু বেশী আঁচ না হয় আবার খুব কমও না হয়। বেশ গোলাপী অপেক্ষা একটু বেশী লাল করিয়া ভাজিবে সকলে এক একবার পরীক্ষা করিও এই অনুরোধ।

Selections.

Great souls endure in silence. —*Schiller.*

Thougtless generosity is door-keeper to want.

Time and eternity—linked together by a single moment.—*Schiller.*

Wishing, we waste ourselves; thinking, we tire ourselves; but doing, we double ourselves.

Bad temper is not strength of mind, nor are violent opinions solidity of judgment.

The pain which attends growth is not an evil; that which stops it, is.

Time is the crucible in which the gold is separated from the dross—the true from the false.

It is in the length of patience that much of what is good'in mankind and womankind is shown.—*Arthur Helps.*

Men of intellect who do not cultivate their powers are like those who possessing large houses, prefer to live in the kitchen.

Hope is the paper money of the brain. We draw cheques upon the future, without considering whether there are any assets in the bank.

A beautiful behaviour is better than a beautiful form: it gives a higher pleasure than status and pictures; it is the finest of the fine arts.—*Emerson.*

A great deal of the unhappiness, and much of the vice of the world is owing to weakness and indecision of purpose—in other words to lack of courage. —*Smiles.*

Whoever strives to do his duty faithfully is fulfilling the purpose for which he was created, and building up in himself the principles of a manly character.—*Smiles.*

Faith alone can interpret life, and the heart that aches and bleeds with the stigma of pain alone bears the likeness of Christ and can comprehend its dark enigma.—*Longfellow.*

Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he had done his best.—*Sydney Smith.*

The warmth and sunshine of sympathy do more to dispel the mists of error than all the keen shafts of controversy. Ice may be split and scattered with a sword, but it melts and vanishes in the genial sunlight.

"Art" says Ruskin, "declares the perfectness and eternal beauty of the work of God, and tests all work of man by concurrence with, and subjection to that. It is the expression of man's rational and disciplined delight in the forms and laws of the creation of which he forms a part."—*Ruskin.*

Example is far more than precept.
It is instruction in action.
It is teaching without words.
—*Smiles.*

"Those things alone
Are to be feared whence evil
may proceed
None else, for none are terrible
beside."
—*Dante.*

How sweet to know
The trials which we cannot
comprehend,
Have each their own divinely
purposed end!
He traineth so.
—*Havergal.*

If thou canst plan a noble deed,
And never flag till it succeed,
Though in the strife thy heart
should bleed,
Whatever obstacles control,
Thine hour will come—go on,
true soul;
Thou'lt win the prize, thou'lt
reach the goal.
—*C. Mackay.*

সংবাদ।

কুচবিহারের মহারাজার মাতা ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি অল্প বয়সে বিধবা

হইয়াছিলেন। একটি সন্তানের মা পুত্রকে প্রাণাধিক প্রিয় জানিতেন, তাঁহার পুত্র স্নেহ যে দেখিয়াছে সেই বিস্মিত হইয়াছে। রন্ধনে সুশিক্ষিতা ছিলেন, রবিবারে রাত্রেও পুত্রের জন্য নানাবিধ তরকারী মিষ্টান্নের হুকুম দিয়াছিলেন। কয়েক মাস হইল তাঁহার চক্ষুদৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি পুত্রের আহারাদি তত্ত্বাবধারণে সর্ব্বদাই যত্নবতী ছিলেন। কত বাল্যবিধবাকে প্রতিপালন, কত শিশুকে বিদ্যাশিক্ষা, কত বালক, বালিকার বিবাহ দিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে মন উদার ছিল। কুচবিহারের মহারাণী ব্রাহ্ম কিন্তু কখনও ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই। বধূকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম ত এক, তোমরা এক ভাবে ডাক, আমরা পাঁচ ভাবে ডাকি।" মন বড় সরল ছিল, সাজ সজ্জা একেবারে গৃহস্থের মতই ছিল। বড় সাধ ছিল, "ছেলে, বৌ" সকলের সম্মুখে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। বেশ সুখে গিয়াছেন। রোগের যাতনা বেশী পাইলেন না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। কুচবিহারের তিনি একটা প্রধান অঙ্গ ছিলেন। তাঁহার অভাব সকলেই অনুভব করিতেছে। রাজ্য ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে ভাল বাসিতেন না। এত ধন মান সুখ সম্পত্তি ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু একবারও সে সব কথা বলিলেন না।

স্বর্ণরেণু।

যেখানে পর্ব্বতমালা উন্নত মস্তকে গিরিরাজের মহিমা ঘোষণা করে সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে জলস্রোত সুমন্দ-বেগে প্রবাহিত হইয়া দেশকে উর্ব্বরা করে সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে সুকোমল পুষ্প সকল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যের মন হরণ করে সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে বিচিত্র পক্ষী সকল নানা প্রকার মধুর স্বরে গান করিয়া লোকের প্রাণ সুশীতল করে সেখানেও স্বর্গ নহে। * * * যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে, যেখানে ভক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত হয়, সেখানেই আমাদের দয়াময় পিতার স্বর্গ।

যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান ঈশ্বরের জলন্ত সত্তা এবং অনন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, সেখানে প্রেম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, যেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ।

অতএব কেহই বহির্ব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্তু সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে।

২৬ বর্ষ] ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১০। [১১শ ও ১২শ সংখ্যা

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

26th Year. MARCH & APRIL, 1904. Nos. 11 & 12.

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।	বিষয়।		পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	২২৫	মাতৃস্নেহের প্রভাব	...	২৪৫
একটী গল্প	...	২২৬	সত্য ঘটনা	...	২৪৭
নিশীথে	...	২২৯	স্বপ্ন	...	২৫০
আত্মদান	...	২৩০	রোগীর শুশ্রূষা	...	২৫২
সমাজ	...	২৩৫	পুরাতন ভৃত্য	...	২৫৫
কবে পাব দরশন	...	২৩৭	সংবাদ	...	২৫৫
স্থায়ী কি	...	২৩৮	স্বর্ণরেণু	...	২৫৬
লজ্জারূপিনী	...	২৩৯			

কলিকাতা,
৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;
আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

In English.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga: Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays: Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee			মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ	...	১৲
১৯ ঐ	২য় ভাগ		১৲
২০ ঐ	৩য় ভাগ	...	১৲
২১ ঐ	৪র্থ ভাগ	...	১৲
২২ ঐ	৫ম ভাগ	...	১৲
২৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	...	১৲
২৪ জীবনবেদ		...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ		...	১৲
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	১ম ভাগ	...	।৶০
২৭ ঐ	২য় ভাগ	...	।৶০
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে			১৷৷০
২৯ সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড			১৷৷০
৩০ ঐ	তৃতীয় খণ্ড	...	১৲
৩১ ঐ	চতুর্থ খণ্ড	...	১৲
৩২ ঐ	পঞ্চম খণ্ড	...	১৲
৩৩ নবসংহিতা		...	৸০
৩৪ মাঘোৎসব		...	৷৷০
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল)	১ম ভাগ	...	৷৷০
৩৬ ঐ ঐ	২য় ভাগ	...	৷৷০
৩৭ ঐ ঐ	৩য় ভাগ	...	৷৷০
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর)	১ম ভাগ		৷৷০
৩৯ ঐ	২য় ভাগ	...	৷৷০
৪০ ঐ	৩য় ভাগ	...	৷৷০
৪১ ঐ	৪র্থ ভাগ	...	৷৷০
৪২ ঐ	৫ম ভাগ	...	৷৷০
৪৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	...	৷৷০
৪৪ ঐ	৭ম ভাগ	...	৷৷০
৪৫ ঐ	৮ম ভাগ	...	।৶০
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ		...	।৶০
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১ম ভাগ		।৹
৪৮ ঐ	২য় ভাগ	...	।৹
৪৯ প্রেম কুসুম		...	।৹
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ		...	৶০
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান		...	৶০
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী		...	৶০
৫৩ সুখী পরিবার		...	৵০
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা	১ম ভাগ	...	৷৷০
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ		...	৷৷০
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর		...	৷৷০
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার		...	৷৷০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৬ বর্ষ। } কলিকাতা, ফাল্গুণ ও চৈত্র, ১৩১০। ইং মার্চ্চ ও এপ্রেল ১৯০৪। { ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

বিনীত নিবেদন।

১৩১০ সালের বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় মূল্য দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন নাই। কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ছোট ছেলেদের পক্ষে পিঁয়াজ অতিশয় উপকারী খাদ্য শুনিতে পাওয়া যায়।

India rubber কাটিতে হইলে ছুরিতে জল লাগাইয়া কাটিলে সহজে কাটা যায়।

যে স্থানে দূষিত বায়ু ও দুর্গন্ধ সে স্থানে গমনকালে মুখ বন্ধ করিয়া যাওয়াই ভাল। ছোট ছেলেদেরও এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

লেবুর রস পিত্তনাশের মহৌষধ ইহা অনেকেই অবগত আছেন, Liverএর দোষ হইলে প্রতিদিন রাত্রে ও প্রাতঃকালে আধখানা লেবুর রস গরম জলে মিশাইয়া পান করিলে অচিরে উপকার লাভ করা যায়।

রেলগাড়ীতে যাত্রাকালে আমরা অনেক সময় কাঁচের বোতল ইত্যাদি ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দি; কিন্তু তাহাতে যে কত হানি হয় তাহা একবার ভাবি না। রেলের লাইনে যে সকল কুলী কার্য্য করে ঐ সকল ভগ্ন কাঁচে অনেক সময় তাহাদের অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব যাত্রীগণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এ বিষয়ে যেন তাঁহারা একটু সাবধান হন।

গৃহস্থের বাড়ীতে এক শিশি Ammonia (এ্যামোনিয়া) থাকিলে কত উপকার পাওয়া যায়। ইহার অশেষ গুণ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি আমরা বলিতেছি।

১ম। রেশমী কাপড়ে দাগ পড়িলে তাহার উপর একটু এ্যামোনিয়া লাগাইয়া শুকাইয়া পরে কাপড়ের অপর দিকে একখণ্ড ব্লটিং কাগজ রাখিয়া তাহার উপর ইস্তিরী করিয়া লইলে শীঘ্রই দাগ চলিয়া যাইবে।

২য়। দরজা জানালা ফ্রেম ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে হইলে এক বাল্‌তি গরম জলে এক চামচ এ্যামোনিয়া মিশাইয়া একটু ফ্ল্যানেল কাপড়ের টুক্‌রা ঐ জলে ভিজাইয়া তদ্বারা মুছিয়া লইবে। দেখিবে ইহাতে কত পরিষ্কার হয়।

৩য়। খবরের কাগজের উপর কয় ফোঁটা এ্যামোনিয়া দিয়া তদ্বারা আর্শি ও কাঁচ মুছিয়া পরে আর এক খণ্ড শুষ্ক কাগজ দ্বারা মুছিয়া ফেলিলে অতি সুন্দর ও পরিষ্কার দেখায়। ফিউসিয়া, জেরেনিয়াম্ বা বিগনিয়া ফুলের টবে সপ্তাহে দুইবার করিয়া কয়েক ফোঁটা এ্যামোনিয়া দিলে ফুল অতি সতেজ ও প্রচুর পরিমাণে হইবে।

৪র্থ। দাঁত কন্ কন্ করিলে এক টুক্‌রা তুলাতে কয়েক ফোঁটা এ্যামোনিয়া লাগাইয়া ব্যাথার স্থানে ধরিলে তৎক্ষণাৎ আরাম পাওয়া যাইবে।

৫ম। সোণার গহনা পরিষ্কার করিতে হইলে এক বাটি গরম জলে এক চামচ এ্যামোনিয়া মিশাইয়া বুরুষ দিয়া ধুইলে অতি সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হইবে।

৬ষ্ঠ। রূপার চামচ ইত্যাদিও জলে কয়েক ফোঁটা এ্যামোনিয়া মিশাইয়া তদ্বারা ধুইলে খুব পরিষ্কার থাকে।

৭ম। বোল্‌তার হুলের আঘাত লাগিলে ঐ স্থানে এক ফোঁটা এ্যামোনিয়া লাগাইলে তৎক্ষণাৎ কষ্ট নিবারণ হইবে ও ফুলা বন্ধ করিবে।

একটি গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিপিন হেমের পত্রের অপেক্ষায় বহু দিন কাটাইল। শচীও দিন দিন সংসারের ভার যেন বহন করিতে অক্ষম হইতে লাগিল। তাহার মুখখানি দেখিলে বোধ হইত তাহার মনে কোন স্ফূর্ত্তি নাই। পিতৃগৃহে তাহার কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না। মুক্ত পক্ষীর ন্যায় মনের আনন্দে দিন যাপন করিত। বিবাহ করিয়া শচী সুখী নহে এ কথা বলিতে পারি না। তাহার ইচ্ছা হইত সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সাধন করে, তাহার স্বামীকে সুখী করে, তাহা না হইয়া দিন দিন সে স্বামীকে ঋণগ্রস্ত করিতে লাগিল, সংসারের বিশৃঙ্খলা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহারা সংসারের কার্য্য শিখে নাই তাহারাই বুঝিতে পারিবে, শচীর কি অবস্থা। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মনে একটী গুরুতর ভাবনা, তাহার স্বামীর শরীর দিন দিন

অসুস্থ হইতে লাগিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যখন বিপিন শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া বাটীতে আসিত তখন হয়ত আহারের উপযোগী সামগ্রী কিছুই পাইত না। শচীর আবার রন্ধন করিবার লোক নাই, বহু চেষ্টায়ও সে দেশে লোক পাওয়া গেল না। শচীর স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত। বিপিন যাহা পাইত তাহাই আহার করিত। কিন্তু তাহাতে তাহার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। বিপিন শচীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবে স্থির করিল। শচীর শরীর অসুস্থ হইবার ভয়েই বিপিন তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ে লইয়া গেল। সেখানে দুদিনের মধ্যে শচীর মুখখানি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল হইল। বহু দিনের ছুটির পর বাটী ফিরিলে স্কুলের বালকের যেরূপ আনন্দ হয়, শচীরও অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইল। সে মনের আনন্দে পিতা মাতার আদরে ভাই ভগ্নীর সহিত আমোদ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। বিপিন কয়েক দিবস শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিল। সে স্থানে কিছুদিন পরে তাহার সংক্রামক পীড়া হইল; তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই চিন্তায় অধীর হইলেন। শচীকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিল। হেম প্রাণপণে ভ্রাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হেমের রোগীর প্রতি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও কোমল ব্যবহার দেখিয়া শচী অবাক হইত। সকলেরই ভাবনায় মুখ বিষন্ন ও শুষ্ক, কিন্তু হেমের মুখ কখনও কেহ বিষন্ন দেখিত না। শুধু যখন একাকী তাহার ঘরে নির্জ্জনে থাকিত হেম কত ক্রন্দন করিত কিন্তু সজনে তাহাকে কেহ কখনও কাঁদিতে দেখে নাই। একদিন শচী সহসা হেমের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে হেমের অশ্রুজলে বসন সিক্ত, সে আকুল ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে ও ক্রন্দন করিতেছে। শচী মনে করিত হেমের হৃদয়টি তেমন কোমল নয় তাই সে হাসামুখে সর্ব্বদা রোগীর সেবা করে। কিন্তু সে দিন হইতে তাহার সে ভ্রান্তি মন হইতে একেবারে দূরীভূত হইল। হেম যে কোমলতার আধার, দয়াময়ী তাহা সে বুঝিল। হেমের সদ্‌গুণরাশি শচীকে ধিক্কার দিত ও লজ্জা দিত। এক মাস ধরিয়া বিপিন বিষম রোগ যন্ত্রণায় ভুগিতে লাগিল। বিপিনের মাতা অবধি রোগীর সেবা করিয়া ক্লান্ত হইলেন, শুধু একা হেম প্রাণ দিয়া ভ্রাতার সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভগবানের কৃপায় ও হেমের সেবাতে বিপিন আরোগ্য লাভ করিল। বিপিন রোগমুক্ত হইল বটে কিন্তু শরীর তখনও দুর্ব্বল তখনও সে কর্ম্ম করিতে অক্ষম। ডাক্তারে তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে বিদেশে যাইতে বলিল। কিছুদিন পরে বিপিন তাহার এক পুরাতন ভৃত্যকে লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল। শচী তাহার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রায় পনের দিন

কাটিয়া গেল। বিপিন সমুদ্রতীরস্থ এক ক্ষুদ্র ষ্টেসনে অবস্থান করিতেছিল। একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ভাড়া করিয়াছিল। সে বাড়ীটি সমুদ্র হইতে দূরে এবং ষ্টেসন হইতেও দূরে। তথাপি বিপিন সমুদ্র-তীরে প্রতিদিন বেড়াইতে যাইত। সে দেশে লোকের বসতি অতি অল্প, তবে ষ্টেসনের নিকটে অনেকগুলি লোক বাস করিত তাহারা অধিকাংশই কর্ম্ম-চারী। যে যে দিবসে জাহাজ আসিত সেই সেই দিবসে সেখানে লোকের ভিড় খুব হইত। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিত। সে দেশটি সমুদ্রতীরস্থ বলিয়া সে দেশে বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী ও আম-দানী হইত। বণিকগণের ব্যবসায়ীদের জাহাজ সেখানে লাগিত। বাণিজ্য কারবার সেখানে প্রচলিত ছিল। বিপিন ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। বিপিনের বাঙ্গলাখানির সম্মু-খেই রাস্তার অপর দিকে একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত তৃতল গৃহ ছিল। সেখানে অন্য বাড়ী আর ছিল না। তৃতল গৃহ-খানি লোকশূন্য। বিপিন যখনই বাড়ীতে বসিয়া থাকিত উক্ত বাটী দেখিয়া মনে করিত এ বাড়ীটি কাহার? কেনই বা বন্ধ আছে? একদা সে স্থানের ষ্টেসন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, উহা একজন ধনী জমীদারের বাটী; তিনি মধ্যে মধ্যে সেখানে বেড়া-ইতে আসিলে ঐখানেই বাস করেন, অন্য সময়ে ঐরূপ বন্ধই থাকে।

একদিন সন্ধ্যাকালে বিপিন সেই বড় বাড়ীটি দেখিতেছিল, কত কথাই তার মনে হইতেছিল, এ বাড়ীটার জানালা যদি খুলিয়া যায়, উন্মুক্ত বাতায়নে যদি কাহাকেও দেখিতে পায়! তাহার শরীরটা তখনও তেমন সুস্থ হয় নাই, তাই যেন মনে ভয়ও করিতেছিল। বড় বাড়ীটি যেন ভুতের বাড়ী বলিয়া মনে হইতেছিল। যখনই আমরা একা বসি কত চিন্তাই মনে উদয় হয়! কত আকাশ কুসুম মনে মনে গড়ি! অস-ম্ভব ভাবনাও সুযোগ পাইয়া মনকে অধিকার করে। বিপিনের মনটাকেও সেইরূপ নানা চিন্তায় অধিকার করিয়া-ছিল। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল তৃতল গৃহের গবাক্ষ খুলিয়া গেল, এবং একটী সুন্দরী শ্বেতাঙ্গী রমণী মুখ বাহির করিয়া চারিদিক দেখিতেছে। তাহার মস্তকের কেশগুচ্ছ জানালার বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সহসা তাহার দৃষ্টি বিপিনের উপর পতিত হইল। সে একটু যেন ভীত হইল, মুখ সরাইয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। বিপিনও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ বোধ করিল। সে মনে মনে ভাবিল জমীদার সপরি-বারে আসিয়াছেন, হয় ত ইনি তাহারি পরিবারস্থ একজন। পরে তাহার মনে হইল, ইনিত বাঙ্গালী নহেন ইনি এক জন ইংরাজ মহিলা। বিপিন সেই দিনই ষ্টেসন মাষ্টাররের নিকট জমী-দার আসিয়াছেন কিনা জানিতে বাহির হইল। তিনি বলিলেন, "এ বৎসরে তাঁহারা কেহই এ দেশে আসিবেন না।"

বিপিন যাহা দেখিয়াছিল তাহা আর কাহাকেও বলিল না। তৃতল গৃহ-বাসিনীর পরিচয় পাইবার জন্য বিপিনের মনে ঔৎসুক্য হইল। সে গৃহটি যেমন পূর্ব্বে বন্ধ ছিল এবং মনুষ্য বসতি নাই বলিয়া বোধ হইত, সেইরূপই রহিল। বিপিনের এক একবার বোধ হইতে লাগিল হয় ত বা স্বপ্নযোগে কিম্বা ভুল ক্রমে ঐ মূর্ত্তি গবাক্ষমধ্যে দেখিয়াছে। পুনর্ব্বার সেই মূর্ত্তি দেখিবার আশায় বিপিন প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই গৃহের দিকে তাকাইয়া দেখিত। এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বিপিন মনে ভাবিল যাহা দেখিয়াছিল, তাহা স্বপ্ন বই আর কিছু হইতে পারে না। সপ্তাহান্তে বিপিন একদিন সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া একবার ঊর্দ্ধে তৃতল গৃহের দিকে তাকাইবামাত্র দেখিল গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে, এবং উক্ত রমণী মুখ বাহির করিয়া চারিদিক দেখিতেছে। বিপিনকে দেখিতে পাইয়া সে জানালা সজোরে বন্ধ করিয়া দিল, তাহাতে তাহার এক গুচ্ছ কেশ জানালার বাহিরে রহিয়া গেল। রমণী তাহা ভিতরে টানিয়া লইবার জন্য পুনর্ব্বার গবাক্ষ খুলিল। বিপিন ইহা যে কোন স্বপ্ন নয় তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। পরদিন প্রাতে বিপিন ঐ গৃহের প্রবেশ-দ্বার অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু দেখিল সমুদায় দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। গৃহের পশ্চাতে একটী উচ্চ প্রাচীর তাহার কোন দ্বার নাই। এই প্রাচী-রের উপর দিয়া ভিতরে লম্ফ দিয়া পড়া ব্যতীত বিপিন প্রবেশ করিবার আর কোন উপায় দেখিল না। ইহার পূর্ব্বে সে একবার বাড়ীর সম্মুখের দ্বার খুলি-বার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশেষে একদিন কোন উপায়ে প্রাচীরের উপর উঠিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। সেখানে গিয়া দেখিল চারিদিকের গৃহের প্রবেশ করিবার দ্বার রুদ্ধ। বিপিন একটী দ্বারে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিল। কেহই দ্বার খুলিল না। কি করিবে নিরাশ মনে আপন গৃহে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। পরদিন পুন-র্ব্বার পূর্ব্বদিনের ন্যায় দ্বার খুলিবার জন্য চেষ্টা করিল, সে দিবসও কৃতকার্য্য হইল না। তৃতীয় দিবসে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর একজন বৃদ্ধা রমণী দ্বার খুলিয়া দিল, ইংরাজীতে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" বিপিন বলিল, "গৃহকর্ত্রীর সহিত দেখা করিব।" বৃদ্ধা বলিল, "তাহা হইবে না" এই বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। বিপিন নিরাশ মনে গৃহে ফিরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

নিশীথে।

এ গম্ভীর বিজন রজনী,
নীরব, সুষুপ্তি ঘেরা স্তব্ধ ত্রিভুবন,—

একা জাগি শুনিতেছি যেন
প্রকৃতির অবিরাম জীবন স্পন্দন!

এ আকুল হৃদয় স্পন্দনে
মিশিতেছে যেন কার ব্যথিত পরাণ!
আমার এ জীবনের মর্ম্মে
ধ্বনিতেছে যেন কার গম্ভীর আহ্বান!

এ আকুল অতৃপ্ত পিপাসা,—
কে জানে কোথায় তা'র হবে সমাপন!
পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ,—
কে জানে কোথায় গিয়ে পাব কি কখন!

জগতের বক্ষ জুড়িয়া
বহিতেছে যে অসীম জীবনের তৃষা,
শত কোটী পরাণীর প্রাণে
জাগিতেছে যে অব্যক্ত শব্দহীন ভাষা,
সকলে মিলিয়া যেন সদা
আমার নিভৃততম আত্মার বিজনে
তুলিয়াছে মত্ত কলরোল,
যেন তপ্ত অগ্নিধারা পশেছে জীবনে!

আমি যেন সকলেরে টানি
লইয়াছি বাঁধি এই ক্ষুদ্র বক্ষে মম,
যেন শত যুগ যুগ বাহী
বিশ্বের জীবনধারা মত্ত সিন্ধু সম
পশিছে এ জীবনের মাঝে!
তাই তা'র আস্ফালনে কম্পিত হৃদয়,
তরঙ্গিত তাই চরাচর,
তরঙ্গিত প্রাণ, বিশ্ব আন্দোলনময়!

যেন শত যুগ যুগ বাহী
বিশ্বের জীবনতৃষা হেথা বহিতেছে
শুধু এই ক্ষুদ্র এক প্রাণে,—
আকুল সজল ভাবে হৃদয় ভরিছে!

বিজন ও তারার হৃদয়ে
জাগিছে কি যেন মহা বাসনা দহন,
স্থির স্নিগ্ধ আলোকের সাথে!
তেমনি এ প্রাণে যেন বেদনা কম্পন!

তাই এই সুপ্ত ধরা মাঝে,
নিবিড় আঁধার ঘেরা স্তব্ধ রজনীতে
একা জাগি গণিতেছি যেন
পলে পলে জীবনের জীবনমুহূর্ত্তে!

আত্মদান।

(প্রাচীন রোমের গল্প)

প্রাচীন রোমের অনেক সুন্দর গল্প আছে, তন্মধ্যে একটি মনোহর গল্প লিখিতেছি। কথিত আছে এই গল্পের ঘটনা সত্য।

সে সময়ে রোমরাজ্যে যুদ্ধনিনাদ নীরব হইয়াছে, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। জগতবিজয়ী রোমকগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা বলবীর্য্য, রণনিপুণতা, শিল্পকৌশল, বিদ্যাবিজ্ঞানে জগতশ্রেষ্ঠ। রোম নগরী বৃহৎ অট্টালিকা ও সুন্দর দেবমন্দিরে সুশোভিত। রোমের সর্ব্বপ্রধান পাহাড় "কেপিটোলাইন হিলের" (Capitoline Hill) মধ্যস্থানে খ্যাতনামা রোমান্ ফোরাম্ (Roman Forum) অবস্থিত। যুদ্ধকালে ফোরাম সর্ব্বদাই অশ্বের পদশব্দ, সেনাগণের জয়ধ্বনি ও সাধারণের কোলাহলে পূর্ণ থাকিত, কিন্তু তখন ফোরাম জনশূন্য, নিস্তব্ধ থাকিত।

সহসা একদিন অপরাহ্ণে ফোরাম্ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। নগরবাসীরা সেখানে আসিয়া একত্রিত হইল ও ভয়চকিত ব্যগ্র ভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। ফোরামের মধ্যস্থলে মৃত্তিকা ফাটিয়া গভীর, অন্ধকার গহ্বর দেখা দিয়াছে; গহ্বর ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে—যেন কোন ক্ষুধার্ত্ত দানব বিকট বদন ব্যাদান করিয়া সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা রোম নগরীকে গ্রাস করিতে উদ্যত! রোমের প্রধান শাসনকর্ত্তা ও পণ্ডিতগণ উদ্বিগ্নচিত্তে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত গণনা করিবার জন্য ধীরে ধীরে দেবমন্দিরাভিমুখ গমন করিলেন। রোমকগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। তাঁহার উন্নত দেহ, সুগঠিত আনন, শ্বেত কেশ ও শ্মশ্রু দেখিলে কোন মহাপুরুষ বলিয়াই বোধ হয়।

সহসা গভীর মেঘ গর্জ্জন শ্রুত হইল ও পূর্ব্ব দিকে এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল। এ দুটি অশুভসূচক ঘটনায় রোমকগণ আরও ভীত হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত ধীরে ধীরে মন্দিরের ছাদে উঠিয়া আকাশ পানে চাহিয়া নীরব গণনায় মগ্ন হইলেন। নিম্নে ভীত ব্যাকুল জনতা অপেক্ষা করিতে লাগিল। গণনা শেষ হইলে পুরোহিত মন্দিরের ছাদ হইতে নামিয়া সমবেত রোমকগণের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদিগকে স্থির হইতে ঈঙ্গিত করিয়া তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রোমকগণ, আজ আমাদের বড় বিপদ উপস্থিত। দেবতাগণ অপ্রসন্ন—তাহার চিহ্নস্বরূপ ঐ গভীর গহ্বর রাক্ষসের মত রোম নগরী গ্রাস করিতে উদ্যত। কিন্তু ভীত হইও না। এখনও আশা আছে। আমি গণনায় জানিয়াছি, দেবকূল বলি চাহিতেছেন। মনোমত বলি পাইলে গহ্বরমুখ বন্ধ হইবে—দ্বিধাবিভক্ত ভূমিতল পূর্ব্ববৎ হইবে। কিন্তু এ বিষম বিপদে সাধারণ বলিতে কিছু হইবে না। দেবগণ কি বলি চাহিতেছেন, জানিতে পারি নাই। তোমরা যে বলি উপযুক্ত মনে কর—শীঘ্র স্থির করিয়া তাহা দান কর। দেবগণ তুষ্ট হইলে তোমাদের বলি গ্রহণ করিবেন। রোমকগণ, যে জননী জন্মভূমির কৃপায় আজ তোমরা শৌর্য্য বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিত, সেই জন্মভূমির জন্য তোমরা কি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত নহ? রোমের সুসন্তানগণ, আজ রোমকে রক্ষা কর।"

পুরোহিত নিরস্ত হইলেন। রোমের প্রধান শাসনকর্ত্তা, পণ্ডিতগণ ও সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণ এই অদ্ভুত বলিদানের বলি স্থির করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে তাঁহারা সাধারণকে সে কথা জানাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই জনতা ফোরম শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। ফোরম আবার জনহীন—স্তব্ধ হইল, আর সেই বিকট স্তব্ধতার মধ্যে সেই অন্ধকার গহ্বর যেন তাহার উন্মুক্ত মুখবিবরে বলি চাহিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই আবার প্রত্যাবৃত্ত জনস্রোত ফোরম পূর্ণ করিল। রোমকগণ সেই গহ্বরে তাহাদের ধনরত্নরাজি অর্পণ করিবে স্থির করিয়া সেই সকল আনিয়াছিল। গহ্বরপার্শ্বে রৌপ্য স্বর্ণ মুক্তা হীরক স্তূপাকারে সজ্জিত হইল। কয় জন সম্ভ্রান্ত যুবক গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রোমের ঐশ্বর্য্যরাশি সেই গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকার গহ্বরে উজ্জ্বল স্বর্ণ ও হীরকাদির বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই ধন রত্নরাশি অস্তমিত সূর্য্য কিরণে, অপূর্ব্ব জ্যোতিশ্ছটায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া অন্ধকারে অতলে অদৃশ্য হইল। গহ্বরতলে শব্দ নাই! গহ্বর কি অতলস্পর্শ!

কিন্তু গহ্বরমুখ বন্ধ হইল না। রোমকগণ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত আবার বলিলেন—রোমকগণ ধরণীর ধাতু প্রভৃতির অপেক্ষা—মানবের শ্রমকৌশল ও চিন্তার ফল অধিক মূল্যবান। হয় ত তাহা দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইবে। তোমরা তাহাই আনয়ন কর।" রোমকগণ আবার নগরে গেল ও অবিলম্বে "বলি" সংগ্রহ করিয়া আনিল। কেহ মনোহর চিত্র, কেহ আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলের নিদর্শন প্রস্তরমূর্ত্তি; কেহ বহু দিনের চিন্তার ফল বৃহৎ গ্রন্থ—যাহার যাহা ছিল—তাহা আনিয়া গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কত বৎসরের শ্রম ও চিন্তার ফল দেখিতে দেখিতে সেই গহ্বর মধ্যে অদৃশ্য হইল। প্রাচীন রোমের শিল্প কৌশলের ও বিদ্যার আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি সে গহ্বরমুখ বন্ধ হইল না। রোমকগণ ভীতিবিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইল। তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার বৃদ্ধ পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"রোমকগণ, তোমাদের রমণীরা রোমরক্ষাকল্পে কিছুই করেন নাই। রমণী হৃদয়ের ভক্তি ও বিশ্বাসের উপহার দেবতাগণ অগ্রাহ্য করিবেন না। রোমক রমণীগণ, জন্মভূমি রক্ষার জন্য অগ্রসর হও।"

রমণীগণ অগ্রসর হইয়া আপনাদের মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি উন্মোচিত করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সেই গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি গর্ত্তের মুখ বন্ধ হইল না। বৃদ্ধ পুরোহিত আবার বলিতে লাগিলেন—"রোমকগণ, দেবকুল তোমাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই গ্রহণ করিলেন না। ধন ও অলঙ্কার লাভ সকল মানবের ভাগ্যে ঘটে না। তোমরা মানবজীবনের বিশেষ উপকারী কোন বস্তু প্রদান কর। রোমের সঞ্চিত শস্যরাশি গর্ত্তে অর্পণ কর। শস্যই প্রকৃত সম্পদ—তাহার নিকট মণি মুক্তা তুচ্ছ। শস্যই মানবের সুখ ও স্বাস্থ্যের সহায়। অন্ধকার মৃত্তিকাতলস্থ ধাতু বা মণির অপেক্ষা আলোক ও বায়ুতে বর্দ্ধিত শস্যরাশি বহু মূল্য। গহ্বরে তাহাই নিক্ষেপ করিয়া দেখ।"

তখন রোমকগণ রাশি রাশি শস্য আনিয়া গুহাপার্শ্বে স্তূপাকারে স্থাপন

করিল ও নবোৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সেই শস্যরাশি গহ্বরে অর্পণ করিল। মৃদু খস্ খস্ শব্দে শস্যরাশি গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু হায়—গহ্বরমুখ বন্ধ হইল না! সেই সময়ে ভীত রোমকগণের মধ্য হইতে নিরাশার কাতর ধ্বনি উত্থিত হইল।

বৃদ্ধ পুরোহিত আবার উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"রোমকগণ, দেবকুল পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করিতেছেন না। যাহাতে লোকের ক্ষমতা, গৌরব ও সম্মান লাভ হয় তাহাই প্রদান করিয়া দেখ। রোমক বীরগণ যাহার দ্বারা তোমরা এই গৌরব, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য পাইয়াছ, তাহা গহ্বরে নিক্ষেপ কর।"

রোমক যোদ্ধৃগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রণপতাকা উড়িতে লাগিল; রণভেরীর উৎসাহোদ্দীপক রব শ্রুত হইল—সেই শব্দের তালে তালে পা ফেলিয়া সৈনিকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদের নয়নে উৎসাহ ও স্বদেশানুরাগ বিভাসিত। তাহারা বীর দর্পে—দৃঢ় করে অস্ত্ররাশি উত্তোলিত করিল। সহস্র অসির ঝনৎকার শ্রুত হইল, রণভেরীর গম্ভীর নাদ ধ্বনিত হইল, সহস্রকণ্ঠে জয় ধ্বনি উঠিল—"জয় রোমের জয়!" অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় ও যোদ্ধৃগণের জয়ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। পরমুহূর্ত্তেই অস্ত্ররাশি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল। রোম অস্ত্রহীন হইল। কিন্তু হায় সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় গভীর গহ্বর আরও চাহিতেছে! যোদ্ধৃদল হইতে বিরক্তির অর্দ্ধস্ফুট রব উঠিল। তাহারা হতাশ হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ পুরোহিত সেই প্রশস্ত গর্ত্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"রোমকগণ, তোমাদের আহুতি মানবের নিকট মূল্যবান ও প্রশংসনীয়। কিন্তু সে আহুতি অহঙ্কারের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। তদপেক্ষাও কোনও পবিত্র 'বলি' দান কর।"

বৃদ্ধ পুরোহিত সমবেত জনতার দিকে চাহিলেন। সকলের মুখেই দৃঢ় সঙ্কল্প অদম্য সাহস ও প্রগাঢ় দেশানুরাগ পরিস্ফুট। সহসা সকলের নয়নে বিস্ময় বিভাসিত হইয়া উঠিল। সকলে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে ভেষ্টা (Vesta) মন্দিরের দিকে চাহিল। মন্দিরমধ্য হইতে বহির্গতা হইয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী সেই জনতার মধ্য দিয়া গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু রোমকরমণী আসিতেছেন। সকলেরই পরিধানে শুভ্র বেশ, শুভ্র ললাট শুভ্র কুসুমদামে সজ্জিত। নয়নে ভক্তি, উৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব দেদীপ্যমান। সকলেরই হস্তে কুসুমমাল্য ও অঙ্গুরীয়। যিনি অগ্রগামিনী, তিনিই রূপলাবণ্যময়ী গরীয়সী। তাঁহার আননে তেজোদীপ্তি—অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তিভাব। মার্সিয়া (Marcia) রোমের উচ্চকুল সম্ভূতা—কুমারী। তিনি কুর্টিয়াস্ (Curtious) নামক একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের প্রণয়িণী—আজ তিনি দেশহিতের জন্য চিরকৌমার্য্য ব্রত

অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বহস্তে প্রণয়ীর প্রেমনিদর্শন ও উপহার গুহায় নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছেন। জন্মভূমির হিতকল্পে আজ যুবতী, যৌবনের পবিত্র প্রেমপিপাসা, বিবাহিত জীবনের অতুলনীয় সুখ, মাতৃস্নেহের স্বর্গীয় আনন্দ, সকলই বিসর্জ্জন দিয়া, চিরকৌমার্য্যের কঠোর, প্রেমহীন—সুখহীন জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অসংখ্য রোমকজনতা মুগ্ধনেত্রে আত্মহারা হইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কুমারীগণ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে গহ্বরের কূলে উপনীত হইলেন। এবং অতি মধুর মৃদুস্বরে ব্রতমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণয় নিদর্শনগুলি গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। পশ্চিম দিকে বজ্রনাদ শ্রুত হইল, গুহারমুখ কিঞ্চিৎ কম্পিত হইল। সহস্রকণ্ঠে আনন্দধ্বনি উঠিল—বুঝি গহ্বর বন্ধ হয়!

বৃথা আশা। ক্ষুধিত দানবের মত গভীর গুহা তখনও বলি চাহিতেছে। এইবার বৃদ্ধ পুরোহিত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। জনতা স্থির চারিদিকে স্তব্ধতা ভীষণ। সেই ভীষণ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা কে বলিয়া উঠিল—"মাতৃস্নেহের মত পবিত্র আর কিছুই নাই। মানবহৃদয়ের সকল ভাবই সময়ের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়—কিন্তু মাতৃস্নেহ চিরস্থায়ী—অপরিবর্ত্তনীয়। রোমকজননীগণ জন্মভূমির রক্ষার হেতু তোমাদের শিশুসন্তানদিগকে গহ্বরে নিক্ষেপ কর।"

সহসা এই ভীষণ কথা শুনিয়া রোমকগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু তখনও সেই ক্ষুধিত গহ্বর বদন ব্যাদান করিয়া আছে। ভীত, হতবুদ্ধি রোমকগণ ক্রমে সেই পৈশাচিক বলির কথা বলাবলি করিতে লাগিল। সেই নিষ্ঠুর প্রস্তাব শুনিয়া রোমক রমণীগণ যেন জ্ঞানশূন্য হইলেন। কি দোষে দেহের শোণিতে পুষ্ট প্রাণপ্রিয়, নিষ্পাপ শিশুদিগকে সেই গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে? জননীগণ দৃঢ়করে শিশুদিগকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তাহাদের বিলাপে চারিদিক পূর্ণ হইল। কিন্তু ভীতি—তাড়নায় জগৎজয়ী রোমক বীরগণ উন্মত্তবৎ হইয়া—স্নেহ, মমতা, দয়া, ভালবাসা সকলই বিস্মৃত হইয়া রক্ত পিপাসু পিশাচের মত শিশুদিগকে বলে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিতে উদ্যত হইল। তেমন ভীষণ, তেমন বীভৎস, তেমন করুণ দৃশ্য পূর্ব্বে কেহ কখনও রোমে দেখে নাই। কি পাপে রোমের এই প্রায়শ্চিত্তকাল উপস্থিত?

সহসা দূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। অগৌণে সেই জনতা ভেদ করিয়া, যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত আরোহী লইয়া, একটি বৃহৎ কৃষ্ণকায় অশ্ব, বিদ্যুৎ বেগে গহ্বরের নিকট আসিল। আরোহি বল্গা আকর্ষণ করিলেন—অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সমবেত জনতা বলিয়া উঠিল, "কুর্সিয়াস্ কুর্সিয়াস্!" অশ্বারোহী, যুবক, তাহার সুগঠিত দেহ। সুন্দর মুখমণ্ডলে উৎসাহ ভাব সুস্পষ্ট। তিনি কোষবদ্ধ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, রোমকদিগকে পার্শ্ব হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"রোমকগণ, তোমরা আজ জননী রোমের জন্য ঐশ্বর্য্য, গৌরব, সংসারের পবিত্র সুখ, সবই ত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু, কেহই ত আত্মদান কর নাই। নিশ্চিত বিপদ জানিয়া কেহ কি ঐ অতলস্পর্শ গহ্বরে আত্মদেহ দান করিতে প্রস্তুত নহ? জগতে আত্মবিসর্জ্জনই শ্রেষ্ঠ দান।"

কুর্সিয়াস্ নীরব হইলেন। ফোরমের যে অংশে ভীতিবিহ্বলা রমণীগণ দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিয়া কুর্সিয়াস্ বলিলেন, "রোমক জননীগণ ভীতি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লও। জননীর বক্ষ হইতে কেহ সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।" তাহার পর কুর্সিয়াস্ করুণ নয়নে মার্সিয়ার প্রতি চাহিলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল। মুহূর্ত্তর জন্য কুসিয়াসের নয়নে উৎসাহ জ্যোতিঃ নিভিয়া গেল—তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি মস্তক নত করিয়া মৃদুকম্পিত স্বরে বলিলেন,—মার্সিয়া তুমি আমার মৃত্যু সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছ।"

কিন্তু তিনি তখনি আবার মস্তক উত্তোলন করিলেন—নয়নে সেই উৎসাহ জ্যোতি পুনরায় ফিরিয়া আসিল। রোম নগরীর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"মাতঃ তোমার মঙ্গলের জন্য তোমার এই অনুপযুক্ত সন্তান তাহার তুচ্ছ জীবন দান করিতেছে। রোমের জয় হইক।" কুর্সিয়াস্ অশ্বকে কশাঘাত করিলেন—অশ্ব লম্ফ দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য কুর্সিয়াসের দেবোপম মূর্ত্তি শূন্যে দেখা গেল—পর মুহূর্ত্তে অশ্ব ও অশ্বারোহী সেই প্রাণহীন, বায়ুহীন, আলোকহীন অন্ধকার গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গেল। ফোরমের সমবেত জনতা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া করপুটে চক্ষু ঢাকিল। যখন রোমকগণ চাহিয়া দেখিল, তখন সেই গভীর গহ্বর বিলুপ্ত হইয়াছে ভূমি পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় হইয়াছে। কুর্সিয়াসের আত্মবিসর্জ্জনে রোম নগরী রক্ষা পাইয়াছে। সহসা সেই চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নারীকণ্ঠের কাতর ধ্বনি শ্রুত হইল। রোমক কুমারীদল হইতে শোকপূর্ণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। লাবণ্যময়ী, প্রেমময়ী মার্সিয়া আর নাই! তাঁহার প্রেমপূর্ণ প্রাণ, রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে—কেবল কক্ষচ্যুত অম্লানজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত তাঁহার গতপ্রাণ দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

সমাজ।

আজ আমাদের সমাজ কোথায়? পূর্ব্বে আমরা "সামাজিক আচার ব্যবহার," "সামাজিক প্রথা" ইত্যাদি শুনিতাম; সমাজের শাসন ভয়ে সর্ব্বদা লোক ভীত ও সাবধান থাকিত, পাছে সমাজচ্যুত হয় এই জন্য সর্ব্বদা সমাজের রীতি নীতি রক্ষা করিয়া

চলিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা কোন্ সমাজের কোন্ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিব? যে সমাজে কোন আইন নাই, কোন শাসন নাই, কোন বিধি ব্যবস্থা নাই, সেই সমাজকে কি আমরা "সমাজ" বলিতে পারি? এত সভ্যতা, এত বিদ্যা, জ্ঞানের উন্নতি, কিন্তু সমাজের উন্নতি কোথায়? যেখানে প্রত্যেকেই আপন আপন মতানুযায়ী কার্য্য করিতেছে, স্বাধীন ইচ্ছায় চলিতেছে, তাহাকে কি সমাজ বলিতে পারি? তবে সমাজের অর্থ কি? সমাজের অর্থ কি নহে যে মানবগণ মিলিত হইয়া এমন একটি মণ্ডলী সংস্থাপিত করিবে, যে মণ্ডলী তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে? সমাজের অর্থ কি নহে যে সেই মণ্ডলীর বিধি ব্যবস্থা এরূপ হইবে যে তাহা সকলকে একত্র, সম্মিলিত করিয়া একটি বৃহৎ মানব-পরিবার গঠন করিবে? সমাজের অর্থ কি নহে যে সেই মানব-পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব স্নেহ প্রেম পবিত্রতা দ্বারা সকলকে আবদ্ধ করিবে? সমাজের অর্থ কি নহে যে তন্মধ্যে এরূপ শাসন প্রণালী, এরূপ বিধি থাকিবে যদ্দ্বারা লোক সমাজ সর্ব্বদা সৎপথে ধর্ম্মপথে থাকিতে চেষ্টা করিবে? কোন অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী হইবে না?

এই সকলই যদি সমাজের অর্থ হয় তবে সে সমাজ এখন কোথায়?

আমরা এখন "লেখা পড়া"র কথা, "স্বাধীনতার" কথা কতক বুঝিয়াছি কিন্তু "সমাজের" অর্থ এখনও বুঝি নাই। আর যদি বুঝিয়া থাকি তবে সে সমাজ দেখিতে পাইতেছি না। যে সমাজ যে স্থানে গিয়া বঙ্গকুলনারী সম্মান আদর পাইবেন, যে স্থানে গিয়া বঙ্গমহিলাগণ আত্মোন্নতি সাধনে সহায়তা পাইবেন, যে স্থানে গিয়া যথার্থ মানসিক উপকার লাভ করিবেন, এমন সমাজ কোথায়?

ভাই পাঠিকাগণ, তোমরা বিরক্ত হইও না। কিন্তু তোমাদের সম্মুখে দুই চারিটি কথা বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়াছি "সত্য কথা" সকল সময় শুনিতে ভাল লাগে না। কিন্তু আজ যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহা যদি সকলের ভাল না লাগে তবে আর কি করিব? সত্য মিথ্যা তোমরাই বিচার করিও। কিন্তু বড় ব্যথিত হৃদয়ে তোমাদের নিকটে আজ উপস্থিত হইয়াছি। দিন দিন সমাজের যত কথা শুনিতেছি ততই প্রাণ চমকিয়া উঠিতেছে। যে ভারতকুলনারীর গৌরব ভারত ইতিহাসকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, যে ভারত-মহিলার পবিত্র সুকোমল স্বভাব-সৌরভ আজিও ভারতকে সৌরভান্বিত করিয়া রাখিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ রমণীকুল হইতেই আমাদের জন্ম; আমরা সে কথা কি ভুলিয়া যাইব?

আমাদের দোষে কি সে পবিত্র নামে কলঙ্ক আসিবে? আমরা বিদ্যা শিখিয়াছি, জ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখিয়াছি, স্বাধীনতা পাইয়াছি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ কোমলতা, লজ্জা, স্বভাবের সৌন্দর্য্য তাহাই হারাইতে বসিয়াছি? তবে আর এ সব বাহিরের কতকগুলি জিনিষ লইয়া প্রয়োজন কি? স্বাধীনতা পাইয়া যদি তাহার সদ্ব্যবহারই না করিতে পারিলাম তবে সে স্বাধীনতা লাভের ফল কি?

এখন দেখি স্বাধীনতার অর্থ আর কিছু নহে স্বেচ্ছাচারিতা। যদি লোকভয়কে, সমাজশাসনকে তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষা করিয়া কোন একটা নূতন কার্য্য করিতে পারি তাহা রুচিবিরুদ্ধই হউক আর নীতিবিরুদ্ধই হউক এরূপ একটা কার্য্য করিতে পারিলেই বড় একটা সাহসের কার্য্য ও প্রশংসার ব্যাপার বলিয়া লোকের নিকট সংসিদ্ধ হয়। ইহাই ত দেখিতেছি এখনকার স্বাধীনতা। যে যত সমাজনিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবে তাহারই তত বেশী গৌরব।

আজ এই সকল স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া প্রাণটা আকুল হয়। ইহার পরিণাম কি? আর কতদূর এ ব্যাপার গড়াইতে দিবে? একবার অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই চিরজ্যোতির্ম্ময়ী উজ্জ্বল নারীজীবন সকল দেখ! আর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ!

কোথায় সে লজ্জা, পবিত্রতা! কোথায় সে সতী সাধ্বীদের আদর্শ চরিত্র? আর আজ? আজ বংশ, নাম, গৌরব বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! অসভ্যতা সভ্যতার ছদ্মবেশে সাজিয়া সমাজ গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এস সব আর্য্যনারীগণ, এস যত বঙ্গমহিলা, সময় দূত উপস্থিত; আর নিশ্চেষ্ট জড়ের মত থাকিবার সময় নাই। ভারতমাতা আমাদের ডাকিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষার্থ তাঁর দুর্ব্বলা কন্যাগণকে ডাকিতেছেন। এখন সকলে মিলিত হইয়া কি কার্য্য করিতে পারি এস একবার দেখি। অধর্ম্মেই ভয়, ধর্ম্মে ভয় নাই। লোকে দেখুক, দুর্ব্বলা বঙ্গনারী আপনাদিগের নাম আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ কি না।

"কবে পার দরশন?"

কবে পাব দরশন, কবে পাব দরশন
বিশাল সংসার ধামে কবে পাব দরশন?
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলই যাঁহার দান
তাঁরে খুঁজি নিরবধি কবে পাব দরশন?
প্রকৃতি যাঁহার তরে সদা প্রফুল্লিত মন
কোথা গিয়ে তাঁরে আমি কবে পাব দরশন?
অনন্ত মহিমা যাঁর ধ্যায় মুণি ঋষি জন
কোথা যাব শুধাইতে হবে কোথা দরশন?
ত্রিলোকে ভূলোকে যাঁরে পূজে নিত্য নিরঞ্জন
সেই মহা মহেশ্বরে কবে পাব দরশন?
কোটী কল্প পূজিলেও যিনি চির অতুলন
কেমনে বন্দনা করি কবে পাব দরশন?
নদ নদী গিরি গুহা সবে সদা অনুক্ষণ
অনন্তের জয় চিহ্ন করিতেছে সপ্রমাণ
পাইয়া দুর্লভ জন্ম তাঁহারই করুণা দান
গেল বৃথা সবি দিন কবে পাব দরশন?
কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা মাগে দীন অকিঞ্চন
সারাৎসার দিব্যজ্ঞানে সদা যেন থাকে মন।

তাঁহারই করুণা-কণা ভরসা তাঁরি চরণ
থাকে যদি মতি পদে পাঁব তাঁরে দরশন।

স্থায়ী কি ?

সাগরতরঙ্গের ন্যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর হু হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা চাই কি ? কোন সুখ বা সুখের আশা, একটা আনন্দের কোলাহল লইয়া সকলেই পৃথিবীতে থাকিতে চায়। কিন্তু জগতের কোন্ সুখটা চিরস্থায়ী হয় ? যখনই কোন সুখ সম্ভোগ করি মনে ভয় হয় এ সুখ কি চিরদিন থাকিবে। পৃথিবীর সুখ স্বপ্নের মত ক্ষণস্থায়ী। এই দেখিলাম অট্টালিকা ধন সম্পদ, মুহূর্ত্তে একবিন্দু অগ্নি সকলই ভস্মসাৎ করিল। এই দেখিলাম সন্তান সন্ততিতে গৃহ পূর্ণ, সন্তানের হাসিমুখে মায় হৃদয়-পরিপূর্ণ ; হঠাৎ করাল কাল আসিয়া কোথায় সে সুখ হরণ করিল। এমন শান্তিময় সন্তানের বদনকমল কোথায় গেল ? এমন শ্রেষ্ঠ সুখ, তাতেও বঞ্চিত হলাম। এই মনে করিয়া আর কি এ সমস্ত সুখের স্থায়ীত্ব কেহ মনে করিবে ? মানবপ্রাণে সুখের লালসা ঘোরতর বলবতী কিন্তু কিছুই স্থায়ী নয়। সকলই দুদিনের, ক্ষণভঙ্গুর। তবে কোন সুখ আমরা চাহিব ? বিবাহোৎসব নাচ গান যাত্রা থিয়েটর যাহা কিছু আমোদ দান করে সবই আশু সুখ তখন খুব সম্ভোগ হল, আর নাই যেন অন্ধকার হইয়া গেল ! কোন একটা আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য খুব আগ্রহ হয় মনে হয় কখন দেখিব কখন পাইব কখন যাইব কখন দিব ; কিন্তু যাই হইয়া গেল তাহার পর আর সুখ থাকে না, যেন আরও গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া প্রাণে কি একটা অসুখ বোধ হইতে থাকে। কিছুতেই আর মনের শান্তি রক্ষা হয় না। সংসারের সুখ কেবল অশান্তিতেই সমাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিক দুঃখের অগ্নি দ্বারা যেন নিগূঢ় ভাবে সম্বদ্ধ। কেন এ সংসারে এই আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। চিন্তা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় কি কারণে এত দুঃখ এ সংসারে পূর্ণ। ভগবান তো দুঃখের জন্য সন্তানকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেন নাই। আমরা এই অস্থায়ী সুখের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া পরমার্থ স্থায়ী যে বিমল শান্তি কোথায় তিনি রাখিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিতে পাই না। পৃথিবীর এই সমুদয় সুখেতেই শান্তি লাভ করা যায় যদি অনাসক্ত মুক্ত হইয়া সম্ভোগ করা যায়। সকলই তো তিনি দিয়াছেন সত্য তবে কেন পৃথিবীর সুখে শান্তি নাই—কেন সুখ সম্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না—প্রফুল্ল ভাব থাকে না ? মায়া মোহের আবিলতাতে সদা সংক্ষুব্ধ। পাপ সংসর্গে জড়ীভূত—ভ্রম প্রমাদে বিমিশ্রিত, তাই অকুশল তাই অশান্তি তাই জরা ব্যাধি মৃত্যু শোকে সমাচ্ছন্ন। নতুবা অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত বৈরাগী এ সংসারে কদাপি দুঃখ ভোগ করেন না। তিনি সদা শান্ত সংযমী সৌম্যমূর্ত্তি। সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ ভাবে সেবা করেন। তাঁহার মুখে সদা প্রফুল্লতা বিরাজিত। মহামতি শাক্য রাজবংশশ্রেষ্ঠ তাই ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া আর গৃহবাসী হইলেন না। তিনিও জগতের হিতে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। তাই মানুষ এই অনিত্য সুখে শান্তি লাভ করিতে পারে না। তাই কেহ কখনও বলে নাই যে সংসারে থাকিয়া এই মোহ মায়ার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিয়াছে। অতএব আমরা দেখিতে পাই স্থায়ী সুখ এ সকল অসার সংসারসুখে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন আমরা নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্ম চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি তখন কি মনে হয় ? সেই যে শান্তি তাহা নিত্যকাল স্থায়ী সে সুখের কখনও নির্ব্বাণ হয় হয় না। যাহাতে আমরা সকলে সেই নিত্য শান্তির অধিকারী হইতে পারি, এস ভগ্নি সকল, আমরা সেই পরমার্থ শান্তির প্রার্থী হই ; সকল জ্বালা, বিষয়ের অশান্তি দূরে পলায়ন করিবে। আর সংসারের এ বিষময় দুঃখ শোক আসিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতে পারিবে না। স্থায়ী সুখ যাহা তাহা পরিত্যাগ করিয়া কে অনিত্য সুখের অন্বেষণ করিতে চায় ? কেন তবে আর অমিয় ভ্রমে গরল পান করি ? দিন দিন তো সংসারের অবস্থা দেখিয়া সেই নিত্য সম্পদ আত্মা প্রার্থনা করে। এ মায়ার রঙ্গভূমে আর মন বদ্ধ থাকিতে চায় না। তবে সেই মায়ার মধ্যে যাঁহার অপূর্ব্ব শান্তিপ্রদ চরণ, সংসার কোলাহলে যাঁহার মধুর আশা বাণী, শোক দুঃখেতে যাঁহার আশ্বাসময়ী সান্ত্বনা—যাই তাঁহার শান্তি নিকেতনে। সংসারে থাকিয়াও তাহা হইলে অনাসক্ত স্থায়ী সুখের অধিকার প্রাপ্ত হইব। ইহ পরকালে কি সংসারে কি স্বর্গে সকল কালে সকল স্থানে সকল অবস্থাতে সেই নিত্য আরাম, স্থায়ী সুখ লাভ হইবে। সকল চিন্তা চিরজীবনের মত দূর হইয়া যাইবে। এই স্থায়িত্বই প্রার্থনীয়।

লজ্জারূপিণী।

ঈশ্বরের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য তিন ভাগে বিভাগ করা যায় ; যথা রাজপথ, রাজভবন এবং অন্তঃপুর। এই তিন বিভাগই অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রশস্ত রাজপথে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও মহিমা। কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশ পথে আলোক দিতেছে। অকূল জলপথ দেখ। কত সমুদ্র মহাসমুদ্র আস্ফালন করিতেছে, এবং তন্মধ্যে অসংখ্য জীব ক্রীড়া করিতেছে। চারি দিকে দেখ কত জাতীয় বৃক্ষ লতা পথের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত তুষারাবৃত পর্ব্বত স্থির অটলভাবে সেই মহাদেব মহেশ্বরের যশ ঘোষণা করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শত্রুদিগকে কম্পিত করিতেছে।

সেই রাজাজ্ঞাতে কত নদ নদী চলিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, কত ফল পাকিতেছে, কত বিচিত্র বর্ণের পাখী গান করিতেছে। রাজপথে মহারাজের সৃষ্টিকৌশল এবং অপার মহিমা বিস্তৃত রহিয়াছে। পণ্ডিত মূর্খ সকলেই এই সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বরাজের বিজ্ঞানকৌশল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়। কেহ কেহ এত চমৎকৃত হয় যে কোন কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা জ্ঞানে পূজা করে। তাহারা নদ নদী সাগর পর্ব্বত এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করে, এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতির দেবীজ্ঞানে অর্চ্চনা করে। পথিক রাজপথে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে মনে করিল রাজপথে রাজার এত বিভব শ্রী সম্পত্তি দেখিলাম; কিন্তু এখনও রাজভবনে প্রবেশ করি নাই। যখন কৌতূহলাবিষ্ট পথিক রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজসদনের প্রবেশ করিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন ঘরে প্রিয়দর্শন সহাস্যবদন প্রশান্তমূর্ত্তি রাজকুমারবৃন্দ দেখিতে পাইল। রাজভবনে বহির্বিভাগে রাজকুমারদিগের ঘর। কি মনোহর শ্রী! কি আশ্চর্য্য শোভা। প্রত্যেক রাজকুমার আপন আপন গুণে ভূষিত হইয়া বিচিত্র স্বর্গীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথিক মনে মনে বলিতে লাগিল,—"আহা মরি ঠিক যেন দেবসভা! ব্রহ্মসন্তান সাধুরাজকুমারদিগের কেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য! এক একজন এক এক দেব ভাবে শোভান্বিত। ঐ রাজপুত্রের কেমন বৈরাগ্য! ইহাঁর কেমন অচলা পিতৃভক্তি! ইহাঁর কেমন দুর্জ্জয় বিশ্বাস! উহাঁর কেমন প্রেমোন্মত্ততা! উহাঁর কেমন গভীর যোগানন্দ। রাজপুত্রদিগের বিবিধ গুণ ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথিকদল, ভক্তমণ্ডলী মোহিত হইল। বিশেষ বিশেষ সাধুর রূপ গুণ দেখিতে দেখিতে কতক গুলি লোক এত দূর মুগ্ধ হইল যে তাহাদের ভ্রম হইল তাহারা পিতা পুত্রকে এক মনে করিল, রাজপুত্রকে রাজা মনে করিল। তাহাদিগের এই ভ্রমহেতু পৃথিবীতে পিতার পরিবর্ত্তে পুত্রের, রাজার পরিবর্ত্তে রাজপুত্রের পূজা অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইল। এক প্রকার পৌত্তলিকতা বস্তুপূজা, দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিকতা সাধুপূজা। এক পৌত্তলিকতা রাজপথে, অন্য পৌত্তলিকতা কুমারভবনে। পথিক রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের ভবনে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং মহিমা দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইল। পরিশেষে অন্তঃপুর দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এবং তাঁহার সাধু সন্তানদিগের মধ্যে পথিক ঈশ্বরতত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সে আকুল হইল। তিনি কোথায়? অন্তঃপুরে। ব্রহ্মপিপাসু পথিক সেই নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ করিবার জন্য স্বভাবতঃ ব্যস্ত হইল। কার্য্য দেখিয়া অথবা সন্তান দেখিয়া ব্রহ্মনির্দ্ধারণে কি মন পরিতৃপ্ত হইতে পারে? পরোক্ষ

জ্ঞান হইল, এখন সাক্ষাৎ তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তাঁহার কেমন রূপ? যাঁহার সন্তান সকল দেখিতে এমন সুন্দর তিনি নিজে কেমন? এ সকল প্রশ্ন পথিকের মনে উদিত হইল। সৃষ্ট বস্তুতে ও পুত্রেতে কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের জ্ঞান, বল, প্রেম উপলব্ধি হইল, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরকে কিরূপে দেখিব? এই চিন্তায় ভক্ত পথিকের প্রাণ আকুল হইল। যেখানে ঈশ্বর লুকাইয়া আছেন ভক্ত সেই অন্তঃপুরে যাইবার সঙ্কল্প করিল। পথিক রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের মধ্যে ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তঃপুরে রাজ্যেশ্বরী মাতাকে দর্শন করিতে চলিল। মাতৃদর্শন করিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক হইল। ভক্ত ভাবুকের একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি তাঁহার আপনার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আলাপ করেন। ধর্ম্মপথে চলিতে চলিতে কেহ কেহ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে ভুলিয়া যায়, এবং পুত্রদর্শনে মাকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত রাজপথ ও রাজভবনের বহিঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ জননীকে দেখিবার জন্য সৃষ্টির তৃতীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভাগে অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। ভক্ত যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, নারদ চৈতন্য নানক প্রভৃতি সাধুগণ বসিয়া আছেন দেখিলাম; কিন্তু আমার মা কোথায়? মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় অন্তঃপুর হইতে মধুর ধ্বনি শুনা গেল; "যদি মাকে দেখিবে তবে অন্তঃপুরে অন্বেষণ কর।" দূর হইতে সুমধুর স্বর শুনিয়া মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ আরও আকুল হইল। যে স্থান হইতে সেই মধুর ধ্বনি আসিল কোথায় সেই অন্তঃপুর? ভক্তের প্রাণে ব্যাকুলতাসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার খুলিল। সাধক মনে করিলেন এবার বুঝি ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে আসিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে দেখিলেন ঈশ্বর অবগুণ্ঠনে আবৃত, কিছুতেই দেখা দেন না। ঈশ্বরের মুখ যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ তাহা প্রকাশিত হইল না। যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না তরল মেঘের ভিতর দিয়া অল্প অল্প প্রকাশ হয় সেইরূপ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্যোতি অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হইল; কিন্তু স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে দেখা গেল না। সুতরাং ভক্তের ব্রহ্মদর্শনস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল না। তিনি ক্রমাগত সাধন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমুখের আবরণ তিনি সরাইতে চেষ্টা করিলেন। বাস্তবিক ঈশ্বর অত্যন্ত লজ্জাশীল ও গোপনপ্রিয়। তিনি আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সমুদায় বস্তু আবরণরূপে সৃজন করিয়াছেন। সূর্য্য এত উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিতেছে, চন্দ্র এমন মনোহর জ্যোৎস্না প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু যে মা এ দুই জ্যোতিষ্ক সৃজন করিয়া জগৎ আলোকিত করিলেন, তিনি আপনি

আপনার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রের জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু সমুদ্রের জল কখনও তো চন্দ্রের চন্দ্রকে প্রতিভাত করিতে পারিল না। গোলাপ ফুল আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লোকের মন হরণ করে; কিন্তু যে প্রেমময়ীর হস্তে গোলাপ রচিত সেই প্রেমময়ী মাতাকে উহা প্রকাশ করিতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু একত্র হইলেও সেই আদিকারণ আদিজ্যোতিকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই সৃষ্টি ব্রহ্মের পরিধেয় বস্ত্র ও আবরণ। জগদীশ্বর এই সৃষ্টির আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ সহজে সৃষ্টির ক্রিয়া সকল দেখিতে পায়, অনেক সময় সৃষ্টির ঘটনাপুঞ্জের কার্য্যকারণ অবধারণ করে। যেমন বৃষ্টির কারণ মেঘ, মেঘের কারণ বাষ্প, বাষ্পের কারণ জল এবং সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি; কিন্তু অবিশ্বাসী অভক্ত মানুষ আদিকারণ দেখিতে পায় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বাহিরের কারণ সকল দেখিল, কিন্তু ভিতরের গূঢ় আদিকারণ দেখিতে পাইল না। কেবল অন্ধকার যে বিশ্বস্রষ্টাকে আবরণ করে তাহা নহে, আলোক অন্ধকার দুই মার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মার মুখ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সৃষ্টির তাবৎ বস্তু যেন শিক্ষিত ও অনুরুদ্ধ। মা লজ্জাশীলা হইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। অন্তঃপুর ভিন্ন জননী আর কোথাও থাকিতে পারেন না। যেখানে নির্জ্জনতা, যেখানে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা, যেখানে গভীর অন্ধকার সেই খানেই বিশ্বজননী। গোপনে অন্ধকারে লজ্জারূপিণী জগজ্জননী বাস করেন। তিনি ত নিশ্চয় সকল স্থানেই আছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু হে যোগী, বৈরাগী, প্রেমিক, তোমরা তাঁহাকে সকল স্থানে দেখাও দেখি। মা আপনার লজ্জা বিনয়েতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সত্য শিবসুন্দর ব্রহ্মসৃষ্টি আবরণের ভিতরে আপনাকে অপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার অধিক গুণ সে আপনাকে ঢাকে; যে নির্গুণ সে ঢাক বাজাইয়া বেড়ায়। যাহার ভিতরে পদার্থ অল্প, সেই বাহিরে অধিক আড়ম্বর করে, এবং খুব বক্তৃতা করিয়া ধূমধাম করিয়া বেড়ায়। জগজ্জননীর অনন্ত শক্তি অনন্ত গুণ, কিন্তু দেখ তাঁহার এত লজ্জা যে তাঁহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইতেছে, কোটি কোটি লোক চীৎকার রবে স্তব স্তুতি করিতেছে; কিন্তু জননীর মুখে একটি কথা নাই, যেন তিনি বিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। হে অল্পবিশ্বাসী, তুমি কি মনে কর মা সন্তানদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনেন না, এবং তাহাদের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন না। মা তাঁহার অন্তঃপুরে লুক্কায়িত বটে, কিন্তু সেখানে থাকিয়া সন্তানদিগের সকল কথা শুনিতেছেন, এবং যাহা যাহা আবশ্যক তাহা বিধান করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নিয়ম জীবের অভাব মোচন করিতেছে, নিজে

লুকাইয়া বসিয়া আছেন। সর্ব্বরাজ্যেশ্বরী জননী প্রত্যহ নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সন্তানদিগের ঘরে আসিয়া সমুদায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কথা কহিলেন না, গোল করিলেন না, তাঁহার কোন আড়ম্বর নাই, কিন্তু সকল হিতকর কার্য্যই তিনি করিতেছেন। মা গোপনে কার্য্য করেন। নির্লজ্জ অহঙ্কারী পুরুষদিগের ন্যায় তিনি আড়ম্বর ভালবাসেন না। মা এমনি ভাবে কাজ করেন যেন তিনি কিছুই করেন না। মানুষকে তিনি সকল শুভ কর্ম্মের সুখ্যাতি লইতে দেন, আপনি লুকাইয়া থাকিয়া মনুষ্যকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজে গৌরব আকাঙ্খা করেন না। মা সন্তানদিগকে বলেন;—"তোমরা সুখ্যাতি লও, মা সুখ্যাতি চান না।" মা লজ্জায় মাথা ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তিনি সমুদয় কুলবধূর দৃষ্টান্ত, তিনি তাঁহার অন্তঃপুরের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হইবেন না। মা কি যাকে তাকে দেখা দেন! ঈশ্বরূপা জগন্মাতা কি রাস্তার লোকদের নিকট প্রকাশিত হন? মার নামে নির্লজ্জতার কলঙ্ক আরোপ করে এমন পাষণ্ড কে আছে? নাস্তিক পাষণ্ডদিগের নাস্তিকতা দম্ভ এবং পরিহাসও মাকে অন্তপুর হইতে বাহিরে আনিতে পারে না। মার এমন উজ্জ্বল রূপ আছে যাহা প্রকাশ হইলে পৃথিবীতে একজনও নাস্তিক থাকিতে পারে না। যদি মা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা থাকিত? মার অসংখ্য রূপ গুণ আছে, কিন্তু কয় জন লোক মাকে দেখিতে পায়? এত সৌন্দর্য্য, কিন্তু কেবল অন্তঃপুরই তাহা দেখিল। এত শ্রী, কিন্তু জননী তাহা গুপ্ত রাখিলেন। সুনীল আকাশ মার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হে শূন্য, তোমাতে তো কিছু নাই, তুমি কেন ব্যবধান হইয়া ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করিতেছ? বস্তু তাঁহাকে ঢাকিল, শূন্যও তাঁহাকে ঢাকিল? কি আশ্চর্য্য! মা আকাশরূপ নীলাম্বর সুনীল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মা এমনি লজ্জাশীলা যে পথের কোলাহলমধ্যে তাঁহার কথা তো কেহই শুনিতে পায় না, অন্তঃপুরেও যখন তিনি কথা কহেন, অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভক্তদিগের সঙ্গে আলাপ করেন। সর্ব্বসাধারণের কর্ণে তাঁহার কথা প্রবেশ করে না। অত্যন্ত বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহার গুপ্ত রহস্য শুনিবার অধিকারী। নিভৃত অন্তঃপুরে যোগগৃহে তিনি কেবল অনুরক্ত ভক্তের সহিত চুপি চুপি কথা কহেন। মা ভক্তের কাছে এমনি নিঃশব্দে আসেন যে চারিদিকে হাজার লোক থাকিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না যে মা আসিয়াছেন। ভক্তের ঘরে মা যে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করেন তাহাতেও কোন শব্দাড়ম্বর নাই। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অবি-

শ্রান্ত সেবা করিতেছেন। এ দিকে নাস্তিকেরা অহঙ্কার করিতেছে, পাষণ্ডেরা আস্ফালন করিতেছে, তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে ও তাঁহার প্রাপ্য গৌরব তাঁহাকে না দিয়া আপনারা ভাগ করিয়া লইতেছে। কিন্তু লজ্জাবতী জননী একটী কথা বলিয়াও প্রতিবাদ করেন না। সকলেই পরিশ্রমের পুরস্কার, সুখ্যাতি ও বেতন গ্রহণ করিল, মা কিছুই পাইলেন না। কর্ত্তা কর্ত্রী দাসী সকলেই সুখ্যাতি গ্রহণ করিল, মা লক্ষ্মী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিলেন, মনে মনে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য!" হে ভক্ত, তুমি যে অন্ন আহার করিলে, কে ঐ অন্ন প্রস্তুত করিল? সকলই মা লক্ষ্মী করিলেন, কিন্তু কেহ মাকে রন্ধন করিতে দেখিল না, কেহ মার শব্দ শুনিল না। লক্ষ্মীর সংসারে স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পাইল, কে তাহাদিগকে অলঙ্কার শ্রী সৌন্দর্য্য দিলেন? স্বয়ং লক্ষ্মী সমুদায় দিলেন, কিন্তু সুখ্যাতি পাইলেন না। লোকে বলে গোলাপের কি চমৎকার সৌন্দর্য্য! চন্দ্র কেমন মনোহর! কিন্তু পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ভিতরে যে অন্তঃপুর আছে তন্মধ্যে সৌন্দর্য্যের রচয়িত্রী এবং চন্দ্রের নির্ম্মাতাকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। হে ব্রাহ্ম, তুমিও যদি অন্য লোকের ন্যায় বাহিরে বেড়াও, তুমিও যদি অন্তঃপুরে গিয়া ভক্তবৎসলা মাকে না দর্শন কর তবে কে মাকে দেখিবে? মা অন্তঃপুরে থাকিয়া আপনার রূপ ও সৌন্দর্য্য সেখানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যোগবলে সেই গুপ্ত রূপ দেখিতে হইবে। সেই অন্তঃপুরে গিয়া যাঁহারা মার রূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া কিরূপ পুলকে পূর্ণ হইয়া ভুবনমোহিনী জগজ্জননী কিরলে বসিয়া হাসিতেছেন! একবার সেখানে গিয়া যে মার মুখের মধুর হাস্য দেখিতে পায় সে ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পদারবিন্দে পড়িয়া থাকে। মার রূপ গুণের কথা বলিও না। যত রূপ তত লজ্জা; যত গুণ তত বিনয়। পৃথিবীর নর নারীর একটু রূপ থাকিলে তিলার্দ্ধ গুণ থাকিলে কত দেখায়। কি অহঙ্কার! ধিক্ নির্লজ্জ পুরুষ, ধিক্ লজ্জাহীনা নারী! পৃথিবীর মহিলাগণ, তোমরা মার নিকট লজ্জা ও বিনয় শিক্ষা কর। আত্মসংগোপন তোমাদের জননীর ধর্ম্ম, বিদ্যা ও রূপ প্রকাশ করিতে তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলা হও। তাঁহার এত লজ্জা, তিনি কদাপি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারেন না, দৌড়া দৌড়ি করিয়া প্রকাশ্য স্থানে আসিতে পারেন না। সজন নগরে, কোলাহলপূর্ণ পথে মা কখন দেখা দেন না, তিনি কখন অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহার লজ্জা তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতরে, অন্তরের অন্তরে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। মার হস্তের রচিত রসনা মাকে গোপন করে। রসনাকে এত অনুরোধ করি মার সুন্দর

রূপের কথা বল, সে কিছুতেই বলিবে না। সে বলে, মা বারণ করিয়াছেন; অন্তঃপুরের নিগূঢ় রহস্য আমি কখনই প্রকাশ করিব না। রসনা বাহিরের সকল কথাই আহ্লাদের সহিত বলে, কিন্তু অন্তঃপুরের কথা, গুপ্ত যোগানন্দের তত্ত্ব কিছুতেই বলিতে চায় না। গূঢ় হরিরূপের কথা, হরিগুণের কথা বাস্তবিক অনির্ব্বচনীয়। যদিও হরির রূপ দেখিয়া মন কখন কখন মুগ্ধ হয়, পৃথিবীর অভিধানে এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা সেই রূপ ব্যাখ্যা করা যায়! হরিরূপের কথা ভক্তেরা বলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারেন না, চক্ষু কেবল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে। অতএব যদি সুখী হইতে চাও সেই লজ্জারূপিণী মা জগদ্ধাত্রীকে বিশ্বের অন্তঃপুরে মনের অভ্যন্তরে অন্বেষণ কর। হে ব্রাহ্ম যাত্রিগণ, কেবল বাহিরে বিচরণ করিও না, কেবল রাজপথে বিচিত্র সৌন্দর্য্য এবং ভক্তদিগের ভবনে সাধুচরিত্র শোভা দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না; কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া সেই আদ্যাশক্তি সেই হ্রীস্বরূপা জগজ্জননীকে দর্শন কর। তিনি তোমাদের জীবনের অন্তরপুরে, তোমাদের অন্তরতম প্রাণের মধ্যে বসিয়া আছেন। ভক্তির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাকে দেখিয়া তাঁহার চরণতলে প্রণত হও। মা বলিবেন;—ধন্য ধন্য সন্তান, অন্তঃপুরে মার দর্শন পাইলে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

মাতৃস্নেহের প্রভাব।

কোন এক পুত্রবৎসলা জননীর এক অবাধ্য পুত্র ছিল। পুত্র কিছুদিন পরে মাতাকে ত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রা করে। দুঃখিনী জননী নিরুপায় হইয়া অবশেষে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনাসহ পুত্রের বাক্স মধ্যে রাখিয়া দিলেন। পুত্র অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মাতার প্রার্থনা বিফল হয় নাই। কেন না তাহার মাতার ঈশ্বর তাহার প্রতি সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে জননীদত্ত সেই ধর্ম্মগ্রন্থখানি কোন বন্ধুর নিকট দিয়া বলিয়াছিল যে "আমি মুক্তি পাবার আশায় চলিলাম।"

আর একজন নাবিকসন্তান মাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মাতার আসন্ন মৃত্যুশয্যায়ও তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য বিশ্বাস দেখিয়া মাতাকে বলেন, "মা, ভগবানের বিশেষ দয়া তোমার উপর যে তুমি এত যন্ত্রণার মধ্যেও এমন শান্ত হইয়া আছ। পরীক্ষা ঝড়ের মধ্যে তিনি তোমায় শান্তি দিতেছেন।" তখন মাতা উত্তর করিলেন, "বৎস, ঈশ্বর চিরকরুণাময়। তিনি চিরদিনই আমায় দয়া করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁর এই শেষ করুণার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ করি যে আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমায় দেখিতে পাইলাম। ইহা ঠিক যেন দৈব ঘটনা, আমার প্রার্থনার উত্তর

স্বরূপ তিনি যেন তোমায় এখানে আনিয়া দিয়াছেন।”

মাতার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া পুত্র কাঁদিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, “মা, তোমার প্রার্থনাই আমার এরূপ পরিবর্ত্তন ও মুক্তির কারণ। আর ইহাই আমার পরম আনন্দ যে তোমায় আমি নিজে এ সংবাদ দিতে পারিলাম।” তখন পুত্রের জীবনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া মাতা করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, “হে বিশ্বাসীর ঈশ্বর, তুমি যে এত দিন পরে আমার হারাধন পুত্রকে পুনঃ তোমার গৃহে আনিলে, তাহাকে তোমার করিয়া লও। আর তোমার দাসীকে এখন শান্তিতে সংসার হইতে বিদায় লইতে দাও।”

এক সময় এক পাদ্রী এক নাবিককে রোগশয্যায় দেখিতে যান্। নাবিকের যুবা বয়সেই নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম ও মদ্য-পানে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া পাদ্রী সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নাবিকের তাহা ভাল লাগিল না। সে কতকগুলি রূঢ় বাক্য বলিয়া পাদ্রীকে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু ক্রমেই তাহার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাঁচিবার আশাও আর রহিল না। পাদ্রী তথাপি প্রতিদিন তাহার নিকট গিয়া প্রার্থনা সঙ্গীতাদি করিতেন। কিন্তু নাবিক কখনও নিদ্রার ছলনা করিত, কখনও অন্য দিকে ফিরিয়া শুইয়া থাকিত। পাদ্রী দেখিলেন কিছুতেই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। তখন এক দিন তিনি তাঁর জননীর কথা উত্থাপন করিলেন। কি আশ্চর্য্য, এত দিন এত উপদেশ, এত মিনতি করিয়াও যাহা পারেন নাই, এই এক জননীর কথা শুনিবামাত্র সেই কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, “আমিও এক প্রার্থনাশালিনী মাতার পুত্র, আমার জন্য আমার মা কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি বহু বৎসর হইল তাঁ'কে পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।” সেই অবধি তাহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। পাদ্রী সাহেব আসিলে আর সেরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিত না। ক্রমে অনুতাপ আসিল। পরিশেষে যখন আরোগ্য লাভ করিল তখন পাদ্রী আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে দেখিলেন যে সে নবজীবন পাইয়াছে, এবং বিশ্বাস ও ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের মূল কি ধার্ম্মিকা জননীর প্রার্থনার প্রভাব নহে?

Rev. R. Knill তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছিলেন যে আমার মাতা শৈশব হইতে আমাকে লইয়া প্রার্থনা করিতেন। অনেক সদুপদেশ দান করিতেন, আমি বালকস্বভাবসুলভ চঞ্চলতা দোষে অনেক সময় সে সকল উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া মাতার অবাধ্য হইতাম। কিন্তু তথাপি

মাতার সেই প্রার্থনা ও তাঁর পবিত্র আদর্শ ছবি আমি কখনও ভুলি নাই। আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যোপলক্ষে বহু দিবস বিদেশে যাপন করি। বহু বৎসর পরে পুনরায় যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম তখন আমার পিতা মাতা উভয়েই পরলোকগত হইয়াছেন, আমার ভ্রাতা আমাদের সেই পুরাতন বাটীর অধিকারী হইয়াছেন। আমিও ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সব সেই রকমই রহিয়াছে। আমার পুরাতন ঘরে আমি শয়ন করিলাম। হঠাৎ সেই পূর্ব্বের ছবিটি আমার চোখের সম্মুখে যেন খুলিয়া গেল। সেই গৃহে সেই কত বৎসর পূর্ব্বে যেস্থানে আমার জননী আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিতেন সেই স্থানটি দেখিয়া আমার মাতার সেই মিষ্ট স্বর মনে পড়িল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘরে এই স্থানে বসিয়া আমায় ডাকিয়া বলিতেন, “এস বৎস, আমার কাছে জানু পাতিয়া বোস, আমি প্রার্থনা করিব।” আমার যেন মনে হইতে লাগিল মা আসিয়া আমায় সেইরূপ ডাকিতেছেন। আমার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না; যেস্থানে আমাকে লইয়া আমার মা প্রার্থনা করিতেন সেই স্থানে বসিয়া আমি ভগবানকে কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ দিলাম যে আমি এমন মা পাইয়াছিলাম যিনি আমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমার অন্তরের ভাব যদি সকল পিতা মাতা জানিতে বা অনুভব করিতে পারেন, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদের সন্তানদিগকে লইয়া প্রার্থনা উপাসনা করিবেন।

একজন সুবিখ্যাত রাজকর্ম্মচারী এক সময় তাঁ'র কোন এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, “বাস্তবিক আমি একজন নাস্তিক হইতাম, কেবল একটি স্মৃতি আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এবং তাহা কেবল আমার মাতার প্রার্থনা। তিনি শৈশবে আমার ক্ষুদ্র হাত দুখানি যোড় করাইয়া বলিতে শিখাইয়াছিলেন, ‘আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা’ সেই কথাগুলি আমি কোন দিন ভুলিতে পারি নাই। এবং ইহাই আমায় নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছে।”

সত্য ঘটনা।

উত্তর বঙ্গদেশে নুজা নদীর নিকটে গমন করিলে আজিও একটী অসমাপ্ত পুল দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার নিকটে একটি অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় বেদীর উপর বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কি জন্য পুলটি সমাপ্ত হয় নাই, এই ঘটনাটি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে সিপাহী বিদ্রোহের বহু দিন পূর্ব্বে (John Company) জন্ কোম্পানী ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহারা বঙ্গদেশের উত্তরে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া একটী পথ ও নুজা

নদীর উপর একটী পুল নির্ম্মাণ করিতেছিল। উক্ত কার্য্যের ভার তাহারা মেক্টেভিস্ নামক স্কটল্যাণ্ড দেশীয় কোন এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। মেক্টেভিসের অধীনে বহু সংখ্যক দেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পাথর উত্তরে নদীতীরে যে স্থানে পুল নির্ম্মাণ করিতে তাহারা মানস করিয়াছিল, সে স্থানে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বেদী ছিল। বেদীর উপরে প্রস্তরের বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। বেদীর নিকটেই বহুদিনাবধি একটী বৃদ্ধ ফকির বাস করিত। প্রতিদিন সে নদীর জলে স্নান করিয়া উক্ত বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূজাদি করিত। দেশীয় লোকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রত্যূষে ঐস্থানে আসিয়া পূজাদি করিত ও বহু সামগ্রী সমর্পণ করিত। দূর ও নিকট হইতে বহু সংখ্যক লোক বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিত ও বেদীর উপরে ফুল খাদ্য রৌপ্য সামগ্রী ও অর্থ দান করিয়া যাইত। পুল নির্ম্মাণ করিতে হইলে উক্ত বেদী ভঙ্গ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। তজ্জন্য মেকটেভিস্ তাহার লোকদিগকে তাহা ভূমিসাৎ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিল। উহাতে তাহারা স্বীকৃত হয় নাই বরং পথ কয়েক হস্ত স্থানান্তর করিবার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিল। উদ্ধতস্বভাব মেক্টেভিস্ তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিল, "তাহা কখনই হইবে না, নির্দ্দিষ্ট স্থানেই পথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে ও বেদী ভূমিসাৎ করিতে হইবে।" তাহা শ্রবণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল বটে কিন্তু তথাপি বেদী ভাঙ্গিতে তাহারা সাহসী হয় নাই। তাহারা এক দিনও উত্তমরূপে কার্য্য না করিতে পারিলে তাহাদিগের আর রক্ষা ছিল না, মেক্টেভিস্ তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিত। পথ নির্ম্মাণ ক্রমে ক্রমে সমাপ্ত হইল। বেদী ভাঙ্গিবার দিন নিকটে আসিল। বৃদ্ধ ফকির প্রতিদিন উহাদিগের কার্য্য গতি দেখিত ও মনে মনে তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিত। সে জানিতে পারিয়াছিল যে উহারা বেদী ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে লোকেরা বিশেষ কষ্ট পাইতে লাগিল। মে মাসের শেষে বেদীর নিকট বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল। দূর ও নিকট হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সেস্থানে জড় হইয়াছিল। ফকির ও মেক্টেভিসের বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘর্ষণে মহা সংগ্রাম বাধিবে ইহা জানিয়া তাহারা সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ ফকিরকে অপমানিত না করিবার জন্য মেক্টেভিস অনুরুদ্ধ হওয়াতে, সে তাহার প্রধান কর্ম্মচারীকে ফকিরকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে প্রেরণ করে। কর্ম্মচারীগণ উভয় সঙ্কটে পড়িল, সাহেবের আজ্ঞা পালন না করিলে তাহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকিবে না, আবার ফকিরকে রাগাইলে সে তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ

করিবে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে ফকির স্নান ও পূজাদি সম্পন্ন করিয়া সাহেবের প্রতীক্ষায় বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। সাহেব তাহার তাঁবুর বাহিরে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ধূমপান করিতে করিতে লোকদিগকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু সংখ্যক লোক রুদ্ধশ্বাসে স্থিরভাবে ফকির ও সাহেবকে দেখিতে লাগিল। মেক্টেভিস তাহার কর্ম্মচারীগণকে ফকিরকে সরিয়া যাইতে বলিবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আজ্ঞা করিল। কিন্তু সকলেই অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত। কেহই অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। মেক্টেভিস তাহাদিগকে গুরু দণ্ডের ভয় দেখাইল ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দুই একজনকে বেত্রাঘাত করিয়া অন্য সকলের নিকটে অপমানিত করিল। তাহাতেও তাহারা অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধ ফকির স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সকল ঘটনা দেখিতেছিল। মেক্টেভিস বেত্র হস্তে ফকিরের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, উচ্চৈস্বরে তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য বলিল। বৃদ্ধ ফকির মেক্টেভিসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মেক্টেভিস অগ্রসর হইয়া অন্য সকলকে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। কেহই ভয়ে অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধ ফকির দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া সাহেবকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিল। লোকদের ব্যবহারে মেক্টেভিসের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল। কেহ আসিল না দেখিয়া সে স্বয়ং বেদী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ইষ্টকের পর ইষ্টক খুলিয়া ঘৃণার সহিত ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। জনতার মধ্যে সকলেরই মনে অবিশ্বাসের উদয় হইল। ঐ দেবতা বুঝি যথার্থ দেবতা নয় এবং ঐ বৃদ্ধ ফকির হয়ত এক ধূর্ত্ত ব্যক্তি! নতুবা কিরূপে সাহেব তাহাদিগের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেছে। সহসা জনতার মধ্য হইতে এক চীৎকার ধ্বনি শোনা গেল, "দেখ দেখ সাহেব পড়িতেছে, দেবতার আঘাতে সে মরিতেছে!" সত্য সত্যই মেক্টেভিস একটী উত্তপ্ত ইষ্টক হস্তে সহসা ভূমিতে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। ক্রমে ক্রমে জনতা হ্রাস হইল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল এবং দূরে নিকটে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা প্রচার করিয়া দিল। সে দিবস মেক্টেভিসের মৃত দেহ তাহার তাঁবু মধ্যে রাখা হইল, পরদিন কয়েক জন সাহেব আসিয়া তাহাকে কবরাবৃত করিল।

সে দেশের লোকেরা বলিয়া থাকে মেক্টেভিসের আত্মা সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহার কথাও অনেকে শুনিতে পায় যেন সে বেদী ভাঙ্গিবার জন্য সকলকে আজ্ঞা করিতেছে!!

স্বপ্ন।

আমার অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। চিরদিন পিতৃগৃহে, শ্বশুরালয়ে সকলের স্নেহে আদরে এ দেহ মন পুষ্ট ও তুষ্ট। স্বামীর প্রেমে পৃথিবীর সকল সুখের অধিকারিণী; একটা কটু কথা স্বামীর নিকটে কখনও শুনি নাই। কত শত বার আমি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি, কত সময় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, ইচ্ছা করিয়া কতবার স্বামীর প্রণয় প্রমাণ করিবার আশায় ছলনা, প্রতারণা করিয়াছি কিন্তু তাহার উত্তরে কখনও একটি বিরক্তির কথা শুনি নাই। কেবলই ভালবাসা, আদর, যত্ন। একদিন মিথ্যা স্বামীর উপর বড় অভিমান হইল কারণ স্বামী আমাকে না বলিয়া একটি বন্ধুর বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনে গিয়াছিলেন। স্বামীর কিছুই দোষ ছিল না; তিনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখেন তাঁহার বহু পুরাতন একটি শৈশব বন্ধু সেখানে সুতরাং কথাবার্ত্তায় একটু বিলম্ব হইল; শেষে সকলের বিশেষ অনুরোধে বন্ধুদের সঙ্গে সে দিন সান্ধ্যভোজন করিলেন। এদিকে সেদিন আমার মনটা ভাল ছিল না। একে গরম পড়িয়াছে তাহার উপর ঝি চাকরদের গোলমালে, ছেলেদের অসুখে মন বিকৃত। স্বামী সাড়ে নয়টার সময় বাড়ী আসিলেন না দেখিয়া আমি ভাবিলাম আজ অভিমানের মাত্রা বাড়াইব। আহার করিয়া ছাদের উপর গেলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, সন্ধ্যাসমীরণ মৃদু ও স্নিগ্ধ। সেই ছাদের উপর শয্যা রচনা করাইয়া শয়ন করিলাম। উপরে অনন্ত আকাশ তাহাতে নক্ষত্র, চাঁদ কেমন খেলা করিতেছে; দেখিতে দেখিতে ঘোর নিদ্রা আসিল, চক্ষু মুদ্রিত হইল, স্বপ্ন দেখিলাম।

দেখিলাম আমার মৃত্যু হইয়াছে, প্রাণাধিক স্বামীকে ছাড়িয়া আমি পরলোকে আসিয়াছি। স্বর্গধামে আমি বড় সুখে আছি। পরীদল আমার কাছে থাকেন, আমি তাঁহাদেরই মধ্যে একজন দেবী হইয়াছি। আনন্দের রাজ্যে আনন্দে আছি! একদিন দেবীদের বলিলাম আমি স্বামীকে দেখিয়া আসিব। সকলে আমাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "কেন ভাই পৃথিবীতে যাবে? স্বর্গ হইতে কেহত পৃথিবীতে যাইতে চাহে না। মর্ত্ত্য হইতে সকলে স্বর্গে আসিতে চায় কিন্তু এখান হইতে—স্বর্গ হইতে কেহ মর্ত্ত্যে যাইতে চায় না। অতএব তোমার এ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।" আমি কিন্তু তাঁহাদের নিষেধ শুনিলাম না। "স্বামীকে দেখিব" বলিয়া সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীর পথে অবতীর্ণ হইলাম। দেখিলাম সেই দেশ! সেই জনরব! দেখিবা মাত্র প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠিল। গৃহাভিমুখে চলিলাম। ভাবিলাম আমার অবর্ত্তমানে সকলই অন্ধকারাচ্ছন্ন, শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, গৃহ উদ্যান অযত্নে নষ্ট হইতেছে। গৃহের সম্মুখে উদ্যান। উদ্যানে প্রবেশ মাত্র দেখিলাম বৃক্ষ লতা

অতি যত্নে রক্ষিত, অতি পরিষ্কার, সেই বেল জুঁই ফুটিয়া গন্ধে প্রাণ আমোদিত করিতেছে, সেই ফোয়ারার জল অনবরত উঠিতেছে পড়িতেছে। কতক্ষণ সেই বাগানে ঘুরিলাম। স্বামীর সঙ্গে কত খেলা খেলিয়াছি, এই উদ্যানে কত ফুলের মালা গাঁথিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাইয়াছি, ফোয়ারার তলে বসিয়া কত সুখের গান গাহিয়াছি—সেই সকল দেখিয়া স্বামীর জন্য প্রাণ আরও অস্থির হইল। গৃহ অভিমুখে ছুটিলাম। জানি গৃহ আঁধার; স্বামী লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছেন, শিশু দুটি মা মা বলিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে। গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখি উজ্জ্বল আলোকমালায় গৃহ আলোকিত। দ্বারে সেই বহু পুরাতন দ্বারবান, বেশ সঙ্গীদের সঙ্গে হাস্যাদি করিতেছে। দেখিয়া ভাবিলাম স্বামী শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন সেই জন্যই শোকের ছবি না রাখিয়া আমার জীবদ্দশায় গৃহ সংসার যেমন ছিল সেই রকমই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তখন মনটা আরও আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। দ্বিতলে উঠিলাম; আমার বসিবার ঘর, বস্ত্রাদি রাখিবার ঘর দেখিলাম কোথাও স্বামীকে পাইলাম না। শয়ন গৃহে গিয়া অনুসন্ধান করি, স্বামীর দেখা পাইলাম না। সমস্ত ঘর, দ্বার অথচ সুচারুরূপে সজ্জিত রক্ষিত। ইতস্ততঃ করিতেছি—এমন সময় মনে হইল নিশ্চয় শিশু দুটির কাছে স্বামী বসিয়া স্নেহ, আদর দিয়া তাহাদের মাতৃশোক ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ছেলেদের ঘরে গিয়া দেখি তাহারা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; যেন আমার স্নেহ অনুভব করিয়া "মা" বলিয়া একবার কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেদের দেখিয়া চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম এই সন্ধ্যার সময় তাহারা কাছে খেলা করিত, আমরা স্বামী স্ত্রী—ছেলেদের হাসি কেমন লুঠিতাম, শিশুদের সঙ্গে মিলিয়া কত খেলা করিতাম। তবে কি ছেলেরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে! তাহারাত জাগিয়া নাই, তাহারাত "মা কোথায়" "মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতেছে না। মনটায় আর তেমন বল, সাহস রহিল না। স্বামীর উদ্দেশে ঘরের বাহির হইয়াছি মাত্র, এমন সময় স্বামীর হাসি শুনিলাম, চমকিয়া উঠিলাম। বিশ্বাস করিলাম, দুঃখ শোক বিরহে স্বামী উন্মাদ হইয়া হাস্য করিতেছেন। স্বামীর নিকট গেলাম। আমাদের একটি প্রমোদকুটীর ছিল। সেই ঘরে আমরা অনেক সুখময় দিন ও রাত্রি কাটাইয়াছি। সে গৃহে কেবল আমারই ছবি স্বামী চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে লম্বিত রাখিয়াছিলেন। কোন চিত্রে আমি মুক্তকেশে ফুল তুলিতেছি, কোন খানিতে বেহালা হাতে গান করিতেছি, কোন খানিতে দুটি শিশু পুত্রদের কোলে করিয়াছি, কোন চিত্রে স্বামীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এই প্রমোদ কুটীর স্বামীর বড় প্রিয় স্থান। সেই জন্য আজ গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই হৃদয়ে আনন্দরাশি উথলিয়া উঠিল। দ্বারে প্রবেশ করিবা

মাত্র মধুর গীত ও বেহালার সুমিষ্ট বাদ্য শুনিয়া চমকিত হইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক কোনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলিয়া গেলাম। ভুলিলাম, আমি মৃত। ভাবিলাম আমিই বেহালা বাজাইয়া গান করিতেছি। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল, স্বামী শ্বেত প্রস্তরের ভূমিতলে আসীন একটি নব যুবতীর পদতলে! যুবতী অলঙ্কারাবৃতা, সুন্দর সাজে সজ্জিতা, আমি তখন ভাবে মগ্ন, মনে হইল আমিই সেই যুবতী —স্বামী আমারই পানে সোহাগ ভরে তাকাইয়া আছেন। গান সমাপ্ত হইল। স্বামী হাত ধরিয়া যুবতীকে উঠাইয়া ঘরের চারিদিক ঘুরিতে ঘুরিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমার ছেলেরই সমস্ত আর বেবিদের (আমার দুইটি শিশুকে বেবি বলা হইত) লেখা, পড়া শিখাইব, তাহাদের কপালে থাকে টাকা করিবে। (দেওয়ালের চারিদিকে তাকাইয়া) তোমার বড় বড় ছবি করিয়া লইব।" স্বরের প্রাচীর পানে তাকাইলাম একখানাও আমার ছবি দেখিলাম না। তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল। যেন সহস্র বজ্র এক সঙ্গে আমার মাথার উপর পড়িল ভ্রান্তি গেল; জানিলাম আমি মৃত, আমার দেহ নাই, আমি প্রেতাত্মার মত সংসারে দাঁড়াইয়াছি। আমার অথচ সকলই আছে, সেই ভালবাসা সেই অভিমান, সেই দুঃখ রাগ, হিংসা সকলই আছে! প্রাণের ভিতর সকল বৃত্তি এক সঙ্গে উপদ্রব করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল তবু কিছু বলিতে পারিলাম না, মনের ভাব একটিও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যাতনার বৃদ্ধি হইল। আর বিলম্ব করিলাম না। খুব প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আবার সেই দেবীদলে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। তখন দেবী মাতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়া বলিলাম, "মাগো, পৃথিবীর সুখে কি এত দুঃখ, সে হাসিতে কি এত কান্না? আর মা, ছাড়িব না তোমায়। তোমার মত আত্মীয় আর কেহ নহে।" দেবী মাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় অজস্র ধারে পড়িল। ভগ্নী দেবীদের কাছে গিয়া এ সকল কথা বলিব ভাবিতেছি এমন সময় কে হাত ধরিয়া টানিল; স্বপ্ন ভাঙ্গিল, চক্ষু খুলিয়া দেখি চারিদিক অন্ধকার। চন্দ্র নীলাকাশে লুকাইয়া—তারকারাশি মেঘের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে—কাল মেঘে আকাশ আবৃত; সম্মুখে আমার স্বামী আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। ঘুমের ঘোরে কি স্বপ্নের ঘোরে বলিয়া ফেলিলাম, "স্বামী কি এতই পর?"

রোগীর শুশ্রূষা।

("স্বাস্থ্য" হইতে উদ্ধৃত)

রোগ আরোগ্য করিতে হইলে ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের প্রতি যেমন অধিকতর দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ শুশ্রূষার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোগীর জীবন, রোগীর কষ্টের ন্যূনাধিক্য প্রধানতঃ শুশ্রূষার উপরই নির্ভর করে। এ জন্য যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের দায়িত্ব বড় গুরু, কার্য্য বড়ই মহৎ। রোগীর সুখ, স্বচ্ছন্দতা, রোগীর আরোগ্য লাভই তাঁহাদের সে সময়ে এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাহ্য জগতকে—এমন কি আপনাকে সে সময় ভুলিয়া যাইতে হইবে। রোগীর যখন যে অবস্থা ঘটে তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখিতে হইবে। স্মৃতির উপর নির্ভর করা কোন মতেই উচিত নহে। রোগীর শুশ্রূষার সময় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি সেবাকারী বা সেবাকারিণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

১। রোগী কতক্ষণ নিদ্রা যায়, সুনিদ্রা বা গাঢ় নিদ্রা হয়, কিম্বা তন্দ্রা মাত্র হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

২। রোগীর কোন্ অঙ্গে বেদনা থাকিলে ঐ বেদনা কোন্ সময় বৃদ্ধি পায়, কোন্ সময় হ্রাস হয়, কতক্ষণ থাকে, বেদনার প্রকৃতি কিরূপ অর্থাৎ বেদনার আবির্ভাবে কি প্রকারের যাতনা উপস্থিত হয়, এ সকল লক্ষ্য করিতে হইবে এবং ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা জানাইতে হইবে।

৩। বেদনার রোগী কোন্ পার্শ্বে অধিকক্ষণ শয়ান থাকে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কেন না ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে কোন্ স্থানে বেদনা ও কোন্ স্থানে আঘাত লাগিয়াছে!

৪। সাধারণ রোগীর—বিশেষতঃ জ্বর রোগীর ত্বক্ শুশ্রূষাকারীর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ত্বক্ আর্দ্র কি শুষ্ক, উষ্ম কি শীতল, রক্তবর্ণ কি বিবর্ণ, কিম্বা ত্বকে কোন প্রকার ব্রণ বাহির হইয়াছে কিনা, যদি হইয়া থাকে তবে কোথায় হইয়াছে, এ সকল সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীর ঘর্ম্মের সত্ত্বা বা অভাবের বিষয় অবগত হইলে চিকিৎসক অনায়াসে রোগীর আভ্যন্তরিক অবস্থা ও বলের বিষয় অনেকটা জানিতে পারিবেন।

৫। রোগীর ক্ষুধার বিষয়ে বিশেষ মনযোগ রাখিতে হইবে। ক্ষুধা বিষয়ে রোগীর উপর নির্ভর করা অনেক সময় নিরাপদ নহে। কোন্ পথ্য রোগী খাইতে চাহে, কোন্‌টি খাইতে নারাজ, কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে আহার করিয়াছে তাহা বিচক্ষণ সেবাকারীর নিকটই ডাক্তারেরা জানিতে পারেন।

৬। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিও সেবাকারীর বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। শ্বাস দ্রুত কি মৃদু, মিনিটে কত বার করিয়া পড়িতেছে তাহা গণিয়া রাখা আবশ্যক। বুকে হাত দিয়া গণনা করিলে আর ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই গণনার সময় বিশেষ সাবধান হইবে রোগী যেন জানিতে না পারে যে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা হইতেছে।

৭। রোগীর নাড়ীর গতিও গণিয়া রাখা আবশ্যক। নাড়ীর গতি দেখিয়া

সেবাকারী রোগীর অবস্থা বুঝিতে না পারুক কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অনায়াসে রোগীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিতে পারে।

৮। থার্‌মোমেটার দ্বারা মধ্যে মধ্যে রোগীর শরীরের তাপ পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। থারমোমেটারের পারা ৯৭ ডিগ্রীতে নামাইয়া উহা মুখের মধ্যে বা বগলে দিলেই চর্ম্মের উত্তাপে ঐ পারা গলিয়া উপরে উঠিয়া পড়ে। মুখে তিন মিনিট ও বগলে পাঁচ মিনিট রাখিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। মুখ বা বগল হইতে থারমোমেটর বাহির করিয়াই পারা কত ডিগ্রী উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখা উচিত। ত্বকের উত্তাপের বিষয় অবগত হইতে পারিলে—তাপ কোন্ সময় বাড়ে, কত ক্ষণ সেই বৃদ্ধি অবস্থায় থাকে, কোন্ সময় হইতে কমিতে থাকে এবং কোন সময় সহজ তাপে পরিণত হয়, তাহা জানিতে পারিলে চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এ জন্য সেবাকারীর উচিত বিশেষ সাবধান হইয়া নিয়মিত সময়ে তাপ পরীক্ষা করা এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। কিন্তু শরীরের প্রকৃত তাপ জানিতে পারিলে চিকিৎসার যেমন সুসমতা ঘটে এই তাপ পরীক্ষা বিষয়ে ভ্রম ঘটিলে তেমনি অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বিশেষ সাবধানে তাপ পরীক্ষা করা উচিত থারমোমেটারটির কোন দোষ না থাকে, ঠিক যতক্ষণ রাখা উচিত তাহা অপেক্ষা কম বা বেশীক্ষণ রাখা না হয়, এবং ডিগ্রী গণিতে যেন ভুল না হয়। থারমোমেটার লইবার সময় বাহু বায়ু বগলে বা মুখের মধ্যে যাহাতে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

৯। রোগীর কাসির প্রতি সেবাকারীর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাহার কাসি সর্ব্বক্ষণ হয়, কি সময়ে হয় তাহা জানিতে হইবে। দিবা রাত্রির মধ্যে কোন্ সময় অধিক কোন্ সময় কম তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। কাসি শুষ্ক কি সরস, কাসির সঙ্গে সর্দ্দি উঠে কি না, কাসির সঙ্গে কোন স্থানে বেদনা বোধ হয় কি না, অধিক পরিমাণে সর্দ্দি উঠিতে লাগিলে উহার সহিত শোণিত আছে কি না, শোণিত থাকিলে তাহার বর্ণ কিরূপ, ঐ শোণিত কণ্ঠনালী হইতে আসিতেছে কি মুখের মধ্য হইতে আসিতেছে ঐ সকল বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হইবে।

১০। রোগীর মলের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কতবার দাস্ত হয়, দাস্তের বর্ণ কিরূপ, তরল কি কঠিন, উহাতে কৃমি আছে কি না, দাস্তের সময় কোন কষ্ট হয় কি না, তাহাতে রক্তের সংস্রব আছে কিনা এ সকল বিষয় অবহিত ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। স্বাভাবিক মলের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিলে ডাক্তারকে দেখান কর্ত্তব্য। কিন্তু এণ্টারিক জ্বর, রক্তামাশায় বা কলেরা রোগে প্রতি দাস্তে কোন প্রকার সংশোধক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া

তৎক্ষণাৎ ঐ মল স্থানান্তরিত করিতে কোন সেবাকারীর বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

১১। রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে ডাক্তার অবশ্য সে কথা বলিয়া দিবেন, কিন্তু তিনি না বলিলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কতবার প্রস্রাব হয় ও তাহার বর্ণ, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১২। ডাক্তারের অবগতির জন্য জ্বরের সময় কম্প হয় কি না, বমি হয় কি না, প্রলাপ থাকে কি না এ গুলিরও হিসাব রাখিতে হয়। ডাক্তারকে অধিকাংশ বিষয়েই শুশ্রূষাকারীর উপরই নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ও অপর যাহা কিছু ডাক্তারের উপকারে আসিতে পারে বা চিকিৎসা ও রোগীর অবস্থা জ্ঞানের পক্ষে তাঁহার সহায়তা করে এরূপ সকল বিষয়ও শুশ্রূষাকারীর পত্রস্থ করিয়া রাখা উচিত।

পুরাতন ভৃত্য।

পুরাতন ভৃত্য যে কি জিনিস যতক্ষণ সে আমাদের সুলভ্য ততক্ষণ আমরা তাহার মর্য্যাদা বুঝি না। কিন্তু যখন সে প্রাণপণে আজীবন মনিবের সেবা করিয়া সেবাতেই জীবন অবসান করিয়া চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করে তখনই তাহার অভাব বুঝিতে পারা যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অশেষ গুণও মনে আসে।

চির জীবন সেবা করিয়া আজ আমাদের বহু পুরাতন ভৃত্য ছুটি লইল; এ ছুটি দুএক মাসের জন্য নহে, এ ছুটি আর ফুরাইবে না। এ গৃহ হইতে সে আর ফিরিয়া আসিবে না। যখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরবে সে বিদায় লইয়াছিল কে জানিত এই তার শেষ বিদায়? বৃদ্ধ ভৃত্য, বন্ধুভাবে কত উপকার করিয়াছিল। বিপদে আপদে আত্মীয়ের ন্যায় কত সান্ত্বনা দিয়াছিল; আনন্দে উৎসবে প্রধান উৎসাহী হইয়া কত কার্য্য করিয়াছিল; প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণ মনিবের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। সে সকলই আজ ফুরাইল। প্রতিবারে দেশে যায় আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু এবার যে দেশে গিয়াছে সেখান হইতে ফিরিবার পথ নাই। যাত্রার টিকিট আছে, প্রত্যাগমনের টিকিট নাই। যাও তবে, প্রভুর সেবা করিয়া অমরত্বের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া স্বর্গধামে যাইতেছ। এখানের পুরস্কার সেইখানে সঞ্চিত আছে। তথায় গিয়া তাহা সম্ভোগ কর।

সংবাদ।

সম্প্রতি কমলকুটীরে এক সপ্তাহের মধ্যে মহা সমারোহের সহিত দুইটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বিগত ২৫এ ফেব্রুয়ারী শ্রীআচার্য্য দেবের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুজাতা সুন্দরীর সহিত রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথের বিবাহ নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইল। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় ও পত্র পুষ্পে কমলকুটীরপ্রাঙ্গন অতি মনোহররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সিরমুরের

মহারাজা রেজিষ্টারীতে নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। সুজাতা দেবীর স্বভাবতঃ সুন্দর মুখ সে দিন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপাচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রদ্ধেয় প্রচারক ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল সঙ্গীত করেন। বিবাহোপলক্ষে তাঁহার বিরচিত সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উদ্বাহ সঙ্গীত।

কাফিসিন্ধু—যৎ।

বহে মৃদু মন্দ, প্রেমমধুগন্ধ, মধুর বসন্ত পবনে।
পুরনারীগণ, আনন্দে মগন, হাসে প্রসন্ন বদনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে উথলে প্রীতি, মঙ্গল গীত গাহে প্রকৃতি;
প্রেমে সৃষ্টি স্থিতি, প্রেমে ধর্ম্ম নীতি, প্রেমে সুখী জগজ্জনে।
এ বিশ্ব মাঝারে, প্রতি পরিবারে,
বাঁধা সবে প্রেমবন্ধনে;
বিভিন্ন প্রকৃতি, পুরুষ প্রকৃতি,
মিশে যায় প্রেমমিলনে,
প্রেমময় হরি, প্রেমরূপ ধরি,
নব দম্পতি হৃদে [সুরেন্দ্র সুজাতাহৃদে]
অবতরি; কর হে বিহার,
প্রেম সঞ্চার, রাখ সুখে দোঁহে চরণে।

২৮এ ফেব্রুয়ারী শ্রীআচার্য্য দেবের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র সেনের কন্যা সুহাসিনীর সহিত অমৃতসহর-নিবাসী পঞ্জাববংশীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিংরার পুত্র শ্রীমান চান্মন লালের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। সে দিবসও বহু লোকের সমাগমে কমলকুটীরের প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই বিবাহে পঞ্জাবের সহিত কলিকাতার সংযোগ হইল। দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন জাতির মিলন হইল। বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি নবদেবালয়ে নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়া বিধানমণ্ডলীভুক্ত হয়েন। বিবাহের পর উভয়ে পঞ্জাব যাত্রা করেন, তথায় নববধূকে পাইয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ করিয়াছেন এবং আদর যত্ন করিতেছেন।

ভগবান উভয় নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন ও চিরসুখী করুন।

স্বর্ণরেণু।

১। গুরু-শুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ।

২। যে ব্যক্তি পিতা মাতার আশা পূর্ণ করে সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া রাখে তাহার ইহকাল ও পরকালে শাশ্বত ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ হয়।

৩। কামিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষার দ্বারাই স্বর্গলাভ করিতে পারে; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে কি যজ্ঞ কি শ্রাদ্ধ কি উপবাস তার সকলই বৃথা হয়। [মহাভারত]

নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে পরিচারিকার জীবনের আর একটী বৎসর কালসিন্ধুনীরে নিমগ্ন হইল। সহৃদয়া পাঠিকা ও অনুগ্রাহিকাবর্গের স্নেহ আদর যত্নেই পরিচারিকা প্রতিপালিতা ও অদ্যাপি জীবিতা। মায়ের আদেশে মায়ের আদরের কন্যাগণের পরিচর্য্যার নিমিত্তই তাহার জন্ম। জানি না এই পরিচর্য্যাব্রতপালনে সে কতদূর সক্ষম হইয়াছে; প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম করিতে সে কখনও কুণ্ঠিত নহে। তবে ত্রুটী বিচ্যুতি সকলেরই ঘটিয়া থাকে; পরিচারিকাও সে দোষে দোষী। তাই সে আজ সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যেন চিরদিন সকলের স্নেহ দয়া তাহার প্রতি সমভাবে থাকে।